বদু পরিবর্তনে এসে সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই স্নায়ু কাল পাল্টের অপরিবর্তনীয় রূপটা বড় বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। ছোট শহর। শহর নয়, গ্রামই বলা চলে। এখানে-ওখানে কিছু কিছু বাড়ি ছড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই তালাবন্ধ। বাড়ি আর বাগান মালীদের রক্ষণাধীন। চেঞ্জারদের ভিড় এড়াবার জন্যে আমরা দিন দশেক আগেই এসে পড়েছি। কয়েকটি দিন নিরিবিলিতে প্রকৃতির কোলে চুপচাপ শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাব এই আশা।

আমার যাঁরা সঙ্গে এসেছেন—বলা ভাল আমি যাঁদের সঙ্গে এসেছি, তাঁরা নিরিবিলিতে থাকবার মানুষ নন। দুই জোড়া

স্ত্রী, সঙ্গে পুত্রকন্যারা গুটি চারেক আছে। দুই ভদ্রলোকই একই ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ করেন। তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যেও যেন বন্ধুত্ব আছে। দু-চৈ গল্পগুজবে বাড়িটাকে তাঁরা প্রায় একটা পাড়া করে তুলেছেন। আমি এসেছি একা। তাঁদের আতিথ্য হয়ে। আদর আপ্যায়ন পরিচর্যার কোন ত্রুটিই হচ্ছে না। আমি সবই পাচ্ছি। তাঁদের সান্নিধ্য আর সাহচর্য ছাড়া। বোধটা আমারই। সকলের সান্নিধ্য আমি নিতে পারি না, সেজন্যে সাধও করি। তাই তাঁরা যখন তাস খেলেন কি বেড়াতে যেরোন, আমি ইচ্ছা করেই একটু দূরে সরে থাকি। অবসরমত বই পড়ি। পড়তে ভাল না লাগলে ছোটখাট পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে থাকি।

বই যা সঙ্গে ছিল আমার আর তাদের, কয়েক দিনের মধ্যেই সব শেষ হল। সময় আর কাটে না। ওদের সময় তাসের সেতুর উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ওরা টেরও পান না। সেদিন বিকেলে ওরা যখন গভীরভাবে মগ্ন, আমি অবসিক দলকের আসন থেকে এক ফাঁকে উঠে বেরিয়ে পড়লাম।

ছোট একটি লাল পাহাড় ডানদিকে রেখে পিচের ঢালু রাস্তা দিয়ে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। সুন্দর একটা নেশা আছে। বিশেষ করে অচেনা পথের। তা কেবলই সাহসের দিকে টানে। দু দিকেই লোকালয়। সাঁওতাল-পল্লী। কিছুটা দেহাতী বিহারী-দের বাস। পিচের রাস্তা ছেড়ে কখন কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হয়েছে আমি খেয়াল করিনি। যখন খেয়াল হল, দেখি চারদিকেই পাহাড়। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে পথের চিহ্ন যে দেখা যাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কোন্ পথে যে এসেছি, কোন্ পথ দিয়ে ফেরা যে সুবিধা হবে, তা ঠিক করতে পারছি না। ধারে কাছে এমন কেউ নেই যে, জিজ্ঞাসা করে নেব। এদিকে টর্চ সঙ্গে নেই, হাতে একখানা লাঠিটাঠি পর্যন্ত নেই। পকেটে একটিমাত্র কলম সম্বল। তরবারির সঙ্গে তার তুলনা ত দূরের কথা, তাকে দিয়ে মুষ্টি-কাটারির কাজও চলবে না। হঠাৎ আমি বড় অসহায় বোধ করলাম। চোর ডাকাত সাপ বাঘের ভয়ে যে আতঙ্ক হল তা নয়, আমার মনে হল আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি। বেরোবার পথ আর কোন দিন খুঁজে পাব না।

আমি মরীয়া হয়ে যে পথ সামনে পেলাম, সেই পথেই জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ সামনে এক ছায়ামূর্তি। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনের এইসব অবস্থায় এত অহেতুক আদিম ভয় আমাদের এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, পরিচিত গার্হস্থ্য কুকুর বিড়ালও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মানুষেরও মনে হয় কোন এক অপার্থিব জগতের বাসিন্দা।

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, "কে আপনি?"

ভদ্রলোক আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার নাম রাম-জীবন চক্রবর্তী। আপনি কি এদিকে নতুন এসেছেন? বেড়াতে বেরিয়েছেন?"

তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা ভাষা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ। শহরের রাস্তাটা আমি ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে—।"

রামজীবনবাবু বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে।"

তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি আমার পরিচিত পথটি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এবার আমি আমার সেই ভীতসন্ত্রস্ত মনকে নিজেই পরিহাস করতে পারি। হি-হি-হি, এত ভয় পাবার কী হয়েছিল! আমার মত বয়স্ক লোকের হারিয়ে যাবার জায়গা কি এত কাছে আছে? তা কি এত সহজে মেলে? আমার মনে পড়ল, ছেলে-বেলায় গাঁয়ে থাকতে একবার আমাদের পাড়ার ছেলে-সংক্রান্তির মেলায় বছর ছয়েক বয়সের সময় এমনি হারিয়ে যাবার আতঙ্কে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। কাকার সঙ্গে সেই মেলায় গিয়েছিলাম। তাঁর হাত ধরে চলতে চলতে কখন যে তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছি তার ঠিক নেই। তাঁকেও পাচ্ছি না, ভিড়ের মধ্যে যেরোবার পথও পাচ্ছি না। খানিক বাদেই দেখি, কাকা আমাকে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছেন। তিনি আমাকে দেখে হেসে বললেন, "তুই যে হারিয়ে গিয়েছিলি।"

তাঁকে দেখে আমিও হাসলাম। কিন্তু তার আগের কয়েক মুহূর্তের আতঙ্ক আমার মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে ছিল। শৈশব-কালের সেই স্মৃতিপীড়িত ভয় আর আতঙ্ক কি কোন কোন সুযোগে আমাদের মনের উপরের তলায় উঠে এসে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে দেয়? মনে মনে নিজের হাস্যকর ভীরুতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করবার পর আমি বললাম, "এবার আমি যেতে পারব।"

রামজীবনবাবু বললেন, "এই কাছেই আমার বাড়ি। দয়া করে যদি একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান বড় আনন্দ পাব।"

ভদ্রলোক বিনয়ের অবতার। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে আমি হাসতে পারলাম না। ভদ্রলোক অতি বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি হবে বয়স। মাথার চুল সব পাকা। দাঁত সামানই অবশিষ্ট আছে। চেহারা একেবারে জীর্ণ। গলায় পৈতা। খোলা গা। হাতের হাড়িখানা চাষীদের হাঁড়ির মত। ছেলেবেলায় গাঁয়ে যেসব প্রতিবেশীকে ঠাকুরদা বলে ডাকতাম, তাঁদের কথা আমার মনে পড়ল। বললাম, "চলুন, দেখে আমি আপনার বাড়ি।" খানিক এগোতেই তাঁর বাড়ির সন্ধান মিলল। পুরনো একতলা কোঠাবাড়ি। জায়গা যে কম তা নয়। কিন্তু কেমন যেন পড়ো বাড়ি বলে মনে হয়। পশ্চিম দিকে একটা ইঁদারা। তার পিছনে বাগান। যেন বিরাট এক অন্ধকারের রাজ্য।

তিনি আমাকে তাঁর বাইরের ঘরখানায় নিয়ে বসালেন। সেখানে একখানা তক্তপোশ পাতা। দেয়াল ঘেঁষে খান দুই চেয়ারও রয়েছে। ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, তার রঙ একেবারে কুচকুচে কালো।

একটি ছোকরা চাকর আছে দেখলাম। সে ইঁদারার জল তুলে দিল। গামছা এগিয়ে দিল। রামজীবনবাবু সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

আমি বললাম, "এসব কেন? আমি ত এক্ষুনি চলে যাব।"

তিনি বললেন, "তাই কি হয়! সন্ধ্যার সময় গৃহস্থবাড়িতে এসেছেন। হাত মুখ ধুয়ে একটু জলটল না খেয়ে যাবেন কী করে? চা খান ত?"

বললাম, "খাই। কিন্তু দরকার নেই ওসব হাঙ্গামার।"

রামবাবু বললেন, "তাই কি হয়?"

আমার আপত্তি না শুনে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি নিজের হাতে চা আর একটা বাটিতে করে মুড়ি আর বাতাসা নিয়ে এলেন।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "দেখুন ত কী কাণ্ড! আপনি বড়ো মানুষ, কেন কষ্ট করে—।"

তিনি বললেন, "কষ্ট আর কী! আমার স্ত্রী অসুস্থ। নইলে তিনিই ওসব করতেন। আমরা যদিও সেকেলে মানুষ, কিন্তু আপনি আমাদের ছেলের মত। আপনার সামনে বেরোতে আর লজ্জা কিসের?"

কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁরা দু-পুরুষ ধরে এই অঞ্চলে আছেন। তাঁর বাবা ছেলের চাকরি নিয়ে এখানে আসেন। রামজীবনবাবুও ছেলেই চাকরি করেছেন। স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। নানা জায়গায় বদলি হতে হতে শেষে এখানে এসে রিটায়ার করলেন। আগে আগে বাংলা দেশের সেই হুগলী জেলায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জায়গাই পছন্দ হয়ে গেল। কিছু জমি-টমিও করলেন। সংসারটা আর হল না।

আমি বললাম, "আর কেউ নেই?"

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন

"না, আর কেউ নেই। আমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুজনই এখন এ পুরীর পাহারাদার।"

পিছনে কোন দুঃখের স্মৃতি আছে অনুমান করে আমি সতর্ক হয়ে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলাম। উঠনে চাষীশ্রেণীর দুই লোক এসে দাঁড়াতে তিনিও বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, "আমার জমি চাষ করে। সেইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। ফসলের অবস্থা ভাল নয়। কী যে হবে! অবশ্য নিজের জন্যে আর ভাবনা কী! আমার সব ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। ওদের জন্যে—"

আমি বললাম, "এবার আমি উঠি। রাত হয়ে গেল।"

রামজীবন বললেন, "আমার একটি প্রস্তাব আছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বলি।"

"বলুন।"

তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে [illegible], "আমি বলি কী, এই রাত্রে আপনার [illegible] ফিরে গিয়ে [illegible] নেই। আপনি নকুল মানুষ। একা একা অসুবিধে হবে। [illegible] এখানে থাকুন। দুটি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করি। স্টেশনপুর কাল ভোরে উঠে—।"

আমি ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করে বললাম, "না না না, তা কী করে হয়! আমি বাঁচির সঙ্গে এসেছি, তারা চঞ্চল হয়ে উঠবেন। হয়তো এরই মধ্যে তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন।"

রামবাবু কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, "খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন! আচ্ছা, আপনি সেজন্যে ভাববেন না। আমি আমার লোক দিয়ে এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি। আপনি তাঁদের নাম ঠিকানাটা দিন। হরিলালের একটা সাইকেল আছে। সে তড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিতে পারবে।"

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে তিনি হেসে বললেন, "আপনার কোনও ভয় নেই। বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ। ডাকাতটাকাত কিছু নই।"

তাঁর পরিহাসে আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, "ভয়ের কী আছে! সেজন্য নয়। আপনাদের অসুবিধে হবে।"

তিনি বললেন, "অসুবিধে কী বলছেন! এখনে কি [illegible] বাঙালী ভদ্রলোকের মুখ দেখি? আদর আপ্যায়নের কোন সুযোগ পাই? কেউ এসে দুটো কথা বলেও আনন্দ।"

আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। তিনি ঘরের লোক পাঠিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে বসে শুধু সারাক্ষণ কথাই বললেন না। তাঁকে তাঁকে গুছগাছও করতে লাগলেন।

গরু আছে একটা। কিন্তু দড়ি পুরনো হয়ে গিয়েছে। যে-কোন সময় দড়ি ছিঁড়ে অন্যের জমির শস্য নষ্ট করতে পারে। তাই তিনি চাকরকে সঙ্গে করে গরুর গাড়ি পাঠাতে বললেন। ভিতরে গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও দেখে আসতে লাগলেন। এই বয়সেও তাঁর কর্মশক্তি এবং তৎপরতা দেখে অবাক হলাম।

ঘণ্টা দুই বাদে রান্নাবান্না শেষ হল। ডাল পড়ল থালায়। রামবাবু আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। মেঝেয় আসন পাতা আছে। রামবাবুর স্ত্রী একগলা ঘোমটা টেনে ভাতের থালা দিয়ে গেলেন। ডাল, চালের বড়া, তরকারি, ডিমের ঝোল, অনেক কিছু করেছেন।

আমি রামকীর্তনবাবুকে বললাম, দেখুন, উনি অসুস্থ। তবু এত কষ্ট করে—"

তিনি একটু হেসে বললেন, "না করে ছাড়ল না চলাই। আমি ত বারণই দিয়েছিলাম। কিন্তু ও কি শুনবে? বললাম, তোমার শরীর খারাপ, আমিই সব করে-টরে দিই। বড়মানুষ ছেলে। সব বিষয়ই জানা আছে। কিন্তু শুনল না।"

বললাম "আপনি কিছু খেলেন না?"

তিনি হেসে মাথা নাড়লেন, "খাবে কিছু খাই না। কোন কোন দিন মুখে আর খই শুধু চলে। এই বয়সে হয় বেশী সইবে কেন?"

মাঝখানে তিনি একবার উঠে গেলেন। একটা অস্পষ্ট বকাবকি কানে এল, "আরে, না না, সে নয়। তার সঙ্গে কোন মিলই নেই। তুমি মাথা ঠিক করে কাজকর্ম কর ত।"

রামবাবু ফিরে এসে আবার আমার আগুরার কাছে বসলেন। কী প্রসঙ্গে কাকে যে ও-কথাগুলো বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তেমন খেয়ালও করলাম না।

আগুরাওয়ার পর আরও খানিকক্ষণ আলাপ আলোচনা চলল। চাষ-আবাদের কথা বলা ছাড়াও তিনি সকালের দিকে একটা পাঠশালায় পড়ান। বেশির ভাগই এই অঞ্চলের কিষাণ-কামলাদের ছেলে। তাদের দুষ্টু। পড়াশুনো করতে চায় না।

একটু বাদে তিনি ছেলে বললেন, "আপনার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে।"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "না না না।"

তিনি বললেন, "এ ঘরটায় হবে; থাকবে। আপনার শোবার ব্যবস্থা ভিতরে করে দিয়েছি। আসুন।"

ভিতরে ছোট-বড় পাঁচ চার-পাঁচ ঘর। তার একটিতে তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা রয়েছে।

তিনি বললেন, "কুঁজো, গ্লাস সব রইল। হ্যারিকেনটা টিম করে রেখে গেলাম তক্তপোষের তলায়। তবু দরকার হলে ডাকবেন। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি দরজার খিল দিতে গিয়ে দেখলাম খিলটা ভাঙা। বাঁকাটা জাঁদ হয়ে গিয়েছে। অনেক দিন চুনকাম হয়নি, তা আগেই চোখে পড়েছিল। দরজায় খিল না থাকায় আমি বেশী মাথা ঘামালাম না। এমন কোন মূল্যবান জিনিস সেই সঙ্গে, কি বেশী টাকাকড়িও নিয়ে আসিনি যে, তাববার কারণ থাকবে। ঘড়িটা হাতেই পরা রইল। পেনসনের জামাটা খুলে মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়লাম। ঘরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল। জীবনে আমাকে আর সব-কিছুই সাধাসাধি করে আনতে হয়, করেও আনতে পারি না—একমাত্র নিদ্রাটাই এখন পর্যন্ত অনায়াসে আসে। অঘটনা ঘটলেও তার কোন সংকোচ নেই।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ চোখে আলো পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে যা দেখলাম, তাতে বুক ছিঁড় হল। শীর্ণ শুকনো চেহারায় এক বৃদ্ধা হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মাথায় আঁচল নেই, কাঁচা-পাকা এলো চুল পিঠ ভরে ছড়ানো। লম্বাটে মুখ, ভাঙা গাল, কোটরে-বসে-যাওয়া চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি।

আমি প্রায়লাফে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে? কে আপনি? রামবাবু, নিশাগির এ-ঘরে আসুন, রামবাবু!"

"কী হয়েছে? কী ব্যাপার?" বলতে বলতে রামকীর্তনবাবু পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন। ঘরের ভিতরে একটু তাঁকিয়ে দেখে বললেন, "আপনার ভোলও ভর নেই। উনি আমার স্ত্রী।"

আর ভয় নেই। আমার তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। এমন দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম। আমি কোন কথা বললাম না।

রামবাবু তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "ছি-ছি-ছি, তোমাকে ফের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। তুমি এমন কাণ্ড আবার আরম্ভ করবে জানলে আমি কি ভদ্রলোককে এখানে থাকতে বলি? ছি-ছি-ছি, ওঁর কথা আমাকে কী অদ্ভুত করলে বল ত।"

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি আরও কয়েকটা ভড়া ধমক লাগালেন স্ত্রীকে। তাঁর ভাঙা গলায় শব্দ শোনা যেতে লাগল।

একটু বাদে রামবাবু ফিরে এসে বললেন, "দুঃখ রাইসুদ্ধে মার্জনা করতে হবে। আমি আপনার কাছে অপরাধী। তবে আপনি আমার প্রাণ পুতুলো।"

আমি বিছানার উপর উঠে বসে বললাম, "না না না, আপনার জন্য লজ্জিত হবার কিছু নেই। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে বলুন ত?"

রামবাবু বললেন, "ওরে কাল শুনবেন। আজ আপনি ঘুমুন। আর কোনও গোলমাল হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।"

আমি বললাম, "না। আপনি দয়া করে আজই বলুন। ঘুম এখন আর আমার হবে না।"

রামবাবু তক্তপোষের একধারে বসে তাঁর কাহিনী বলতে লাগলেন—

"কাজকর্ম চাষ-আবাদ নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিলাম মশাই। সন্তান নেই—এই ছিল একমাত্র দুঃখ। আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর দুঃখই বেশী। পুজো মানত তাবিজ কবচ সবই করে দেখা হল। কিন্তুতেই কিছু হল না। আমি আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—দেখ, ভগবান না দিলে ত আর পাবার সাধ্য নেই। এ জন্মে পেলে না, আর-জন্মে পাবে। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি আর সে-কথা মানে! পরের ছেলে দেখে আর তার মন আনচান করে। আমরা আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ, নইলে আর এমন হবে কেন? আমার চল্লিশ পার হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীও তখন একচল্লিশে পড়েছে, তখন মনের অভাবনীয় অঘটনই ঘটল। আজ অঘটনই বটে। কিন্তু সেদিন যেন হাতে চাঁদ পেলাম। বিয়ের সময় আমার স্ত্রীর বয়স ছিল ষোড়ো। তিরিশ পার হবার পর সে যখন ফিস ফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে আমাকে খবরটা শোনাল, তার চেহারার দিকে চেয়ে আমার মনে হল, ফের যেন সেই কিশোরীটি আমার ঘরে ফিরে এসেছে। দুজনে তিলে তখন নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা—ছেলে হবে কি মেয়ে হবে। আমরা যেন সেই প্রথম-যৌবনে ফিরে গেছি। আঙুল গুনে তারা পরীক্ষা করি। আমি দুটি আঙুল উঁচু করে ধরি। আমার স্ত্রী একটা ধরলে আমি জোর করি—মেয়ে। আমার স্ত্রী দুটি আঙুল বাড়িয়ে দেয়। আমি একটা ধরি। সে ছেলে হলে—ছেলে, আমার আঙুলের কথাই ঠিক হবে দেখে নিয়ো। আমি বলি—ছেলে হলে চেয়ে হবে একটা ছেলেই হল। বাঁজা নাম ত ঘুচুক। হে বলে—ওগো, সাধের যোলোবার আনেই খুশি? এ যে কী আকাঙ্ক্ষার ধন, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি তা বুঝবে না।

বিখ্যাত
"শঙ্খ ও পদ্ম"
মার্কা দেওয়া
আসবাব কিনুন।

ভি, এল, বসুর
হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা—৭ ● ফোন : ৩৪—২১৭৫
বিডন ডিপো :
হোসিয়ারী হাউস
১৫/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
ফোন : ৩৪—২১১৫

শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর কথাই সত্য হল। তার কামনাই ফলল। পুত্র সন্তানের মুখ দেখলাম। সে যে কী সুখ—আপনার ছেলেমেয়ে আছে? আছে। তা হলে বুঝবেন। দুজনের আহ্লাদে সোহাগে সে বড় হতে লাগল। বুড়ো বয়সের ছেলে, বুঝতেই পারেন। আমার বাবা-মা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। আমার স্ত্রীর বাবা-মাও নেই। আমরাই মানিকের প্রায় ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, ওর নাম রাখলাম—মানিক। মনে মনে বললাম সাতরাজার ধন। সাতরাজা না হক, এক জোড়া রাজরানী ওকে বুকে করে রইল। পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় শুভদিন দেখে হাতেখড়ি দিলাম। ধারেকাছে তখন পাঠ শালা ছিল না। বই শ্লেট কিনে দিয়ে নিজেই পড়াই। আমি পড়াই বই থেকে, ওর মা পড়ায় মুখে মুখে। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম মুখস্থ করায়। আমরা দুজনে মিলে একটি তোতা-পাখি পেয়েছি।

দেখতে দেখতে আট বছর হল বয়স। বুড়ো বয়সের ছেলে হলে হবে কী, দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্টই হয়েছে। কিন্তু পড়ায় বড় না মন, তার চেয়ে দুষ্টু বুদ্ধি বেশী। আর ভারি ডানপিটে। আমার ঘরের জিনিসপত্র ত ভাঙেই, পাড়াপড়শীর গাছ-পালা নষ্ট করেও আমাকে বড় বিব্রত করে। আমি বলি—এখন ত শুধু আর আদর দিলে চলবে না, শাসন করা দরকার। আমার স্ত্রী হেসে বলে— কর না শাসন, বারণ করে কে! ওর গায়ে আমিও হাত তুলতে পারি না, সেও হাত তুলতে পারে না। বরং রাগবশে মানিকই আমাদের দুজনকে ধরে ধরে মারে। সে মার আমরা উপভোগ করি। এতদিন পরে জন্মপুত্র মার খাচ্ছিলাম। তার কাছে ওর মার ত সুখের।

তারপর ওর হাতের মারে মাঝে মাঝে আমরা এখন একটু একটু ব্যথা পেতে লাগলাম। ও তখন বড় হয়ে উঠেছে। তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দয় পড়ল, ঢোল উতরে পনেরয়। কিন্তু স্বভাব শোধরাবার লক্ষণ নেই। আমি থাকি অফিসে। ওকে আগলাবার আমার সময় কই! ওর মার কথাও গ্রাহ্যই করে না। এই নিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একজন আর-একজনকে দোষারোপ করি, খোঁটা দিই। কিন্তু তাতে ছেলের স্বভাব শোধরায় না! স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। কিন্তু মাস্টাররা বলে—স্কুলে যায় না। বকাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিড়ি খায়, বয়ে ইয়ার্কি দেয়। আমি স্ত্রীকে বলি—তোমার ছেলের জন্যে ত পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হল। জ্ঞাতমান কিছু আর রইল না। আমার স্ত্রী বলে—এখন বুঝি শুধু আমার ছেলে হল? লোকে ওকে আমার নামে চেনে? না, তোমার নামে চেনে? সবাই ত তোমার দোষ দেয়। বাপ শক্ত না হলে কি ছেলে ভাল হয়? একথা শুনে আমি মনে মনে গজরাতে থাকি।

তারপর একদিন আমাদের প্রতিবেশী মহল্লার সাঁওতাল এসে ওর নামে নালিশ করল, ও নাকি ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মহুয়ার মুরগি চুরি করে তা দিয়ে পিকনিক করেছে। আমি মানিককে ডেকে কান মলে কষে চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে। আমার পাঁচ আঙুলের দাগ ওর কাঁচা গালে জ্বল-জ্বল করতে লাগল। ওর মা বাঘিনীর মত তেড়ে এল—দেখ ত কী করলে! আমি বললাম—বেশ করেছি। ওর এইরকম শাস্তি হওয়াই দরকার। মানিক আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোন অপরাধ করবে না। আমি বললাম—আমার ঘরের জিনিস নিয়ে তুমি যা খুশি তাই কর, কিন্তু পরের জিনিসে হাত দিতে পারবে না। আমার নির্দেশমত মানিক নিজের হাতে নিজের কান মলল। কিন্তু বললে কী হবে, দুদিন যেতে না যেতেই ওর নামে ফের নালিশ এল—ও বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে ফটিক মাহাতোর পয়লাটার পা খোঁড়া করে দিয়েছে। ফটিক নাকি ওকে লাল তুলে গালা-গালি করেছে। আমি ছেলেকে বললাম—তোমার বাপ তুলে গালাগাল এখন সবাই করবে, সে গুণধর ছেলে হয়েছ তুমি। ফটিকের বিচার পরে হবে, আগে তোমার বিচার হয়ে যাক। তারপর আমি থেকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে পিঠে কষি দিয়ে লো-গার মারলাম। ও কাঁদল না, চোখাল

— আমাদের নূতন প্রকাশিত উপন্যাস —

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

নোনাজল মিঠে মাটি ৮·৫০

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥

মণিবেগম ৫·৭৫ নীলকণ্ঠী ৫,

— অন্যান্য উপন্যাস —

॥ বনফুল ॥ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥

পিতামহ ৬, নঞ্জুতৎপরুষ ৩, পদসঞ্চার ৫,

॥ অনুরূপা দেবী ॥ ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

রামগড় ৪·৫০ প্রিয়বান্ধবী ৩,

গরীবের মেয়ে ৪·৫০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কালের মন্দিরা ৩·৫০

স্বাধীনতার স্বাদ ৪, গৌড়মল্লার ৪,

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

নীলকণ্ঠ ২·৫০ ঝড়ো হাওয়া ২·৫০

— অন্যান্য গ্রন্থ —

॥ নরেন্দ্র দেব ॥ ॥ ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ॥

মেঘদূতে ৬, ওমর খৈয়াম ৬ শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ২·৫০

॥ ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার ॥

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের ॥ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ॥

॥ প্রভাব ৫·৫০ হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ৫,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

না, দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে মার খেল। শুনে করে ফেললে গো!—বলে চিৎকার করে আমার স্ত্রী আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

"দড়ি দিয়ে গরু ছাগল বেঁধে রাখা যায় ছেলেকে রাখতে পারলাম না। সে দড়ি ছিঁড়ে পালাল। সেইদিন ভোর থেকেই তার আর খোঁজ নেই। প্রথমে ভাবলাম ওর বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গিয়ে বুঝি লুকিয়ে আছে। পাড়ার লোকজন নিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে এলাম, কোথাও যায়নি। ওর বন্ধুদের কাউকে সঙ্গে নেয়নি, একাই চলে গেছে। ওর মা বলল—তুমি ওকে ওর খেলার সঙ্গীদের সামনে পিটিয়েছ। ওর মুখ দেখতে লজ্জা করে না? তাই ও লুকিয়ে রয়েছে। আমি ভাবলাম, কদিন আর লুকিয়ে থাকবে? আসবেই। কিন্তু দুদিন গেল চার দিন, সপ্তাহ, এক মাস কাটল। সে ফিরল না। ওর মা পাগলের মত হল। আমি বাইরে স্থির রইলাম, কিন্তু ভিতরটা অঙ্গার হয়ে গেল। গণৎকার দিয়ে গণালাম। সবাই বলল—মরেনি, বেঁচে আছে। কোনদিকে গেছে। কেউ বলল—উত্তরে, কেউ বলল—দক্ষিণে, কেউ—পূবে, কেউ—পশ্চিমে। কেউ এক কথা বলে না। আমি চারদিকেই খোঁজ করলাম। একজন বলল, ট্রেনে করে তাকে কলকাতার দিকে যেতে দেখেছে। ছুটলাম কলকাতায়। থানায় থানায় খবর দিলাম। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—বাবা ফিরে এস, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তুমি শুধু ফিরে এস।

"কিন্তু সে আর ফিরল না। আজ এই পনের বছর। গণৎকাররা বলে, সে আছে, মরেনি। কোথায় আছে? তার উত্তরে এক-একজন এক-এক কথা বলে। এই কুড়ারতে জায়গা কি কম! যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তাকে কি আর ধরবার জো আছে?

"প্রথম প্রথম আমরা স্বামী-স্ত্রী একজন আর-একজনের শত্রু হয়ে দাঁড়ালাম। কেউ কাউকে দেখতে পারি না। সেইজন্যই মাথায় খুন চাপে। যে ছেলে আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের দুজনকে একজন একপ্রাণ করে দিয়েছিল—সে সরে যাওয়ায়, আমারই দোষে চলে যাওয়ায় আমরা একজন আর-একজনের কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়লাম। দিনরাত শুধু ঝগড়া আর শাপ-শাপান্ত। কিন্তু আমার স্ত্রী যখন পাগল হল, তখন ওর দশা দেখে আমার বড় দুঃখ হতে লাগল। ভগবানকে ডেকে বললাম—ভগবান, যে গেছে, তাকে তুমি আর ফিরিয়ে দেবে কিনা জানি না, কিন্তু ওর কোলে আর-কাউকে দাও। তাকে নেড়েচেড়ে ও শান্ত হক। আমার চলো নয়, শুধু ওর জন্যে। মেয়েমানুষ যে বড় অসহায়। কিন্তু ভগবান কি আর মানুষের সব প্রার্থনা শোনেন? সব প্রার্থনা রাখেন?

"আমার স্ত্রীর উন্মাদনা মাপনা থেকেই কমে গেল। আমি তখন ওকে নিয়ে তীর্থ-পর্যটনে বেরলাম। যান দুই জমি বিক্রি করলাম। দু-চার টাকা যা জমিয়েছিলাম তাও সঙ্গে নিলাম। গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা—পণ্ডতীর্থ সারলাম। কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে আমরা ত দেবতার মুখ দেখি না। সেই শয়তান মুখ এসে সব আড়াল করে দাঁড়ায়। তীর্থে অর্ধব্যয়ই সার হয়, আমাদের কোন পুণ্য হয় না। তা ছাড়া মন্দিরগুলির ঘাটগুলির অলেপুরুষ আমরা তারই খুঁজে বেড়াই। আমার স্ত্রী যেখানেই ছাইমাখা দাড়িওয়ালা সাধুসন্ন্যাসী দেখে, ভাল করে তার মুখের দিকে তাকায়। সে যদি সাধু হয়ে গিয়ে থাকে! আমার অভিজ্ঞতা ত আরও বেশী। আমি শুধু সাধুদের মধ্যেই তাকে খুঁজি না, চোর বদমাস, গুণ্ডাদের মধ্যেও তার সন্ধান করি। বলা ত যায় না, সে যদি ওই দলে ভিড়ে থাকে! সেই আশঙ্কাই ত বেশী। কিন্তু সাধু হক চোর হক, সে ফিরে আসুক। আমি তাকে নতুন মানুষ করে গড়ে তুলব। আর অমন করে মারব না, ধৈর্য হারাব না। ছেলেকে কী করে মানুষ করতে হয়, মনে মনে আমি তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সে সুযোগ আর সে আমাকে দিল না। সেও দিল না, ভগবানও দিলেন না।

"আমি আমার স্ত্রীকে বললাম—অনাথ কোন ছেলেকে এনে পালি, পুষ্যি। তাতে আমার স্ত্রী মহাখাপ্পা। নিজেদের এই দুর্ভাগ্য হবার পর থেকে সে কিছুদিন পরের ছেলেমেয়েকে দুচোখে দেখতে পারত না। মেয়েমানুষ বড় অবুঝ আর বড় অসহায়। তাই তার পাপ খণ্ডনের ভার আমি নিয়েছি। আমি না নিলে আর কে নেবে? পাড়ার গরিব ছেলেদের নিয়ে এক পাঠশালা খুললাম। ছেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাদের দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আজ-কালকার ছেলেগুলো জাঁহা বদমেজ। প্রত্যেকেই সেই হতভাগাটার মত। আমি ভাবি, এদের মধ্যে একটাও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, আমার কিছুটা আশা মেটে। মুখ থাকে। ছাত্রও যা ছেলেও তাই।

"এবার আমার স্ত্রীর আচরণের কথা বলি। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওর গণৎকারের কাছে যায়। তাবিজ, কবচ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন যে যা বলে, তাই করে। আমি সব জানিও না। কতজনে ওকে ঠকায়। আমি গ্রাহ্য করি না। ভগবান যে ঠকান আমাদের ঠকিয়েছেন, তার চেয়ে ত আর বেশী কেউ পারবে না। কে যেন ওকে বলেছে—তোমার ছেলে একদিন ছদ্মবেশে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাবে। তুমি যদি সতর্ক হও, তা হলে ধরতে পারবে, চিনতে পারবে। না হলে সে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি—এসব বাজে কথা। যদি আসে সে নিজের বেলাই আসবে। ছদ্মবেশে আসবে না। আমার স্ত্রীর মাথা যখন ঠিক থাকে, তখন সে আমার কথা শোনে। বিশ্বাসও করে। আবার আমাদের মধ্যে অনেকটা সেই আগের ভাব ফিরে আসে। আমরা দুজনে বসে বসে তার গল্প করি। তার সেই আসবার সূচনা থেকে শুরু করে চলে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত—কিছুই ত আমরা ভুলিনি। কিন্তু ওর মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ায়। সেই আগের মত ছিটে দেখা দেয়। তখন ও ঘর থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আমি আর বাধা দিই না। ও যাতে শান্তি পায়, তাই ও করুক। আগে আগে জোর করে ধরে আনতাম। এখন আর সে চেষ্টা করিনে। এই সব সময় ও আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না, বোধ হয় আর সকলের কথাই বিশ্বাস করে। ওর যে মুহূর্তে যে ধারণা হয়, তাকেই ও সত্য বলে ধরে নেয়। আপনার সম্বন্ধেও ওর ধারণা হয়েছে—। অথচ কী করে যে হল, কোন মিলই ত নেই। কিন্তু পাগলের মাথার কখন যে কোন্ খেয়াল চাপবে, তা কেউ বলতে পারে না।

"আপনাকে এখানে জোর করে ধরে রেখে অনর্থক কষ্ট দিলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। এখনও বেশ রাত আছে। আপনার ভয় নেই। আর-কোন গোলমাল হবে না। আমি ওকে আগলে রাখব।"

রামবাবুর স্ত্রীর চাপা কান্নার শব্দ তখনও থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে কান্না শোকের, না উপলব্ধির বোঝা শক্ত।

আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সে-রাত্রে ঘুম আর এল না।

বিমল কর

দরজা

আকাশে প্রথম তারাটি ফুটলে গোনা যায়, তার পরও দু চারটি; তারপর অগুনতির তারা, কে-ই বা তারা গোনার খেলা খেলে! আমার খেলা শুরু হয়েছিল। চোদ্দ বছর আগে—বয়স বুঝি পনের তখন; ধোওয়া-মোছা শ্লেটের মতন আকাশটুকু পরিষ্কার। প্রথম তারাটি ফুটেছিল ভয়ে ভয়ে। সে-তারা ছোট, তার আলো উজ্জ্বল নয়। নিশীথ এসে এমনভাবে সদরে কড়া নেড়েছিল যেন ও ঠিক জানে না কোথায় এসেছে। অনিশ্চয়ে বলে ওর হাত ছিল দুর্বল, কড়া নাড়ার খুট খুট শব্দটুকু শুনে মনে হয়েছিল বাতাসের ঝাপটা লেগে কপাট নড়ছে। নিশীথের পিছনে কী কর—হয়ত এ-বাড়ি, হয়ত এ-বাড়ি নয়— কড়ার মৃদু দুর্বল খুট খুট শব্দটুকু তাই বাজল, থামল, আবার বাজল। আমি জানতাম না নিশীথ এসেছে, আমি ভাবিনি কেউ আসতে পারে; সময় খুলল কি খুলল না ভেবেও তখন না জানি খুলে দিয়েছিলাম। দেখি, নিশীথ সামনে দাঁড়িয়ে। ("কোন নিশীথ? নিশীথ হালদার, না নিশিনাথ মুখুজ্যে? নিশিনাথের কাঠগোলা তোমাদের বাড়ির পাশেই ছিল!")

নিশিনাথ নয়, নিশীথ। কাঠগোলার নিশিবাবু আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চোখ নামিয়ে হাঁটতেন। যমুনাদি হেসে বলত, নিশিবাবুর চোখ ভীষণ টাঁয়া। বাঁয়ে তাকিয়ে ডাইনে দেখেন, নিচু চোখে উঁচু জিনিস। কথাটা খুব মিথ্যে নয়, পরে বুঝেছিলাম। আমার নিশীথ টাঁয়া নয়, তার চোখ ছিল ছোট—ছোট তারার মতন, বড় কাঁপত, যেন এই বুঝি নিভে যায়। অত ভয় অত লজ্জা আর দেখিনি কারও। ওর ভয় ওর লজ্জা আমার সাহসী অলাজুক করে তুলেছিল। কেন যে, আমি জানি না। হয়ত দুই অন্ধ এক হলে এক-অন্ধকে সাহস করে অন্য-অন্ধের হাত ধরতে হয়।

("নিশীথ ছেলে হয়ে যা পারল না, মেয়ে হয়ে তুমি তা পারলে?")

পারলাম। নিশীথ পুরুষ বলে অনেক কিছুই পারেনি, আমি মেয়ে বলেই অনেক কিছু পেরেছি। পনের বছরের মেয়ে হয়ে আমি উনিশ বছরের ছেলেকে পাগলের মত ভালবাসতে পেরেছিলাম। মার গয়নার হার চুরি করে নিশীথের পকেটে নিয়ে দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে এক টুকরো চিঠি।

এই হার বেঁচে তোমার, দিদির বিয়েতে কাপড় জামা কিনে দিও।

("তোমার মা জানতে পারেনি?")

পেরেছিল। আমার মা'র দু-চোখে দশ জোড়া চোখের দৃষ্টি ছিল। মা সব দেখত, সব বুঝত, সব জানতে পারত। মা বলেছিল, তিথিরির হাত যে ছোঁয়ায়—তার এত মেয়ে-টান কেন! জন্মাও করে না! বারণ করে দিবি, এ-বাড়িতে আর যেন না আসে।

("বারণ করেছিলে?")

না। বলেছিলাম, তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। আমি ত তোমারই। পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করব, বর বউ হয়ে থাকব।

("এ ত সেই পুরনো গল্প; নিশীথ বোধ হয় এবার তোমার হাতের বালা কিংবা চুড়ি নেবে, সোনা বিক্রির টাকায় টিকিট কিনে আনবে বলে স্টেশনে দিয়ে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না?")

উঁহু, গল্পটা সে-দিক থেকে পুরনো নয়, হয়ত অন্য দিক থেকে পুরনোই। নিশীথ বলেছিল, হাঁ সে আমায় বিয়ে করবে; বিয়ের আগে চাকরিটা তার জুটে যাক।... নিশিবাবুর কাঠগোলায় তার একটা চাকরিও জুটল। পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনে। একদিন সন্ধে বেলা নিশীথ এল। শুধোলো, নিশিবাবু তোমায় কে হয়, পারুল? আমি অবাক; নিশিবাবু আমার কে হবে, কেউ না। বললাম, নিশিবাবুরা বামুন, আমরা জায়স্থ। ও আমাদের কে হবে, কিছু নয়। নিশীথ মাথা নাড়ল, যেন আমার কথা তার বিশ্বাস হল না। বলল, নিশিবাবু তোমার মাকে মাস খরচা দেয়, বাবুর নিজের খরচার খাতায় তোমার মার নাম দেখেছি।

("নিশীথ ভুল দেখেনি ত?")

না। নিশীথ ঠিকই দেখেছিল। পরে আমি মা-র কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম, নিশিবাবু ছাবিবাত্ত ভেবে আমার জন্যে লাদন দিয়ে যাচ্ছেন, চোদ্দ বছর বয়স থেকে।

("আশ্চর্য, নিশিবাবুর যে অনেক বয়েস।")

অনেক; আমার মার সমান সমান।

("ব্যাপারটা জানার পর তুমি কী করলে?")

অল্প বয়সে ঝোঁকের মাথায় মেয়েরা যা করে। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরতে গিয়েছিলাম। মরা হল না। মরতে গিয়ে না-মরলে ফিরে আর মরা হয় না। বাঁচার কষ্ট সইতে পারে না বলে মানুষ মরতে যায়, মরার কষ্ট জানতে পারলে বাঁচতে চায়। কাপড়ে নতুন করে আগুন ধরাব কিংবা গলায় দড়ি দেব—সে-সাহস আর আমার হয়নি। বাঁচা মরা দুইই সমান কষ্টের; ওরই মধ্যে বাঁচাটা কেমন লোভ দেখানো—আজ মনে হয় কাল বুঝি কপাল ফিরবে, কাল মনে হয় পরশু...

("এ-ঘটনার পর নিশীথ আসেনি?")

না। নিশিবাবু তাকে জুতো মেরে গেলা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গোলার লোকে বলাবলি করল, আমার জানে সে মন্তর দিয়েছিল, নতুন ষোলো বছরের মেয়ে আবার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরতে যায় নাকি। এতটা সতীপনা অজানের পাড়ায় আর কেউ দেখায়নি। নিশীথ পুলিসের ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

("তারপর বোধ হয় নিশিবাবু আসরে এলেন?")

এসেছিলেন। যতদিন ওপর ওপর চোখ ছিল—রক্ষে ছিলই—ততদিন আমার সুখ্যেতে গলে পড়েছিলেন। একদিন আমার শরীরের পোড়া জ্বলজ্বলে দাগগুলো তাঁর চোখে পড়ল। নিশিবাবু সেই যে চলে গেলেন আর এলেন না।

("মাস খরচাও বন্ধ হল?")

হল। মা বলল, এর চেয়ে আমার মরাই ভাল ছিল।...আর একদিন বুঝি হিতৈষিরত্ন হালেই বলেছিল, এই নুনে পোড়া তরকারি নিয়ে আমি করব কী, কার পাতে দেব, সবাই থু থু করে ফেলে দেবে।

("তোমার মরা মায়া মমতা ভালবাসার বালাই ছিল না দেখছি। কী স্বার্থপর নীচ মন!")

এক সময়ে আমিও তাই ভাবতাম। কার মনের তলায় কতটুকু আছে বোঝা মুশকিল। নিশিবাবু চলে গেলে মধুসূদন যাওয়া আসা সুরু করেছিল। মধুসূদনকে চেনেন ত! সাইকেল-সারাই দোকানের মালিকের ছেলে। তার মনটা বড় ভাল। একটু বুঝি মাথা গরম। মধুসূদনকে দেখে আমার আশা হয়েছিল। সংসারে আর পাঁচটা মানুষের মত এ-লোকটা হয়ত ধরা বাঁধা হিসেব করবে না। সতের বয়সে পড়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও তখন অনেকটা ফলত। আকাশের চাঁদ ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়াইনি, নাগাল বুঝেই হাত বাড়িয়েছিলাম। মধুসূদন আমায় নিয়ে ঘর করতে পারত। তার ওপর আমার টান হয়েছিল, তাকে আমার ভাল লাগত, হয়ত আমি তাকে ভালবেসে-ছিলাম। মা সহজে সে-কথা মানতে চায়নি, বিশ্বাসও করেনি। পরে একদিন মা বোধ হয় আমাদের কথাবার্তা শুনেছিল আড়াল থেকে। সে-দিনই আমার বলল, ওকে বল দোকান দিতে হয় অন্য কোথাও গিয়ে দোকান দিক, আমার শেষবেশ যা আছে সব আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে এ-বাড়িতে বসে, বউ নিয়ে বাপের কাছে গিয়ে উঠতে হবে—তারপর নতুন জায়গায় বাসা করে বউ নিয়ে থাকুক সে যাক।...মার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার মা আর যাই হক স্পষ্টবাদী, মার মধ্যে ছল চাতুরী ছিল না। মুখে যা বলেছে মা তার নড়চড় করবে না। শেষবেশ বলতে মার আর কিই বা আছে, তবু যা আছে মা দিয়ে দেবে, নিজের জন্যে কিছু না রেখেই। মেয়ের জন্যে মা এর বেশী আর কী পারে! কিন্তু সবার আগে মা চায় মর্যাদা। আমি মধুসূদনের কাছে সরাসরি ওটা চাইনি। বেশ্যার মেয়ে নিয়ে ঘর করা এক কথা, লোক জানিয়ে বিয়ে করা অন্য কথা।

("মধুসূদন রাজী হল না?")

জানি না। হয়ত সে রাজী হত। খেয়ালী গোঁ-ধরা মানুষ, আমার মা আর তার বাবার সঙ্গে রেষারেষি করে, লোক দেখানো বাহাদুরির জন্যেই রাজী হয়ে যেত। ভেবে চিন্তে আমিই রাজী হইনি। মর্যাদাও শরীরের মত, তাই না! একবার পুড়লে তার নানা জায়গায় দাগ ধরে যায়, ফিরে আর তা নতুন করা যায় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম মা বোকামি করে সর্বস্ব খুইয়ে বসলে, আমরা কেউই কিছু পাব না।

("যতীন মাস্টার না বলেছিল আর্য সমাজে নিয়ে গিয়ে তোমায় বিয়ে করবে?")

বলেছিল। যতীন মাস্টার আমায় দেখেনি তাই বলেছিল।

("কথাটা সত্যি নয়, যতীন মাস্টার তোমায় অনেকবার দেখেছে। দেখে ত তুমি তার কাছে নেশা হয়ে গিয়েছিলে। নিত্য সে তোমায় দেখত।")

জানি, যতীন মাস্টারের কথাও আমি জানি। মাস্টার আমায় পথ থেকে দেখত, কখনও বা ভোলাবাবুর চায়ের দোকানে বসে বসে আমার জানলার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। কিন্তু ওর চেখে আমার কতটুকুই

মাণ্ডেভটের 'হাতী মার্কা' কর্ক ও কর্ক প্রোডাক্টস্-এর জন্য আপনার আমদানী লাইসেন্স ব্যবহার করুন। যোগাযোগ করুন :—

জে বি দস্তুর

এণ্ড কোং

২৮, গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

বা ধরা পড়ত! এই মুহূর্তটুকু, দুটো হাত, সময়ে যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম বড় জোর পায়ের পাতা দুটো—এর বেশী কিছু নয়। ভগবান আমার মুখ সুন্দর করেছিলেন, হাত পা গা—সবটাই; আগুনে আমার মুখ পোড়েনি—হাত কিংবা পায়ের পাতাও না; ভেতর পুড়েছিল, শাড়ি সায়া জামার আড়াল ডিঙিয়ে সেখানে চোখ যায় না। নিশিবাবুর চোখ যেদিন এই আড়ালটুকু ডিঙলো সেদিনই আঁতকে উঠে তিনি পালালেন। মাস্টারের বিয়ে আমার মুখের সঙ্গে হত না, তারপর.....! মাস্টার লুকিয়ে চুরিয়ে আমার ঘরে অনেক চিঠি ফেলেছে। আমি সব চিঠি পড়েছি। হাজারবার মাস্টারের একই কথা: পারুল, তোমায় দেখে চোখে আমার আর আশা মেটে না। তুমি কী সুন্দর দেখতে! পাঁকে পদ্ম ফুল। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার ঘুমে আসে না। যেটুকু ঘুমোই স্বপ্নে তোমায় পাশে টেনেনি। ("যতদিন মাস্টার মিন্নে কথা লেখেনি, সত্যিই তুমি সুন্দর ছিলে, পারুল; আজও তোমায় দেখলে নতুনত্ব তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে"।)

আপনি সব জেনে শুনেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। যতদিন মাস্টার পাঁকের পদ্ম ফুল তুলে শুধু কি সাজাত! আমি ফুল নই, মাস্টারও গাছ নয়। নিশিবাবুর মতন মাস্টারও আমায় ফেলে পালাত। মেয়েদের রূপ শুধু যদি মুখে হত আমি নুনে পোড়া ফরবারির মত হতুম না। .....বলতে কি মেয়েদের রূপ স্বপ্ন দেখার জিনিস নয়। যতদিন মাস্টার স্বপ্ন নিয়ে থাকবে বাঁচবে—তবে আবর্জনাকে বেশে চাইবে কেন! ("অল্প বয়স থেকে যা খেয়ে খেয়ে তুমি অনেক শিখেছ, পারুল। কিন্তু এখন যে-ভাবে বেঁচে আছ এ-বাঁচাতেই বা সুখ কী!")

সুখ অসুখ জানি না। বাঁচার সুখ বলে আলাদা কিছু আছে কি না কে জানে! আমার কাছে সবই অভ্যেস বলে মনে হয়। জানলা রাত্তিরে জলে ভোর হবার আগে আগেই মরতে পারি না, দিন মাস বছর—বছরের পর বছর ধরে বাঁচতে হয়—কতদিন কত কাল ধরে—সুখ বোধ হয় এর কোথাও নেই, তবু সুখ পাই। কে জানে, হয়ত সুখ পাবার অভ্যেস করে নিতে হয়। আজ আমার অনেক কিছুতেই সুখ। সন্ধে-বেলায় সাজতে বসলে সুখ পাই, বেলার সঙ্গে চুলা করে কথা বলাতেও সুখ। বিশ্বাস করুন, আমি মন খারাপ করে পথে দাঁড়াই না, হাসিখুশী মুখ করেই সাঁজাই; সুখ না থাকলে কে সাঁজাত, কে বা হেসে হেসে আপনাদের আদর; কাছে এলে হাত ধরত, ঘরে এনে বসাত, বিছানায় শুতে দিত। উঁহু, লজ্জা বা মন খুঁত খুঁত করে আমি টাকা নিই না, বরং যদি বলেন বেশ খুশী হয়েই নি। আমার কাছে মানুষ যা চায় আমি দিতে পারি। না না, অভিমান করে বসছি না, পষ্টা কথাই বলছি, বিশ্বাস করুন। এরা যা চায় তার পরমায়ু, অল্প—অল্প বলেই হয়ত সুখ অনেক চায়। আমার যারটা দেখেছেন—একেবারে কোনায় ঘর, এ-ঘরে এখনই কেমন অন্ধকার, প্রয়োজনে আরও অন্ধকার করে নিই। অন্ধকারে অন্ধরা যা পায় নেয়, নিয়ে চলে যায়।

("তুমি কাঁদছ?")

কাঁদছি, কই না! কাঁদব কেন। আমি কি ছেলেমানুষ! এখন আমার বয়স কত জানেন? উনত্রিশ পেরিয়ে এলাম প্রায়, তিরিশই বলতে পারেন। দূর থেকে দেখলে আপনার অতটা মনে হবে না, কাছে এসে হয়ত আরও বেশী মনে হবে। ঠিক কি না বলুন তো!

("তা হয়, তোমার চোখের তলায় কালি পড়েছে, গর্ত হয়েছে; গাল শুকিয়ে আসছে, কপালে দাগ—পারুল, তুমি সুন্দরী ছিলে, এখনও সুন্দর তাকিয়ে দেখার মতন —কিন্তু এখন বোঝ হয়...")

বাসিমাল্য। ঠিক বলেছি না। আপনাদের মুখের কথা আমরা কেমন ধরতে পারি দেখেছেন। মনস্তাপ কথা বলতে আপনি বেশ পটু। যাক, এবার বোধ হয় উঠবেন আপনি—অনেক রাত হয়ে গেল। দেখছেন না, সব কেমন চুপ হয়ে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইরেটা ঘুমঘুমে। হিউমিনিস-লাজিতির বাড়ির তলা দিয়ে যাবার সময় একটু সামলে যাবেন; একটা বিশ্রী গন্ধ ঘুরে বেড়ায় ওরা—ওই যে হালতা সান্যাইয়ের লোকরা।

("নাই বা গেলাম আজ। তোমার ঘর খুব ছোট নয়, ইচ্ছে করলে একটা লোককে রাখতে পার।")

না;আপনি যান। আমার ঘর ছোট, নোংরা, অন্ধকার; এই দমবন্ধ জানলাটা খুলে আপনি থাকতে পারবেন না। অযথা কষ্ট আপনার, অন্ধকারও।

("কেন, কিসের কষ্ট, একটুক্ষণ থাকতে পারতাম—")

বেশিক্ষণ থাকার জন্যে আপনি আসেননি, আমিও আনিনি। আমার কাছে থাকার পরমায়ু যত কম আমি তাকে তত পছন্দ করি।

("দেখ সময় মিথ্যে কথা বলালে, পারুল।")

মিথ্যে! কী যে বলেন আপনি!

("ও বলছি তুমিই তবে ভেবে দেখো। আমি তো দেখছি, চোদ্দ বছর ধরে নিশীথ নিবা বেঁচে আছে, তোমার কাছে থাকার এটাও পরমায়ু, তার কী করে হল।...থাক, উঠি এবার। না না আর আমায় সম্বন্ধ করে দিতে হবে না, বাস্তার মধ্যে গন্ধটা আমি চিনতে পারব, একটা আরশোলা মা জন্মাচ্ছে পাশেই।")

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে পারুল তার ঘর দরজা জানলা কিছু ঠাওর করতে না পেরে অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। পরে বুঝতে পারল, তার বোধ হয় জ্বর এসেছে আবার। খুব জ্বর। নিশীথকে ডাকল, নিশ্বাসের মত নিঃশব্দ সে-ডাক নিশীথ শুনতে পেল না। পারুল হাত বাড়াল—যেন হাতড়ে হাতড়ে কাউকে ছোঁয়ার চেষ্টা করল। কাউকে ছুঁতে পারল না। চোখ মেলে তাকাল, ঘর অন্ধকার। অন্ধকার পারুল জীবনে দেখেনি। সেই অন্ধকারের মধ্যে পারুল অনেক চেষ্টা করল পরজাটা ঠাওর করবার। আশ্চর্য, এই ঘরে দরজা নেই; দরজা জানলা বা আলো-বাতাসের একটা ফোকর—না, ফোকরো কাঁকই নয়।

কোথাও কোনো পথ নেই দেখে পারুল আস্তে আস্তে চোখ বুজল। বোজা চোখে সে অনুভব করল, তার মাথা কাঁপছে, শরীরটা যেন দুলছে, কানের পাশে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে। পারুলের মনে হল, সে একটা বদ্ধ মাল-গাড়ির মধ্যে শুয়ে শুয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে।

নেকনজরে

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এই অসীম জগতে এত লোক থাকতে হঠাৎ কে একজন আর-একজনের বিশেষ নেক-নজরে পড়ে নতুন জগৎ গড়ে তুলবার কারণ হয়, তার কৈফিয়ত খুঁজতে বসলেই মহা ফাঁপরে পড়ে যাবেন। এমন দৃষ্টিবিনিময় যাদের হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দিন, হয়তো দেখবেন, তাদের দু-জনার চোখ-গোল চোখ-গোল ভাব। কালো চোখের চাতুরী এমন দুজনকে আবার কাছাকাছি করে দিন, দেখবেন একজনের চোখ থেকে আর-একজনের চোখে যা বোলানো হল, তার পরশ পেয়ে তখন দুজনেরই চোখ গোল-গোল। নজরবন্দী ও জবাববন্দী। এই পৃথিবীতে সবাই সবাইকে দেখছে (সত্যি কি আর দেখছে?)। যদিও এমনভাবে দেখা আর সেভাবে দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। নয়নে সবাইকে লাগছে না, তাই মনেও নয়। দেখা যখন কটাক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তখনই জানবেন, তার আঘাতে মন-পাখি ছটফট করে।

সবার দৃষ্টির সীমা এক নয়। আপনি কী করে দেখেন তা আপনি জানেন। আমি চোখের সামনে কাচ ধরিয়ে বেশী দেখবার চেষ্টা করে থাকি। সব ঠিক চোখ সেকেণ্ডে কী করে হুসপ করে বার! কবে তা ছাড়া কী যে আদৌ দেখা, তাও কি ছাই করেও জানা আছে! যুধিষ্ঠির দেখলেন, ভীম দেখলেন, দুর্যোধন দেখলেন। কিন্তু দেখার মতো দেখা দেখলেন এক অর্জুন। এমন লক্ষ্যভেদের চাহনি কজনের থাকে বলুন? রাজা মশাইয়ের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এখনও তিনি দিদিমাকে নিরিখ করে যাচ্ছেন। এ দৃষ্টি হল পরম নিরুত্তাপ। আবার একটি ছেলে যেমন করে একটি মেয়েকে দেখে, সে দেখা আশ-না-মেটা দেখা। আইনস্টাইন দুনিয়ার কুট-জটিলতা-রহস্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট দেখেছিলেন তা বলাইকের দেখা। রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর ফুল-ফল লতা-পুষ্প, পশু-পক্ষী প্রকৃতিকে যে কী চোখে দেখেছিলেন! কালো হরিণচোখ দেখেও যত তাঁর চোখ ছিল। দৃষ্টির ফল নেই চোখের ওপর দিয়ে তিনি স্বপ্ন-রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেন। আর ওই ছিটফোঁটা এক বোধ হয় ইভা ব্রাউনকে ছাড়া সারা দুনিয়াকে দেখেছিলেন হিটলার। কালো মাত্র বস্তুতের হয়ে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে সামনে পিছনে ডাহিনে-বাঁয়ে।

যখন শুনতে পাস ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা এই কথাটি...

ঠিক সেই রকম না হলেও আর-এক রকম আপসোসের দৃষ্টি নিয়ে, দিনের মধ্যে সামনের নিকের সাঁটের কেউ কেউ পিছনে দুকপাত করেন, যখন শুনতে পান ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা এই কথাটি। এই দুই দেখার মধ্যে প্রভেদ কম নয়। পাইলে একজন, আর হারালে আর-একজনের মুখ নাড়া দেখে আসা—এ দুয়ে না-দেখেও দেখা, না-শুনেও শোনা। চক্ষু একরকমের নয়—লোকচক্ষু, মনশ্চক্ষু, দিব্যচক্ষু। কিন্তু হরিণচক্ষু হলেও মুশকিল, সেখানে ভুল হলে পড়লে উল্টিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব।

দুই চোখে ক্যামেরার দুই ল্যান্সের বসানো আছে। প্রকৃতির তৈরী এই ক্যামেরা না থাকলে দামী ক্যামেরারও কোন অর্থ হত না। দিনরাত এই চোখ-ক্যামেরা নিয়ে আমরা অজস্র ছবি তুলছি তার ইয়ত্তা নেই। ছবি চোখ দিয়ে তোলা হলেও তা ব্রেনে গিয়ে ডেভেলাপ হয়। কবি যখন বলছেন, "নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই", আসলে সাঁটা হয়েছে মাথার স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে।

প্রকৃতিদত্ত এই ক্যামেরার বিশেষত্ব অনেক। চোখের বাইরের সাদা অংশটি কর্নিয়া—যাকে সেফটি গ্লাস বলা যেতে পারে। এটা সব সময়ে ভিজে থাকে। চোখের পাতা ও পাতা নয়, এ যেন উইণ্ড স্ক্রিন ওয়াইপার। নেত্রপল্লব বহিরাগত থেকে চোখকে রক্ষা করে। ভুরু দুটি উড়ন্ত চিলের ডানা, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। একটু কটাক্ষ করলেই বুঝবেন আবার উড়ে চলে যাবে। কর্নিয়ার সাদা জায়গার মাঝে লেন্স বসানো আছে—যার ভিতর দিয়ে আলো বাহির-বিশ্ব থেকে অন্তর-বিশ্বে প্রবেশ করে বাইরে থেকে আলো ভিতরে রুপালী পর্দায় গিয়ে প্রতিফলিত হয়। লেন্সের সাহায্যে কাছের ও দূরের ছবিকে সহজে আয়ত্তাধীন করা চলে। লেন্স পর্দার ছায়া ফেলবার জন্য অহরহ নড়চড় করে। প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টির জন্য চোখের লেন্স ঘুরঘুর ঘুরছে। একজন দু বছরের শিশু যত কাছের জিনিস দেখতে পারে সে তুলনায় একজন তিরিশ বছরের যুবা হয় কাছে দেখতে পায় না। অন্যূন চল্লিশ বছরের বয়োলোক তখন থেকেও দূর থেকে জিনিস দেখবে। পঞ্চাশ বছরের কেউ আরও অনেকখানি

হওয়াত পর্যন্ত চোখে। ফোকাস নষ্ট হয়ে গেলে চোখের ভেতরে উপযোজন (একোমোডেশন) ক্ষমতা নষ্ট হয়। সেই জন্য চশমা দিয়ে নতুন দৃষ্টিসংযোগ করতে হয়। অবশ্য চাঁদনী রাতে বিনে চশমায় একজন আর-একজনকে তাজমহল দেখিয়ে যে দৃষ্টি-দান করে, তেমনি দৃষ্টিসংযোগের সাধ্য কোন চোখের ডাক্তারের নেই। মনের ডাক্তার হলে উপায় নেই। স্বাভাবিক চোখে রেটিনা থেকে ছায়া-রেখা নামক পর্দায় এসে পড়ে। দীর্ঘদৃষ্টি বা লং-সাইটেড হলে রেটিনার পিছনে ছায়া পড়ে। আর অল্পদৃষ্টি বা শর্ট-সাইটেড হলে রেটিনার আগে এসে পড়ে। দীর্ঘদর্শীরা কিন্তু সব সুদূরদর্শী নন। চোখের সামনে কাচ লাগিয়ে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়। তাদেরই আমরা চশমা পরতে দেখি চোখে

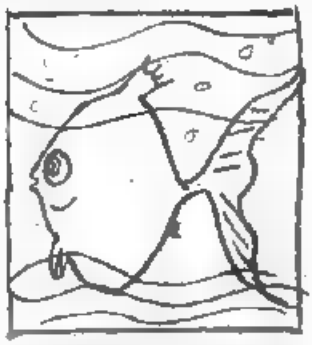

উলের মতো হাত দুটো সব সময় তাকিয়ে আছে তো আছেই, সেখার বিরাম নেই

চোখের সামনে কাচ লাগিয়ে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়

রেটিনায় ছায়া প্রতিফলিত ঠিকভাবে হয় না। ফলে হাস-সাদৃশ্য দাঁড়িয়ে একটু নজর করে দেখলেই দেখা যায়, পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে থাকলে সবাই দূরে থেকে কাছে পর্যন্ত সব দৃশ্যবস্তুর মধ্যে বাসটিকে ফোকাসে দেখতে পাচ্ছে না। তারা পারে না, বুঝতে হবে, তাদের চোখের রেটিনায় ছায়া ঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

চোখের ক্যামেরায় দৃশ্যে কতখানি আলো প্রবেশ করবে কি করবে না তার জন্যে আছে আইরিস ডায়াফ্রাম বা ঝলমিকা পর্দা। রেটিনা পর্দার সঙ্গে চোখের স্নায়ুর যোগ আছে। রেটিনার পর্দায় আলোকগ্রাহী সেল (Photosensitive cells) আছে এই সেলের দু রকমের নাম রড ও কোনস্ (Rods and Cones) যার সেলাইয়ের মানের মতো। প্রথমকে বলে রডস্ আর দ্বিতীয় মাঝে মাঝে ফোকাস আছে। বাইরে থেকে আলোর যতটা চোখের ভেতরে যায় কিন্তু, প্রায়ই দেখি-না তা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে রেটিনায় ফেলে আর ও চোখের ভিতরে ওদের যে রড ও কোনস্রা

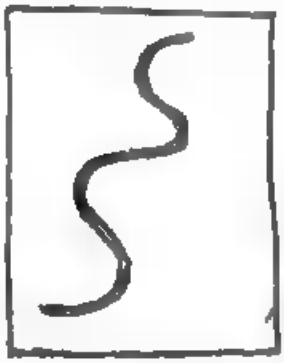

ছোটো জানির তলার তলার খুঁজে বেড়ায়, চোখ বলতে তাদের যা বুঝি তা ওর নেই

নিরালায় দু'জনার

আলোকচিত্রী : শ্রীঅনিল বসু

স্পন্দিত করে তোলে। ছাপার হরফে আমরা যে-সব ছবি চোখে তা প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১০০টি বর্তুলাকৃতি হিসাবে বসানো থাকে। চোখের ক্ষেত্রে অবশ্য ছিলাম ঘটতে দেখা গেছে কিন্তু 8700 points per inch। সমস্ত রেটিনায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন পয়েন্ট আছে এবং একটি পয়েন্ট থেকে আর-একটি পয়েন্ট এত কাছাকাছি যে তাদের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র ০·০০৩ মিলিমিটার। কোন কোন পাখির চোখে আরও তীক্ষ্ণ ছায়াগ্রহের কাছাকাছি পয়েন্ট থাকে। চোখের সামনে কেউ যখন হাত ঝিলিক দেখাচ্ছে তখন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই মুহূর্তের ছায়া অবশ্য কতটুকু কতে পারলেই ফেলে যাচ্ছে এবং চোখের ভিতরের রেটিনার মধ্যে অবস্থিত রড ও কোন্‌গুলের পয়েন্টগুলোকে আলোড়িত করে তুলছে। রড ও কোন্‌গুলের ভিতর অবস্থিত পয়েন্টের সংগে নার্ভের যোগ আছে। আর সেই স্নায়ু-তন্তুগুলি একত্রিত হয়ে চক্ষুস্নায়ুর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। কোন বাস্তব জিনিস দেখা হলে তা রেটিনার ভিতর এসে শেষ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক সিগন্যাল-রূপে নার্ভের ভিতর দিয়ে মাথার তাকাতে গিয়ে পৌঁছয়। আমার সেখানে ছোট ছোট পয়েন্টগুলি একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়।

জীবজগতে চোখের নানা রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একচোখী প্রাণী আমিবার চোখ নেই; তবু আলো-অন্ধকার টুকুও করবার শক্তি তার আছে। কোনটির স্পর্শকাতরতা সুস্পষ্ট। কেঁচো মাটির তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায়। চোখ বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা ওর নেই। তবে আলোর সংস্পর্শে মস্তকের মধ্যে স্পষ্ট ওর গায়ে আছে। কেঁচোর কাছাকাছি জীব ছোটকের চোখ আছে। আরশোলার দশ জোড়া চোখ নিয়ে দেখা। কিন্তু সে দেখা কতখানি সার্থক তা অন্যরা বিবেচ্য। পতঙ্গ-দের অনেকের চোখ আছে। এই চোখের নাম হয় পুঞ্জাক্ষী। এদের আধার হাজার চোখের মেলা। তাই এক দেখা মানে হাজার বার দেখা। আশে-পাশে, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা না ঘুরিয়েও এরা দেখতে পায়। কিন্তু পতঙ্গ পুঞ্জের তার সোসর তোমাদলকে ভুলেও কখনও বলবে না—বিধি, তাদের আঁখি যদি দিয়েছিলে সে কি আমার পানে তুলেও...। জন্তুর মধ্যে মাছ চোখ মিলে সব সময়ে তাকিয়ে আছে ও আছেই। সেখানে বিরাম নেই। কোন কোন মাছী-মুখের চিলের আছে—তবে তা দিয়ে কাউকে তাক করতে পারে না। ভূ-পাখারী প্রাণীরই Binocular Vission; পেচা শ্রেণীর পাখী না হলেও Binocular Vission-ওয়ালা।

যারা Vission-টার মধ্য দিয়ে mission খুঁজে পান, তারা চক্ষুষ্মান। তাঁদের দৃষ্টি শুধু বাইরের দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এক-কিছুর ভিতরে অন্তর্লোকেও প্রসারিত। সেই জন্যে মানুষ শুধু নিজের দেখে না, সে কখনও কখনও দ্রষ্টা হয়ে ওঠে। লিওনার্দো বা ভিঞ্চি দু চোখ দিয়ে যা উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক স্থান-কাল-পাত্রকে পার হয়ে বহুযুগের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। কোপার-নিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি মহাজনের দৃষ্টি এমনি সুদূরপ্রসারী ছিল। রামমোহন রায় কবে এসেছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের মত ও পথ তাঁর মানসচক্ষে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

'চোখে চোখে শুধু দেখাই হয় না, তখনও অনেক আরও কিছু হয়। যৌবনের উৎসব দৃষ্টির বসন্তে। কাজলবিহীন সজলচোখে যারা মনের ফাঁদ পাততে পারেন, তাঁরা সুদেহী। তাঁর চোখ থেকে কখনও তীক্ষ্ণ তাঁর ছুঁড়তে বা তরবারির দিশ্ব জ্যোতিচ্ছটা ঝলাতে পারেন। তবে কি না বয়সের সঙ্গে তার ভাবাকুলা-লোচনার সে-ভাব থাকে না। 'তখন কালো জল পড় করে কাজল নিয়েও আর-কিছু হয় না। সেজন্যেও আর-কেউ এসে এমনিতে ধরা দিতে চায় না।

সৃষ্টি যতদিন আছে, ততদিন শুধু বিস্ময় কুড়াবার জন্যে চপল আঁখিকে বনের পাখি হয়ে পালাতে দিও—ভাবের স্বর্গকে খুঁজে নেবেন। নিয়ে চলেনেই, এ আকাশে সব তারার মধ্যে নিজের কাছে যে দৃষ্টি সচকিত তাকে আছে, সে দৃষ্টি না থাকলে সব তারা, সূর্য, চন্দ্র থাকা-না-থাকা সমান হত। বর্ণবিন্দুগুলির মেল কথা বুঝতে হলে চোখের ভাষা বুঝবার আলা করাতেই নিতে কোন দৃষ্টি-বিজ্ঞানী কখনও ভরসা না।

প্রতিবন্ধ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আর একটু পরে সামনের বাড়ির সেকেণ্ড মোটরটা ঘুঁকতে ঘুঁকতে এসে দাঁড়াবে। কয়েকটা কর্কশ হর্ন বাজবে পরপর। একটু শব্দ করেই ছেলেরা চাকরটা দরজা খুলে দেবে। তারপর সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। সেই অর্ধবৃদ্ধো ভদ্রলোক আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাবে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটা। কল্পনার জানলার কাছে এসে দাঁড়াবার সময়। দাঁড়িয়ে হলদুদের বাগান। হাতে সবুজ সবুজ চুঁড়। কপালে অল্প অল্প ঘাম। ভিজে-ভিজে চোখ। আর সারাদিন সংসারের খুটিনাটি সামলে ছোট একটা ঘরে ছটফট করার উৎকট ক্লান্তি সমস্ত শরীরে। নীতীশ ফিরবে এখন।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। চাওয়াকে ফেরে আছে এখনও। বাইরে ঝিরঝির একটানা শব্দ। ছেলেরা ফাঁকা। একটা লোকও নেই ডাকবাংলোর পাশে সারাদিন শুয়ে থাকা রোগা কুকুরটা জলের ভয়ে কার বারান্দায় গিয়ে উঠেছে কে জানে। জানলার সস্তা সবুজ ছিটের পর্দাটা ভিজে সপসপ করে। হাওয়ার কাপটায় থেকে থেকে ওঠে নামে। আর এরা ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে চমকে ওঠে কল্পনা। কেউ ফেরেনি এখনও।

কোন সকালে বেরিয়ে যায় নীতীশ। জলে ঝড়ে শীতে গ্রীষ্মে ক্ষোভ। নিয়মের এদিক-ওদিক হয় না। মনের মধ্যে ছিন্ন ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলেও রোজকার বাঁধা কঠিন ছকটা উল্টে দিতে পারে না কল্পনা। ছয়—কখনও বৃষ্টির জল। হয় শাড়ীর ছুতো ফেলে যায়, নয় চুঁড়ে স্যুটকেস ছেড়ে। তারপর আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে টিন-চার ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে অবার যখন সে রাস্তায় নামে তখন দাঁতের আলো ঠোঁটেও চোখ দুটো আপনা হয়ে যায়। ছাড়া একটা ইস্ত্রি ধরা থাকে সুটকেস আর্দ্রতা টিফিন বক্সে। রাস্তায় ঘাঁড়ায় ঝিনুকের ঠোঙা।

এরপর মাঝে মাঝে আরও কাজ থাকে। মাসের শেষে ট্রেনে, ছাদ ফো প্রেমের কাছে নিজের মুখে টাকা ধার করতে যাওয়া। সব ছেলে যখন গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায় নীতীশ, তখন হাতেও মেন ক্লান্তিতে নিষ্প্রভ হয়ে। পুরুষের ঘরে নিমগাছটা ঘিরে হয় থাকে। মিষ্টির দোকানের রঙ্গ ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো দেখা যায়। আর কুকুরটা ঠিকের করতে করতে হঠাৎ পথ ছেড়ে দেয়। রোজকার মত আশে-পাশের মুখগুলো একরকমই থাকে—শুধু নীতীশের কোন দিকে চেয়ে তুলে তাকবার মত মনের অবস্থা থাকে না। ক্লান্ত শীর্ণ একটা মুখ কোনরকমে বিছানায় নেই

ঠিক কি যখন নীতীশের এ'টো থালা-গেলাস তোলবার জন্যে ঝুঁকে পড়া শরীরটা একটু আগে তখন সে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রামে উঠে বসেছে। কোন কথা নেই মুখে। মাঝপথে অল্পবয়সী ছাত্রের বাড়িতে নামতে হবে। সেখান থেকে স্যার আপিস।

শনিবার ছাড়া আপিসের পর আর এক-দিনও সোজা বাড়ি ফিরে আসতে পারে না নীতীশ। চৌরঙ্গী আর এসপ্ল্যানেডে যখন হু হু হাওয়া আর আকাশ চিরে-চিরে আলোর রেখা ঝলসে ওঠে, পুরনো গাছের পাতায় আর ময়দানের ভাজা সবুজ জাগে, তখন হঠাৎ এক সময় সে বোবা একটা পশুর মত মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকায়। শুধু অজস্র মানুষের ভিড় আর হোটেলে রেস্তোরাঁয় কিংবা প্রেক্ষাগৃহের গরমায় ধোঁয়াশ তলোয়ারের মত ঝকমক করে জীবন।

দুটি মুহূর্তে ফিরে আসে নীতীশের। ট্রামে ওঠবার চেষ্টায় ধাক্কাধাক্কি অনেক মানুষের সঙ্গে। শরীরে কখনও গরম

এগিয়ে দিতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

কল্পনা নীতীশকে দেখে দিনের পর দিন। একটু একটু করে ঝরে যাওয়া রুগ্ন একটা শরীর। ভাবনায় আর ক্লান্তিতে জিভটা যেন অসাড়। মুখে কথা আসে না। একটা ঠাণ্ডা আতঙ্কের আপনাও শিরিয়ে আসে। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অর্ধ-ঘুমন্ত লোকটার মুখে অলৌকিক একটা কিছু করে হাসি ফোটাতে চায়।

তাই মাঝে মাঝে কল্পনা এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। বিয়ের সময় পাওয়া অল্প দামের নিষ্প্রভ একটা আয়না। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে মুখ অস্পষ্ট হয়ে যায়। অদ্ভুত দেখায়। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হাসি আসে যায়। আর নিজের আসল মুখটা দেখবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ নিঃশব্দে লম্বা একটা দুঃখের ট্রাম রাস্তার ধারে বটগাছটার মত স্থিমিত। বাই-বাই করেও হার না। বাইরে কড়া রোদের ঝাপট। ঠেলে ঠেলে ঘোরওলা ভেতর

যাচ্ছে। তখনও ঘাসেদের শব্দ হচ্ছে মৃদু। কখনও ঘুমঝুমি বাজছে ঘুমের ঘুমুরে। কল্পনা আরশোলার সারসে দাঁড়িয়ে নিজেকে যাচাই করে।

শরীরটা শুকিয়ে গিয়েছে। চোখ দুটোর যেন ভাষা নেই। শিশির দুটো গাল। কিন্তু না থাক মুখের ক্লোরোফিল, পায়ের জোর বোধহয় এখনও ঠিক তেমনি আছে। মাটিতে পা ঠুকে সুকৌশলে শব্দ করে দেখে। অনেক-দিনের অভ্যাস, হয়ত একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু একটু একটু করে অভ্যাস করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন নীতীশ ফিরে এলে হয়।

শাড়ি তুলে নিজের পা দুটো টিপে টিপে দেখে কল্পনা। আর কিশোরী জীবনের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়। ছোট্ট একটা চঞ্চল শরীর। তরল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতি। রাজনন্দ ঘাসে ভরা মাঠের এদিক থেকে ওদিকে ছোট হরিণীর মত।

কিন্তু যতই অভাব থাক সংসারে, মাস্টারের টাকা পাঠান হক বা নাই হক, মাইনের তারিখে ঠিক-কি মুখহর করবে কিনের পর দিন, চেহারাটা বুঁড়িয়ে যাক নীতীশের হু হু করে পাকুক মাথার চুল —কল্পনা জানে যে সে যদি নাচের ইস্কুলে অল্পশিক্ষের কাকটা নিয়ে কিছু রোজগারের কথা তোলে তাহলে চেহারে উঠবে নীতীশ। চোখ দুটো ওরোজ্বলে বিস্ময়ে অনন্যরকম হয়ে যাবে। ঝকঝক করে তাকাবে। জোর করে শীর্ণ মুখে হাসি টেনে বলবে, 'পাগল নাকি।' তারপর পাশ ফিরে পড়ে থাকবে মড়ার মত। ঘুমোবে না। টাকার ভাবনায় নিকীর্ণ হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে তার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনে কল্পনা মনের মধ্যে শাশুড়ীর ভাষা হাতড়ে ফিরবে।

তখন ইন্দুরের বাচ্চাটা কিচকিচ করে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াবে আরশোলার উপর একটা আক্রমণাত্মক খরর্ খরর্ করবে। ছাতার কুকুরগুলো হঠাৎ আরও জোরে ডেকে উঠবে। আর টংটং করে রাতের নতুন জায়গায় রাত বারোটার ঘণ্টা বাজবে।

জানলার কাছ থেকে সরে আসে কল্পনা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কাদা টপ্পে-টপ্পে আসছে নীতীশ। এ-সময় এ-পাড়ায় আর কেউ যেতে না। পায়ের শব্দ কল্পনা চিনতে পারে। ধপ করে মাটে একবার ক্রাচ হাতে ভর দেয় নীতীশ। রাস্তার আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। ঝিমিনিতে কল্পনা করছে লালচে একটা গ্রহ।

নীতীশের চেহারা দেখে হাল ছেড়ে যায় কল্পনার। ভিজে কুঁকড়ে গেছে সোয়েটার। জায়-মলিন পাঞ্জাবিটা চুপসে গিয়েছে কুঁচো কুঁচো গেঁয়ার ঘামে। চুল বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। যদি অসুখে পড়ে তাহলে তার চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় হাসপাতে হাসপাতে মরবে একটা লোক। তাকেও মারবে।

আজে কর্কশ হয়ে ওঠে কল্পনার গলার স্বর, "কী আশ্চর্য! এমন করে ভিজে আসতে হয়? ছি, ছি, এটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?"

ভিজে ঘুমোন জামাটা বাড়ে একবার ঝেড়ে নিয়ে অপরাধীর মত হাসে নীতীশ, "ট্রাম থেকে নামতেই জোরে জলটাও এল—"

"কে তোমাকে নামতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল শুনি? বৃষ্টি করে আর একটু এগিয়ে যেতে পারলে না?"

"এত রাত হয়ে গেছে", ভেজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নীতীশ বলে, "আর কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে তুমি?"

"রাতই যখন হয়েছে তখন না-হয় আর-একটু হত", গজগজ করতে করতে একটা গামছা তাড়াতাড়ি নীতীশের হাতে দিয়ে কল্পনা বলে "নাও শিগগির ভাল করে মাথা মুছে কাপড় বদলে নাও—আমি দেখি উনানে একটু আঁচ আছে কিনা। আর-তরকারি এতক্ষণে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

একটা চকচকে-যন্ত্রের মত খাবারের থালা নিয়ে আসে কল্পনা। নীতীশ আর তাকায় না তার দিকে। বিষণ্ণ মুখে আস্তে আস্তে ভাত মাখে। আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে কি ভাবে। তৎক্ষণে আর একটা থালা নিয়ে কল্পনাও বসে পড়েছে তার পাশে। জল-কম তরকারি। নামমাত্র ডাল। নীতীশের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালায় কল্পনা। রাত অনেক হল।

"বৃষ্টিটাও এমন সময় এল," ঢকঢক করে জল খায় নীতীশ, "আর কোন কাজ হল না আজ। কাঠের বাড়িতে বসে বসেই সময়টা নষ্ট হল—"

মুখ তুলে কল্পনা কিজ্ঞেস করে, "আবার কী কাজ?"

"বাঃ, দুটো টাকা মোটে আছে না তোমার কাছে? কাল বাজার পরশু [redacted] চলবে কেমন করে?"

"থাকগে, এখন আর লোকখুঁ ভেবে মুখ ভার করতে হবে না ছোকরার। জোড়া-তাড়া দিয়ে আমি ঠিক চালিয়ে নেব।"

নিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলে, "তুমি আর জোথা থেকে চালাবে?"

খাওয়া শেষ করে খাটে গড়িয়ে পড়ে নীতীশ। একটা বাসন মাজবার কুলের কাছে রেখে আসে কল্পনা। ঠিক কি আসবে ভেবে ছটফট। খেদিন না আসে সেদিন তার কোনদিকে তাকাবার সময় থাকে না। থেকে থেকে চিৎকার করে নীতীশ সমস্যাটা জানিয়ে দেয়। তার সব সময় তার পক্ষে বেরি হয়ে যায়।

রাত ডাকছে নীতীশের। হাতের দু-একটা ভাজ সারতে সারতে কল্পনা দূরে থেকে তাকিয়ে থাকে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে। কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়েছে। ম্যাকাসে মুখ। সারাশরীর ক্লান্তির গভীর ছাপ। দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা চোখে কল্পনা ঘুট করে আলো নিবিয়ে দেয়।

একরাশ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসে কল্পনা। নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে হাতটা রাখে কপালের উপর। হাওয়ায় শীত-শীত লাগে। কাছাকাছি কোথা থেকে একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ আসে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না তার। স্নায়ু টনটন করে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা। বড় রাস্তা দিয়ে মোটর ঘড়ি যাওয়ার সময় চঞ্চলতা। বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করে অনেকক্ষণ নীতীশের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে যায়। নিকটে একটা দেহ পড়ে আছে তার পাশে। অথচ অচেতন।

অন্ধকারে ছটফট করতে করতে আকাশের কিলিকে তারে কল্পনার সাধার। অতীতের শিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কান দুটো যেন বন্ধ হয়ে যায়। তার মনে হয় যে সে এখন কথা বলতে পারবে না। গলা বসে গেছে। ভাঙা-ভাঙা স্বর বার হবে।

পাশে পড়ে থাকা ঠাণ্ডা পাথরটা নড়ে না। নাক দিয়ে অস্বাভাবিক শব্দ বার হয়। থর-থর করে কাঁপে কল্পনা। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। ছোটবেলার টক ছোঁয়া জাগে শিরায়-শিরায়। পুরোর চন্দনবটকে জাগাতেই হবে। নীতীশের হিম-শরীরটার উপর নিজের আগুন-ভরা দেহ অকাতরে মেলে দেয় কল্পনা। ছাতাকাশে মুখটা মুহূর্তের জন্যে আলো রূপ নিক। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অন্তর্দাহের এই খোঁচা সহ্য করতে পারবে না সে, ঝিকঝিক করে জ্বলতে পারবে না। একটা অবয়ব আস্তে আস্তে গড়ে উঠুক তার রক্তের স্বাদ নিয়ে। রূপ বদলাক। তার মধ্যে ছটফট করে ভয়ঙ্কর নির্জনতা দূর করে দিক। তারপর তার দেহ ভোজ-পাড় কাপে আসুক তার সন্তা দিনরাতের সঙ্গী হয়ে।

হিমশীতল কঠিন পাথরে মুখ ঘষে কল্পনা। ঘুমের ঘোরেই নীতীশ আর একটু দূরে সরে যায়। কল্পনার বাম হাতটা আস্তে সরিয়ে দেয় নিজের ঠাণ্ডা বুকের উপর থেকে ঈষৎ বিরক্ত। আর ঠিক তখন একটানা ঝিঁঝির মতো শহরতলীর শেয়াল ডেকে ওঠে।

নীতীশের মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে স্বরটা উগ্র করে তোলে কল্পনা, "মুখে-শুয়ে দুটো কথা বলতে পার না আমার সঙ্গে?"

শঙ্খ, ফিসফিস করে তাকায় নীতীশ, "ভোর হয়ে গেছে?"

ভাঙা গলায় কল্পনা বলে, "শুনছে নাকি তুমি?"

কিছু বুঝতে না পেরে খাটের উপর নীতীশ উঠে বসে, "কারে হল কী তোমার, অ্যাঁ?"

"কিছু না।"

এদিক-ওদিক তাকায় নীতীশ। ভোর হতে অনেক দেরি। গভীর রাত। হঠাৎ বিরক্তিতে চোখ দুটো ছোট হয়ে যায় তার। একটু বেশী শব্দ করে খাট থেকে নামে কল্পনা। নূপুরদুটো পা ফেলে কুজোর কাছে এগিয়ে গিয়ে পরপর দু-গেলাস জল খায়।

"কী হল কি?" ভুরু তুলতে তুলতে আবার নীতীশ জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না। তুমি ঘুমোও।"

"কি যে বিটলামি? কর রাত-বিরেতে", পাশ ফিরে বিড়বিড় করে নীতীশ, "কাল ভোরে উঠতে হবে না? এখন রাত কত জানো?"

চিৎকার করে ওঠে কল্পনা, "না না না। তোমার কাছে নিশ্চয় রাত সতের দুপুর যত সমান—কালের অবরে বইবার কী আছে?"

"তবে ঘুমোও চুপ করে।"

আর কোন কথা বলে না কল্পনা। কার সঙ্গে কথা বলবে? কাকে দেখাবে? প্রাণ আছে নাকি তার পাশের মানুষটার? উত্তেজনায় চোখ বুজতে পারে না সে। নড়ে না। কথাও বলে না। চুপচাপ শুয়ে জল গড়ায়। আর পাশেরটির মহা কল্পার আওয়াজে সে কিছুতেই ঘুমোতে পারে না।

তখন একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগে তার কপালে। নীতীশ ঝুঁকে আছে সন্তর্পণে।

"কাঁদছ কেন?" ভিজে গলায় শুধায়, "ছি, এত রাতে এমন করে কাঁদতে নেই—"

নীতীশের হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ছোবল তোলে কল্পনা, "কেউ নেই আমার—কেউ নেই। একদিন একা-একা মরি, ঠিক করে রেখেছি—"

"এ কি কথা?" কল্পনার মুখটা কোন রকমে কল্পনার কাছে টেনে নিতে আসে নীতীশ। তার হাতের ধাক্কাটা এতক্ষণ পর বুকের ভেতর তাকে অসহ্য করে বলে, "আর একটু রাত—একটু পরিষ্কার নিই।" কথা বলতে বলতে সে যেন হাঁপায়, "এই অন্ধকারে সাহারার মরু একটা কাঁচা প্রশ্ন এনে দাঁ

হবে? তুমি আরও দেরি হলে পরে যেও—"

একটু শান্ত হয় কল্পনা। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "আমার কাউকেই দরকার নেই।"

বুক থেকে মাথা নিয়ে নীতীশ শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আর কল্পনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলে—পাছে নীতীশের ঘুম ভেঙে যায়। সারা দিন এত খাটাখাটির পর ভাল করে যদি ঘুমোতে না পারে মানুষটা, তাহলে বাঁচবে কেমন করে। ওষাঁর নিজের ওপর কল্পনার রাগ হয়ে যায়। ক্লান্ত নীতীশের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এমন করে আঘাত করবার দুঃখটা যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে চায় না। ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু দুজন মানুষের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

এমন করে জানানো যায় না। চোখের দু ফোঁটা জল ফেললেই অভাবের জ্বালাটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে না। কিন্তু ওতে লাগছেই হবে। ওর শুকনো কালো-মাখা মুখে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সোনালির স্বাভাবিক জৌলুস। তখন ওর শরীরে এত অবসাদ থাকবে না। অকাল সায়ংকা শিথিল করে দেবে না গায়ের গামড়া। ভাবনার ভাবনায় কল্পনার যৌবনকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার সাহসও ওর থাকবে না তখন। ওর করবার না পাবে হৃদয় কল্পনা আর কাউকে এনে দেবে এই অভাবের সংসারে। কিন্তু তা কেমন করে হবে। তা কি কোন দিনও হবে না? ক্লান্তির এত অভাবের এই সংসারটা ছড়ে ছড়ে গিছে দুজনের দেহ—তার কি হবে।

একটু আগে আজ ফিরে এসেছে নীতীশ। শরীরটা ভাল নেই। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সমানা জ্বরও হয়েছে বোধ হয়। দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরেছে। লাল-লাল চোখ।

একটা গেলাসে অল্প জল ঢেলে নীতীশের পাশে এসে বসে কল্পনা। কাপড়ের ছোট একটা মোড়ক খুলে দুটো বড়ি মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলে, "খাও।"

"এটা কী?"

"ওষুধ। খাও না বিশ্বটিরি।"

"কোথায় পেলে?" সন্দেহের শুকনো দৃষ্টি নীতীশের চোখে।

"কিনে নিয়ে এসেছি।"

"পয়সা পেলে কোথায়?"

"আমার কাছে ছিল। খাও।"

বড়ি গিলে হাত বাড়িয়ে নীতীশ জলের গেলাসটা নেয়। ঔকন্দরে বলে, "শুধু-শুধু পয়সা নষ্ট কর কেন? একটু মাথা ধরেছে — কাল সকালেই ঠিক হয়ে যেত," একটু থামে ও। জ্বর চোখে তাকায় কল্পনার দিকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, "আর কত পয়সা আছে তোমার কাছে?"

নীতীশের কথার উত্তর দেয় না কল্পনা। গেলাসটা সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ওর মাথার হাত বুলিয়ে দেয়। কয়েক মিনিট ইতস্তত করে। বলবে কি না। না বললে চলবে কেন। বড়ি বাজি না হয়? বুক ওঠানামা করে ঘন ঘন। ভয়-ভয় ভাব। নীতীশের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তার চোখের সামনে একটা জটিল তিল তিল করে শেষ হয়ে আসছে।

চুড়ি দুটো শক্ত করে টুং টুং, মুদি ওদের ফিরে যাচ্ছে রোজ, একবার কেশে গলাটা ঠিক করে নেয় কল্পনা, "পনেরো টাকা বাকী হয়েছে। আর ধারে জিনিস দিতে চায় না। আর—"

ঝাঁঝালো স্বরে খেমে খেমে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, "আর কী?"

"তোমার জন্যে একটা ধুতি না কিনলেই নয়।"

"এখন থাক," চোখ বুজে থাকে নীতীশ, "আরেকটা দিন কিনে দেবে—চোখে বড় লাগছে।"

কল্পনা ওঠে না। আর একটু কাছে সরে বসে নীতীশের। হাত দিয়ে বালিশে ঠিক করতে করতে বলে, "মার টাকা পাঠানো হয়নি দু' মাস। খুব রেগে পোস্ট কার্ড লিখেছেন একটা। উনি জানতে আমিই বোধ হয় টাকা পাঠাতে দিই না তোমাকে—"

"জানেন তো আর কী করবে", কল্পনার হাতটা আস্তে সরিয়ে দিয়ে নীতীশ বলে, "আসছে মাসে কিছু পাঠাব এখন। নিয়ম করে মাসে মাসে পাঠানো সম্ভব নাকি আমার পক্ষে!"

জোর করেই নীতীশের মাথায় আবার হাত রাখে কল্পনা। আসল কথাটা বলতেই হবে এবার। একটুও হাওয়া নেই। ভ্যাপসা গরম। আরশোলা ঘুরো জমেছে। ভ্যাপসা মুখে একটু-একটু ঘামছে নীতীশ। জ্বরটা ছেড়ে যাবে বোধ হয়। পাশের বাড়ির একতলা থেকে ফেলুদের কীর্তনের মাখা-ধরানো আওয়াজ ভেসে আসছে। বলা না-বলার অন্তর্দ্বন্দ্বে কল্পনার হাতটা কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে থাকে। দুরু দুরু আশঙ্কায় বিদ্যুৎ-ঝলকে মাথাটাও ঝিম ঝিম করে। আর একটু পরেই নীতীশ ঘুমিয়ে পড়বে।

একনিঃশ্বাসে বলতে আরম্ভ করে কল্পনা, "রাজু কাকা কাল আবার এসে-ছিলেন—"

"আবার? পরশু খরচ করে যাবার আমাতে হয়েছিল তো? আজীবনের যতই এড়িয়ে যাই—ওরা দেখছি ততই আমাকে পেয়ে বসে।" মুখ দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ করে পাশ ফিরে নীতীশ চোখ বন্ধ করে।

"উনি বলছিলেন—"

"কী? দুশো টাকা ধার চাই?"

"না না," একটু থামে কল্পনা। নীতীশের গালে হাত রেখে শেখান শাঁখের মত কোন মুখস্থ বলে, "ভবানীবাবুর মেয়ের ইস্কুলে একটা কাজ নাকি খালি আছে—"

কাজের কথা শুনে এঁদিকে তাকিয়ে চোখ খোলে নীতীশ, "কী কাজ?"

ভারতে সর্বাপেক্ষা ফাইন
সিল্ক, কটন ও উলের
গেঞ্জী প্রস্তুতকারক
দেশবন্ধু হোসিয়ারী
ফ্যাক্টরী
১৮৩এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯
ফোন : ৩৫—৪৫৪৩ ■ গ্রাম : নিটকুল

রেডিও আর এখন
বিলাস সামগ্রী নহে
ইহা একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ
ন্যাশনাল-একো
২৫০৲ হইতে
আই-আর-পি
১৫০৲ হইতে
জি, ই, সি
২৯৫৲ হইতে
অনুমোদিত বিক্রেতা
ক্যালকাটা রেডিও সার্ভিস
৫৯, গরেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩
ফোন : ২৪-৪৫৪৫

স্টোভে কিরোসেনের এই এক, ধরটা পুড়োনোর জন্যে ছোট ছোট ছেলেদের মত লেখাতে হবে। মাসে মাসে আপাতত মাইনে থেকে একশে. টাকা।"

"সুর," হাই তুলে আবার পাশ ফেরে নীতীশ। কল্পনার কথা শুনে ঘুমটা নিজে যায় ওর, "এ-কাজের খবরে আমার দরকার কী?"

কল্পনা অতীতের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীতীশকে এপাশে ফেরাবার চেষ্টা করে বলে, "আমি বলছিলাম, লক্ষ্মীটি তুমি আপত্তি কর না, কাজটা আমি নিয়েই নি?"

"তুমি?" ঘুম ছুটে যায় নীতীশের। কল্পনার একটা হাত মাঁকিয়ে নিয়ে পুতুলের হেসে বলে, "নাড় লেখানর কাজ তোমার কৈমল করে হবে?"

"খুব হো হবে।" নীতীশের তক্তার ফাঁকে এই হাসিই কল্পনা মুখে সন্তর্পণে চাপা আওয়াজ তুলে নিয়েছে, "তর তুলো গ্রম তোমার। আমার কথা নিজেই তর মনে থাকে না, না?" একটানে হাতটা সে বলে যায়, "ইস্কুলে তবে নাম দিয়ে আমার জানা না? ইচ্ছে করলে এখনও পারি। পাড়ের ছেলে কয় হয়েছে মনে আছে? রাজু, কাজ বলছিলেন, তুলাদীবাবুকে বলে দিলেই আমার জন্যটা হয়ে যায়—সংসারে যখন এত খরচ—টাকার এত দরকার—"

"না না," নিজার নয়, উত্তেজিত নয়, তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে ফিসফিস করে ওঠে নীতীশ, "তোকে বলছে কী?"

সামনে পেছে নীতীশকে কল্পনা ধরে ধরে কল্পনা: ছাইমাখা তোরে কথা যায়, "রাখ তোমার লোক। কে এসে ধর তোমার? নিজের কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাও না?, অত খাটাখাটি করলে কত দিন বেঁচে থাকতে পারে একটা মানুষ, দু-বেলা ছাই পাঁড়াম তোমাকে ছাড়তেই হবে অফিস বলে দিলাম—"

"ছাড়ব? ঠিক বলছ?" অনেক দিন পর নীতীশের কথায় রসিকতার আভাস পায় কল্পনা। তার কড়ের মেয়ে যেন একটু-একটু করে ফেরে আসছে। চোখ দুটো তত লাল নেই। আর জেদের, কল্পনার দিকে তাকিয়ে এখনও হাসছে নীতীশ। সেই নিশ্চয় পর পুরনো-পুরনো হয়ে ফিরে আসছে—ঠিক তেমন করে। একটুও ভুল হয়নি কল্পনার।

অফিসের পর রোজই বাড়ি ফেরে নীতীশ। হাতের মধ্যে গলা আটকে ফিরিয়ে দিতে হয় না। ফাঁকি চোখে এধারে-ওধারে তাকায় আর অফিসের পাওনাও বুঝে নেয়। সে ঠিক বলা করে না, ফিরে আসছে দু-একটা পরিচিত মেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছে একটিকে। সেদিন ফিরে ফেরে নীতীশ। চলতে চলতে চোখে চোখ্যুগল দিয়ে প্রথমে-ওদিক তাকায়। আর তারপর সিগারেট ঠোঁটে চেপে তারের লেকচারেও ঢুকে পড়ে।

অফিস থেকে ফিরবে না ফিরলেই কল্পনা নিশ্চয়ই চায়ের চ. আর জলখাবার সাজিয়ে দেয়। মাঝার উপর পাখা ঘোরে। ফরের দেয়াল ঝলমল করে। অনেকক্ষণ সে আলো জ্বালায় না। নতুন পরীটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন চোখ দুটো বুজে আসে।

এক সময় চোখ খুলে নীতীশ চমকে ওঠে। একঝাক অন্ধকার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সে আলোর সুইচ টিপে দেয়। ঘরটা যেন চমকে ওঠে। অন্য একটু পরে হাতে আসে আটটা বাজবে। তারপর কিছু পরে ট্রেডিল-কলিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা এসে দাঁড়াবে দরজায়। কল্পনা ফিরে আসবে।

একা-একা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না নীতীশের। চাকরকে ডেকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলে। একবার বারান্দায় ঘুরে পড়িয়ে। একবার বাইরে রোদের অনেক দূর অবধি তাকিয়ে দেখে। সাইকেল-রিকশাটা নেই। অসুখের পর কিছুদিন ঘুমোনো। যেন কুড়িয়ে ফিরিয়ে আনে। নিশ্চুপ লাগতে চাপচাপে হলেও। সারা ঘর হাতের ঘোরে ঘোরে। আর নীতীশের মাথাটা ঝেমন-ঝেমন করে। ঘোর ঘোর এই রাত অবধি কী কাজ কল্পনার। তাকতে তাকতে সিগারেট এত ছোট হয়ে যায় যে নীতীশের মুখে আগুনের আঁচ লাগে।

রিকশাওয়ালার ঘোর ফিরতে দেখে নীতীশ তাড়াতাড়ি ফিরতে আসে। কল্পনা যেন তাকে চলতার ধাঁধাতে আসতে না দেখে। একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে মুখে পড়ে দেখবার ভান করে নীতীশ। তারপরে পদশব্দ। মুখে হাসি নেই। চোখে নিজাঁব।

তড়াতড়ি করে ঘরে ঢোকে কল্পনা। নীতীশের দিকে তাকিয়ে হাসে। কি একটা বলতে গিয়ে ছোট টেবিলের উপর চায়ের কাপ দেখে চোখ ঘোরায়, "অফিস থেকে ফিরে আমার দু কাপ চা খেয়েছ? না, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। একটা ফোন না করলে ছাড়বে না তুমি: বাড়িতে বসে থেকে হবে, বাজ থেকে ফিরলেই হয়—"

হাতে বেরিয়ে ফিরে ফেলে কাটা-কাটা ঘরে নীতীশ জিজ্ঞেস করে "এত বেরি কেন তোমার?"

"একটু দেরি হয়ে গেল. কাল প্রীরামপুরে যাচ্ছে কি-না সব—"

"ওখানে. ফিরিয়ে কাজ নেই।", উত্তেজিত আওয়াজে নীতীশ পত্রিকার পাতা উল্টে যায়, "রোজই ত আজকাল দেরি হয়, ফেরত শ্রীরামপুরে কবার পালা [redacted] নাকি এখানে?"

"আহা শুধু শুধু রাগ কর কেন?" কল্পনা রাগ করে নীতীশের পায়ে বসে পড়ে বলে, "পুরে খুশি খুশি আমের কাজে মাইনেটা বাড়িয়ে দিল বলে। এ বাড়িটা তখন ফিরে বলতে হবে। তুলাদীবাবু বলেছেন, ইস্কুলের কাছাকাছি একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে নেবেন। তখন আমার ফিরতে এত দেরি হবে না তো। যাব আর আসব—"

হঠাৎ পত্রিকাটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে চিৎকার করে ওঠে নীতীশ, "আর একটা ফোর্থক্লাস নিলে দেবেন না তুলাদীবাবু? আরও তাড়াতাড়ি হবে তাহলে—নির্লজ্জ!"

বিবর্ণ মুখ. নেমে চোখ। অতর্কিত আঘাতে ফোন হয়ে থাকে কল্পনা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। কল্পনা সেখানে আর বসে থাকে না। জলা আর এক মুহূর্তের ফ্রেমে ফুটিয়ে চায়। সে জানে নীতীশের ভয়ানক ক্ষোভ। কিন্তু এ কী হল! কী করছে সে। সেখানে দাঁড়িয়ে কল্পনা মাটিতে আছড়ে পড়তে চায়।

[redacted] সিলোকালো পদ্মর মত ঘরময় ছড়ানো চায়ের পেয়ালার ভাঙা টুকরো। হিম-হিম হয়ে পাঁচ আঙুল ছাই। শেষ হয়ে চায় না। আচ্ছন্ন কল্পনা কতক্ষণ কে জানে। নীতীশ যেন অপরিচিত অন্য আর এক

জগতের মানুষ অনেকক্ষণ ঘুমোয় না। মধ্যে মধ্যে যেন আচমকা [illegible] নিয়ে আরম্ভ করে কল্পনাকে

"কথাবার্তা সব নাচের ইস্কুলে শেষ করে এসেছ নাকি?" নীতীশের কঠিন হাতটা শক্ত করে এসে পড়ে কল্পনার হাতের উপর।

বিছানার এক প্রান্তে শরীরটা কোন রকমে গুটিয়ে রাখে কল্পনা। তারা একটা ঠাণ্ডা আগুনের নীতীশের মধ্যে শুধু তোর স্নেহ খুঁজে পেল না। বুকের মধ্যে চঞ্চলতম আন্দোলন একটি শিশু রক্তমাংস পুঁটুলির পুতুলের মতো কাঁদবার আগেই চুপ। তখন নীতীশকে ভুল করে কল্পনা। আরও সরে আসে। কথা বলে না

"কী ব্যাপার তোমার? একেবারে বোবা হয়ে গেলে?"

"কী বলব।"

পাঁচিল পেরিয়ে নীতীশ চলে আসে [illegible] কাছে। অন্ধকারে [illegible] পেলো জড়ো করে আধা-কাঁপা উষ্ণতায়। আগুনের আঁচের মতো নিঃশ্বাস। কাঁপা হাত। কঠিন স্নেহ।

"না না," কল্পনা ছটফট করে, "ওগো না—"

"বয়স বাড়ছে না? এখন না হলে আর কবে? মানুষ করে যেতে হবে না?"

নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টায় কল্পনা আবার বলে, "না না, কিছুতেই না," [illegible] উঠে দাঁড়ায় পাণ্ডুর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। ঝিক ঝিক করে চোখ।

"মেয়েমানুষ নাকি তুমি?" ঝঙ্কার করে ওঠে নীতীশ, "আমি জানতাম, আমি সব জানতাম—"

কি এসেই বলেছে গিয়ে কল্পনা বলতে পারে না। ঘরে পাঁচিলে আছড়ে জিজ্ঞেস করে, "কী জানতে?"

"এতদিন কথা দাদন দাদন তুমি হেসে যাবে," উত্তেজনায় উত্তাপের মত নীতীশ উঠে বসে চাকরির ছুতো করে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল না। আমি খুন করব তোমাকে—"

পুরোবাসের ভাষা নেই কল্পনার মুখে। পড়ে গেছে বোঝে সে কোন মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। তার পায়ের কাছে ঠাণ্ডা মেঝেও যেন দেখতে দেখতে গরম হয়ে ওঠে। চোখের জলে ঘনিষ্ট কাপনা হয়ে যায়। নীতীশ সত্যি তাকে মারবে নাকি?

"অভাবের সময় ছেলের জন্যে খুব দুঃখ হয় ওর। আমার জন্যে কত ভাবলো," নীতীশের বিকৃত গলার স্বর পরপর করে, "আমি কিছু বুঝি না ভাব? আহা, আমার কষ্টে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে," একটা বাঁকা কল্পনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীতীশ বলে, "কে তোমার ওই বদমাস জানোয়ারকে, যার ভাকারে তুমি আমাকে ঠেলে দিতে সাহস কর? আমার ছেলে বাঁচতে কাত-বিকেতে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কার ধ্যান কর—"

"আঃ," ক্ষীণস্বরে কল্পনা বলে ওঠে, "কী বলছ—"

"থাম," লাফিয়ে খাট থেকে নেমে কল্পনার কাছে হিংস্র নীতীশ এগিয়ে আসে, "তোমার মত মেয়েমানুষের সঙ্গে [illegible] থাকতে প্রবৃত্তি নেই আমার," হাট করে খিল খুলে হাতের কঠিন ধাক্কায় সে বাইরে ঠেলে দেয় কল্পনাকে, "যাও—বেরিয়ে যাও। আমার কাছে থাকতে হবে না তোমাকে"—শব্দ করে নীতীশ দরজার খিল তুলে দেয়।

উঠোনের নিচু দেয়ালের গায়ে কল্পনা ছিটকে পড়ে। মাথায় লাগে। হাত ছড়ে যায়। অন্ধকারে একটা পোকা ধাক্কা খায় কল্পনার উপর। টিক করে একটা শব্দ। কিন্তু [illegible] আর একটুও ভয় পায় না কল্পনা। উঠোনের পাশে ইঁট বের করা [illegible] সিঁড়ির উপর বসে সে মাথা তুলে এক ফালি আকাশের দিকে তাকায়।

ভালো পড়ুয়া ছিল। মুখে নিখিলবাবু অনেক খুঁজে-খুঁজে কল্পনা একটা তারা দেখতে পায়। আর পাতলা ধোঁয়ার মত সাদা একটা রেখা কালো মেঘ ফুঁড়ে কেটে-কেটে যায়। চোখের জলে-ভারী পাতা বুজে আসে। অনেক খুঁজে পাওয়া সেই তারাটাও কোথায় হারিয়ে যায়।

কল্পনার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ে। তার দেহ তোলপাড় করে সে এলে কী হবে? অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে কল্পনা ছোটবেলা কল্পনার মতো। শরীর ভেঙে আসে। তখন এ চাকরিটাও থাকবে না তার।

আবার নীতীশের মুখে রোখার আঁচড় পড়বে। আঁটা তারের মত শক্ত-স্বভাব ফিরে আসবে সংসারে। আর সারাদিন খাওয়ার কান্নার একটা শিশু চিৎকার করে কাঁদবে। কিন্তু তার জন্যে এক ফোঁটা দুধও থাকবে না কল্পনার বুকে।

ঠাণ্ডা সিঁড়ি আঁকড়ে কল্পনা বসে থাকে। চাপা কান্নার শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে ওর। শুধু সেই জানে কেন সে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীতীশকে।

একটি শুধু রাত্রি আলোকচিত্রী : শ্রীনেপাল মুখোপাধ্যায়

লিখেছেন

শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীমনোজ দেব; শ্রীঅখিল নিয়োগী; শ্রীলীলা মজুমদার; শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীশচীন কর; শ্রীশৈল চক্রবর্তী; শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু; শ্রীমণীন্দ্র দত্ত; শ্রীশান্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমনোজিৎ বসু; শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ; বুলবুল-ভূতুম; শ্রীইন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ বসু; শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীঅনীতা ঘোষাল; জাদুকর এ সি সরকার ও মৌমাছি।

ছবি এঁকেছেন

শ্রীসময় দে; শ্রীশৈল চক্রবর্তী; শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীবিমল দাস; শ্রীঅহিভূষণ মালিক ও শ্রীজগদীশচন্দ্র সেখর দত্ত।

ফটো তুলেছেন

শ্রীরেবন্ত ঘোষ

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

ভাদরের শেষে, বৃষ্টি-ধারায় দেশ যে গিয়েছে ভেসে,
খুশির আমেজে শরৎ-আকাশ তাইতো ওঠেনি হেসে।
অকাল-বরষা সারা দেশ জুড়ে ফেলেছে দুঃখ-ছায়া
দুঃখ ঘোচাতে দুঃখ-নাশিনী আসে এই মহামায়া।
তাঁর আগমনে সকলের মুখে ফিরিবে আবার হাসি
সেই-সে আশায়, এসো সবে ভাই বাজাই শঙ্খ-বাঁশি।
সমরে শঙ্কা, দুঃখ-দীনতা; চিত্তে জাগিবে আশা,
উন্মুখ হই অতীতের পিছে প্রাণভরা ভালবাসা।
ছোট্ট এ-জামরা, হাসি-খুশি সাথে জাগাতে ভোরের সুরে
খুশির খবরা প্রীতিতে রচনার দিলাম শরৎ-সুরে।

ইতি—

—মৌমাছি

এক

ঘুটঘুটে রাত্তির- নিঝুম পাড়া;
ঘুমে ঢোলে আকাশের নীল কটা তারা।
হুমড়ুম ছাদা দোলে ঝুড়ো সটগছে।
হাওয়া করে ফিসফিস- দূরে অতি কাছে।
উঁচুনিচু ঢেরে রয় প্রেতের খাটিক,
পাহারাতে মোতায়েন জানলার শিক
এপাশে নিশুতি ঘর, কেউ নেই জেগে;
একফালি আঁধারের ঝিলমিলি মেগে।
টিকটিকি চাই তুলে দেয়ালে দেয়ালে;
একটিও পোকা নেই মাকড়ের জালে।
এককোণে আরশোলা করে গুরুগুর;

ঘুম করে ঘুমখানা ভারভার বিনুর॥

কে ঘুম ভাঙাপি ওরে! এদিকে ওদিকে
শুধু দেখা গেল সেই আরশোলাটিকে।
ঘুরে ঘুরে বারে বারে মারে এসে গুঁতো,
ছলা নেই কলা নেই নেই কোন ছুতো।

জোক নেই কলা নেই ছাতু নেই, কেরে?
কড়িকাঠ তাকালেন একদৃষ্টে মেরে।
কিছু নেই কিছু নেই খাওয়ার সন্ধিবে,
তা বলে কী নেই নাকি পেটেজোড়া খিদে?
হাসিছিল মিটিমিটি কুনো হাস্কিকেন,
এক ফুয়ে সেটা তিনি নিবিয়ে দিলেন।

হুমড়ুম হুমড়ুম গা কাঁপে গা কাঁপে।
কে যেন হঠাৎ ঘরে ঢোকে একলাফে।
বিনুবাবু জড়সড় ভয়ে গুটিসুটি,
বুলকালি হাওয়া এসে দেয় সুড়সুড়ি;
ভীষণ আওয়াজ তুলে ওঠে টিকটিকি,
জানলায় ওইখানে জ্বলা ডিকিডিকি।
এপাশে গভীর ঘুমে মাসিমা অঘোর;
হঠাৎ কে খুলে দিল স্বপনের দোর।

কে খুললে? হাওয়া?
—ঘর থেকে কে উঠলো হেসে হা হা হা?
কে তুমি গো, নাম বলো না আহা।
চকচমকড় সাহা।

হঠাৎ যেন আলোয় আলো, চারদিক সব ফরসা;
মিটির মিটির চোখ ঘুরিয়ে হাজির মাকড়সা॥
বিনুবাবু, ওঠো এবার, বিনু,
এই যে আমি পিলীয় ফেলেছি দিনু!

এইবারে গান গাইবে আমি, শোনে—
দেখবে হঠাৎ কটাস করে লাগাবে তালা কানে।

(মাকড়সার গান)
গুন গুন গুন গুন
খুন চাই চাই খুন
চুপ চাপ চাপ চুপ
চলে এস টাপটুপ।
এই আলো এই আলো
হাসিয়াল হাসিয়াল,
এস এস এস এই
দেখ দিকে কেউ নেই,
একটিও পোকা নেই একটিও পোকা নেই,
চলে এস এইদিকে বসে আছি সামনেই;
সোজাসুজি খোঁজাখুঁজি না করেই না করেই
জলা মাছি আরশোলা টিকটিক হও নেই,
চলে এস চলে এস একদম ভয় নেই॥
(গান শুনে সেই টিকটিক আর সেই আরশোলা জোক যেন হঠাৎ গম্ভীর মুখ আরও কালোকালো করে চুপ করে বসলো।)

মাকড়সা কথা বললো

শুনতে পেলে?
—নাতো!
কান খাড়া তো করেই ছিলাম!
কেন কী ছিল আজ?
—মাগো না, তাও না!
আচ্ছা, থাকো।
—না হয় তুমি তার একখানাই গাও না!

কলকল—কে কী ভাষে? এত কী স্বপন?
তুমিই ঘুম ভাঙাও দিয়ে এত কম পণ!
ফ্যাঁস করে ছিড়ে গেল সব ঘুম সব—
এইবার চারদিক নীরব নীরব!
কেউ নেই কেউ নেই এদিকে ওদিকে,
একটি জোনাকি শুধু জানলার শিকে!
চুপ চাপ চুপ ... চুপ চাপ চুপ,
একটি জোনাকি শুধু জ্বলে দিল রূপে!
তারই দিকে দুটি গুটি পা ফেলো...পা ফেলো...

তুমা এসে পাশে বসে আরেক ছেলে!

কে ঘুম ভাঙাপি ওরে!...

একেবারে তারই মতো, কিন্তু
ভুল নামে ডাক দিল—বিন্তু!
বিন্তু সাড়া দিল না, না দিয়ে
আরও আ-র কাছেটেছে এগিয়ে
ফিসফিস ডাক দিল—মা!

ভয় করে, মা?

ওমা কই ছেলে কই, এযে দেখি বুড়ো!
দাড়িয়াল হাসি গাল ভাঙা মুখখুড়ো।
বললো আমার নাম—শ্রীবিরূপাক্ষুড়ো।
—ভয় করে? ভয় কী! আমি যে
ঘেন্নাতে দেবার জলো এসে সেছি নিজে!

কী আশ্চর্যি, বিন্তুর ঘট ভয়
কোন্ দেশে যে পালিয়ে গেল ঠিক এই সময়।
বাইরে এসেও চোখ ধাঁধানো আঁধার।
ভেঙে ফেললো পাঁচিল ঘেরা—বাবার।

বিরূপাক্ষুড়ো বললো হেসে, ভয় কি!
আমার দাড়ির বহর এসব ভূতপ্রেতেদের নয় কি?

বিন্তুর তবু পা আড়ষ্ট, বললে,
কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে চললে?
রাতদুপুরে জনমানুষ চলে না পথ দিয়ে,
এমন সময় কোথায় যাবে একলা আমায় নিয়ে!

বিরূপাক্ষুড়ো হেসে উঠলো—হো হো,
একেবারে আসল কথাই ওহো
হয়নি তোমায় বলা,—
কিন্তু তোমার ভুল যা কি কম, কাল যে ফিরিওলা
দুপুরবেলা বেচতে এল নিমপাতুরী কলা,
সেও কি তোমায় কিছু খবর দেয়নি? তুমি তবে
রাতদুপুরে হঠাৎ জেগে রবে
শুধু শুধুই একেবারে—তাই যা বলো জোরজার করে হবে!
আচ্ছা না হয় আমার বলি, সেবার
কত কথা হল তোমায় পথ দেখিয়ে একটু পৌঁছে দেবার
আকাশ পারের পরীর দেশে!

বিন্তুর হঠাৎ পড়লো মনে। আলতো হেসে
জবাব দিল, তাই তো।
কাল দুপুরেই ফরমাজিলাম যে পরীর দেশের
কোন হদিশ পাই তো
এখখুনি যাই চলে।
হাজার গণ্ডগোলে
একেবারেই ভুলেছিলাম সেই কথা। এখুনি
কী আনন্দের খবর কানে শুনি!
সত্যি বিরূপাক্ষুড়ো তুমি ঠিক
চিনবে তো সেই পরীস্থানের দিক?

বিরূপাক্ষুড়ো ফিসফিসিয়ে বললো, চুপ, চুপ,
আস্তে বলো। রাস্তাঘাটা শত্রু নয় তো খুব!
হাতি থাকে সাতরাজ্য সেই কাঁচ,
সেটা থাকলে আজকাল সাতপাঁচ
একেবারেই দরকার নেই। আর
হাতবিয়েতে একলা যেতে চাই হাতে সেই কাচের আয়নার!
এসব ছাড়া চারদিকে যা ভয়,
অস্ত্রশস্ত্র সাথে সাথে না থাকলেই নয়...

ভয় করে? ভয় কী।...

বিন্তু বললো, তবে
কেমন করে হারাতে যাওয়া হবে।

বিরূপাক্ষুড়ো বললো হেসে, ভয় কি,
আমার দাড়ির বহর দেখেও শঙ্কা তোমার হয় কি?

বিন্তুর তবু, আড়ষ্ট পা, বললে,
কেই বা বলো দেখে এসব ফোলখানে কি করলে
কিসেই চলো নয়।

বিরূপাক্ষুড়ো হেসে উঠলো: তোমায় দেখছি সর্বনেশেই ভয়!
শক্ত করো শক্ত করো মন,
অমনি দেখবে কোথাথেকে মিটছে তোমার সকল প্রয়োজন।

দুই

দুন্দুভিময় দুমদাম শব্দ।
দশদিক দলমল জ্বল।
ঘটনাছ জমজম ঘটলা,
আহা তুমি কেন পিছু হটলা।
ফিসফিস ফিসফিস গল্প—
ওধারে কিসের সমারম্ভ:
ব্যাপ্তায় ব্যাপ্তায়ী ওই যে
দুজনায় কত কথা কইছে!

ও ব্যাপ্তমা নিশ্চুত রাতে
বাজে কারা শুনি হাতে,
ভয় মানে না অন্ধকারে
কোন্ বনে বা কোন্ পাহাড়ে
পথ হারাবে সুনিশ্চিত,
ভাইনী হাতের পাবাণ রীত
কেমন করে সইবে।
ও ব্যাপ্তমা, ওদের ডেকে কইবে?
কী কইবো, কও ঝিঁকিনি,
এমন বোকাও দেখিনি:
দুঃখমুখো ওই জলাটায়
তিন পক্ষের বালি
ফেলতে হবে খালি,
অমনি মিলাবে পথের দিশে,
রামধনু ফাঁচ মিলবে ফিসে

সেটাও হবে জানা—
এইটুকু নেই দুশ্চিন্তা যাদের
তারা আলাদা।

খুড়োমুটো হাসির, কপালে তার
ছোপে ছোপে ঢাকা আছে পথের চেহারা।
ওদিকে ও কারা ওরে কাতারে কাতারে—
জেলাসীমার লক্ষ্য দিয়ে সরে সারে।
চুপ, চুপ, ওই দেখ, কোনদিকে যায়,
চুপ করে ধরে থাকো জেলেদের আশায়।
পুবমুখো জংলাটা ওই গেল দেখা—
চুপ, চুপ, এইবার মস্ত কিছু ঠাহরা।

ও কারা বিষণখুড়ো, এদিকেই আসে—
জেলাসীমার কৃপিণগুলো দুলিয়ে বাতাসে?
জংলা ডো এসে গেল, বলি?
খোঁজ খোঁজ আঙুলি দাখালি।
শিগগিরি শিগগিরি ওই...
এসে গেল সমস্ত আলোই...

কে রে তোরা? বিষণখুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো ভীষণ।
জানিস তো এই আমার নামই বিষণ।

আমরা হলাম ডাইনী রানীর সাতশো অনুচর।
সাতশো কোথায়? সাতশো সাতচল্লিশ।
বললো পালের জন।

যাই হও তে, বললো খুড়ো, আমার প্রয়োজন
সেটাও দিকি আজি—
তিন গণ্ডুষ বালি?
না পারো তো, এই দেখ দাড়ি—
এক একজনকে সাতশো করে দাড়ি।

তাই নাকি গো? ইস!
ওরে তোরা রানীমাকে একটু খবর দিস,
দেখবে বুড়ো শাস্তি তারে কয়!

খুড়ো বললো, আচ্ছা দাঁড়াও, বুঝেছি সংশয়।
জানো না তো, এ হল সেই পাতালরাজার দাড়ি,
জানবে যখন এক এক করে যাবে ঘরের বাড়ি!

ও কারা বিষণখুড়ো...

পিছন থেকে এগিয়ে তাড়াতাড়ি
হঠাৎ একজন বললো হেসে, পেন্নাম হই খুড়ো।
ওদের কথার কান দিও না, এসেছি এই তোমার বালির গড়ুড়।
(যা না তোরা সরে!)
আচ্ছা খুড়ো, বলো'ন টপ করে,—
নামটি শুধু মনে রেখো—বঙ্কু আমি, বাসলাদেশে বাড়ি
ছিল একসময়,
ডাকলে পরেই হাজির হব যে-কোন ঠাঁই, যখন মনে হয়।

তিন

সাক্ষেপাতেই লেগে রাত্রি কিছুটা এর পরে।
রত্নধনু কাঁচ পেরে ওরা কেমন করে অমল সরোবরে
পৌঁছেছিল, কেমন করে একটি পদ্ম তুলতে—
লক্ষ রক্ষ জেগে উঠে সৌড়েছিল অন্ধ খুরোয় খুরোয়,
কী করেই বা শেষে
সিঞ্চল ঝাঁঝর পাত্রের তলায় এসে
মাতৃমাত্রার বসে বসে মন্ত্র পড়ে শিখলো প্রাণবাঁচানো।
সে-সব কথা তোমরাও তো জানো।
নিখুঁত দেশের পথ দেখালো অজানা একটা লোক।
বকুলবনের পিটুলি পাখির পালক,
আকাশমাঠের বালিবুড়ির ঝাড়ি খেলার ঘুঁটি,
পথ চলবার সব আয়োজন জোগাড় করা হল মোটামুটি।
বাকী রইল টুল-তোড়ার ভালো দুল দু'খানা,
এটুকু হলেই পরীর দেশের চোরাটি যাবে জানা!

সঙ্গে ছিল বিষণখুড়ো
মিললো সেটাও শেষে—
অনেক চেষ্টা অনেক কারচোপে।
বিনু শুধুই বুঝতে কি আমলে
কাটাচ্ছিল সকল থেকে সন্ধে।
পথে তার আর কী বা কষ্টার ছিল?
আস্তে ধীরে চলছিল চলছিল।
বিষণখুড়ো একাই
মস্তুত তখনো পাঠাচ্ছিল
আসছিল যে ঠাকাই!
এরেবারে শেষটায়
হিংসুটে ভীষণ মুখিয়ে ছিল ঘনশ্যামী সব ঘাটুলে-ঘাদের চেষ্টায়।
ওরা ছিল মারোয়ারের চেলা,
আঁধার রাতের শিকারকালি খোলার মত ছুঁচলো দুটি চোখা।
সে কী ভীষণ শিকারকালি যে, আকাশ-ঘাটি
লুকিয়ে পড়লো ভয়ে!
শুধু ওদের চোখগুলো সব ধকধকিয়ে উঠলো পরে পরে।
লোহাৎ সন্ধেবেলা
সেই যে বঙ্কু, সে যদি না হঠাৎ হাজির হত,...
অন্য কিছুই বিষণখুড়োর পড়ছিল না মনে...
বঙ্কু এসে হাজির হল হঠাৎ শুভক্ষণে।
বিড়াবিড়িয়ে বললো কী যে, হাত উঁচাতেই
ঝিনিক দেওয়া আলো
চাঁদের দেশের ছোরা নেমে আহা ঘাটের কালীদহে ছড়ালো।
আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে বঙ্কু নেবে
ঝিনুর গায়ে হাত বুলিয়ে, আলতো হেসে
বললো, তবে পেন্নাম হই খুড়ো,
আর একটু পথ এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে
ঠিক পাহাড়ের চূড়ো,
তার ওপারেই পরীর দেশের সীমা।

সেদিন ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমা।
আকাশগঙ্গা মোমবাতি কে জ্বালিয়ে রেখেছে। ওইগুলোকেই তারা
তারাফুল বলে! এখন বিনু ছেলেই হল সাত্ত।
মন্দিরখানা আলোয় আলো। হীরেমুক্তোয় জমকালো ঘেরাটোপ,
চোখ ধাঁধানো রেশমী সজ্জায় বসানো মণ্ডপ।
মন্ত্রে কে যে মজে আছেন, এখান থেকে বোঝা যায় না ভালো রকম।
নিজের আলোয় মুড়ি দিয়ে একেবারে একা—
ওই ভেতরের লোকটি হয়তো আর কেউ নয়—তাঁর।
কে যেন তাঁর কানে কানে শোনালো সংবাদ।
ভালো করে দেখলে বিনু, ঠিক যেন ফানুসটি—
নিজের মধ্যে আছেন নিজে, অন্য কিছুর জন্যেই যেন হাসাটি

নীচেও রঙের খেলায়
গাছে গাছে ফুলীপাখা, ঝিলমিলানির হাসছে অবহেলায়।
কোন্‌দিকে যে দেখবে বিনু, কোন্‌দিকে যে—
পরীরাই কী এখানে সব পাখি সেজে
ডাকছে, কাকে ডাকছে!
কী যে ভালো লাগছে বিনুর, কী যে ভালো লাগছে!
সামনে খিরাট পাঁচিল, মধ্যে সিংদরোজা,
ওইটি খুলে গেলেই বিনু ঢুকবে সোজা,
তারপরে... তারপরে ...
মা থাকলে কী ভালোই হত, কেন যে মন হঠাৎ কেমন করে!

কে যেন খুলবে খোল! বন্ধ দরোজা।
ইতিউতি ঘেরে শুধু বৃথা হল খোঁজা!
আসমানে সাদা সেই চাঁদের ফানুস,
নীচে হায় নেই নেই একটি মানুষ!
কে যেন খুলবে খোল! ধীরে ধীরে রাত
টুপ টুপ নিবে গেল। রসুন বেলতি
চট করে উবে গেল। দুয়ের সেফালি
মায় মুখখানা মনে এনে দিল খালি!
যেন খোল, ওই দেখ রাত যায় কেটে,
রাঙামামা চাঁদখানা লুকোল পকেটে।
চারদিকে ঝিকঝিকে আলো আলো আলো...

এইযে। ঝিমঝমঝুড়ো কোথায় পালালো?
সে আবার কোনদিকে? কই, কেউ নেই!
এদিকে ওদিকে। অরে! ডাক সাজনেই
কোন দেশ থেকে সেই আসেনা পাখিটি
তারই মনে রেখে গেছে একখানা চিঠি।
তারই নাম? কে আবার এই ঝিনদেলে
চিঠি লিখে খোঁজ নিতে এল অকালে!

বিনু দেখা চিঠির কাগজ খুলে নিতে...

কী লেখা চিঠিতে

স্নেহের বিনু,
শুনেছে...শোনার অনেক কথা বলে
হাসির দুদিন বয়েছে আজ পরীর দেশের চেয়ারা।
বাস হলে তোমার এখানে, একটুখানি লিখে
দিতে পারতে মাঝির ছেলের বাবামায়ের শান্তিসন্তোষটিকে।
আরে খোকা, সেই পাখি যে এই দেখেই পরী!
তোমার ওরে পাবার জন্যে বছর মাসেই একলা দেশান্তরী
হয় ওদিকে। আর
বিমকে তো চিনেছিলে? হল যে আটের অন্ধপাহাড়ীর

ঘুমন্ত বিনুর ছবি

দুমি কাউকেজানী!
ওরই ঠাকুরদাদা ছিল একসময়ে পরীর দেশের মাঝী।
কী এক অপরাধে ওদের মাঝির দেখে হল যে নির্বাসন,
সেদিন থেকেই পরীর দেশে ঢোকা ওদের বারণ।
আমায় দেখেই, দেখেছ তো, ভগবান কোথায়
পাঠিয়ে দেছে দুমি ?

যা হোক, যেন ভয় পেয়ো না খুকি;

দুঃখু লাগে, আহা, যখন ভাবি,
কতদূরের থেকে এলে, পরীর দেশের সিংদরোজার চাবি
তোমায় দিতে পারলাম না। হায়রে,
মনটা আমার বাথায় ভরে যায়রে!
কী করবো আর, আসল কথাই কই:

এদিকে যে ভীষণ কাণ্ড! পরীরানীর অকূলডাঙায় সাই
সাতশো প্রজাপতির পিঠে রামধনু কাচ পাঠিয়েছিল ভেট।
পরীরানীর মাথাখানা ওজোরেই ঘোরে!
রাঙ্গলা বনের পাতাবাহার,
উদনপুরের রঙজহলার
নতুন রানীর সাতনলী হার;
জুটলো না কিছুই!
অন্যায় লজ্জায় রানী আমাদের ঘুমোমাটির ঘুই
শয্যা করে শুয়ে আছেন। চারদিক সব বন্ধ,
অন্য দেশের লোকের সঙ্গে নেই কোন সম্বন্ধ।
রানীর হুকুম না হলে কী করে,
তুমিই বলো.....

.....এতক্ষণে বিনুর আবার চোখ পড়লো চোরে।
ঘোর বর্ষা। কমলপরীর চিঠির আখর গুলে
কালসা হয়ে এল যেন চোখের কোণে একফোঁটা জল জমে।
হায়রে নাঁদ জানতো আগেই পষ্ট,
বুঝাই এত ঘুটোঘুটি, লিখো এতদিনের এমন কষ্ট,
কখখনও ফের হয় না একলাটি।
মার কথা আর মনে পড়লো খাঁটি,—
না বলে না কইয়ে আসার ফলে
মিললো এমন কাঁটন লাঞ্ছিত—হাসুল চোখের জলে!
কিন্তু ঝিমঝমঝুড়ো, সেই বা কেমন!
একলা তাকে ফেলেই কোথায় লুকিয়ে পড়লো এমন!

একলা তাকে ফেলেই?

একলা তাকে ফেলেই.....?

তাইতো চারিদিকেই
জলছবিরা নেই -
ধূ ধূ করছে ফাঁকা
তাকাও যেদিক পানেই।
ঘর্ম না কোনখানেই
চেঁচিয়ে কাকেও ডাকা।
মরুর ওপর
হেরুর চোখদুই
কেউ নেই কোথাও,
আলো দুনিয়ায়
আকাশ নিয়ে
যে ছেলেটা, তাক দাও।
আকাশ পানে তাকিও—
হিসেবে না আসা পাখিও।
যে ভালোবাসা—সেও উধাও—
সেহেন সোহাগ যতই ধাও!

চোখ ফেটে জল আসে, হায়
চোখ ফেটে জল আসে,
আকাশনীলের রোদ ছাড়া আর
কেউ না বিন্দুর পাশে।

একলা বিন্দু কাঁদছে ওই,
তা-ই কে দেখে—হাসিটা বৈ
ওটা একটু হাসি।
পাখিপোকারে বললে, বিন্দু
এবার একটু হাসি।
এবার না হয় বন্ধ দোর,
পরের বারে খুলবে।
এই, হাসিই শোন্ ওখন তোকে
স্নেহার এনে তুলবে!
এখন বরং ঘরে চল,
ফোঁসফোঁসানি আর চোখের জল,
আমার পিঠে ওঠ!
পরের বারে আসিস দেব
পরীর দেশের আসল কোড: পাসপোর্ট!

উড়তে ভালোই লাগলো বিন্দুর মেঘের মধ্যে দিয়ে।
ওরাও পাখিরা পাখা ঝটপটিয়ে
ওদের পাশে পাশেই চললো উড়ে।
কত সাগর পার হয়ে আর কত আকাশ কুঁড়ে,
দিনের পরে দিন
অবিশ্রান্ত চললো ওরা বিরাম-বাধাহীন।

ঝটপট ঝটপট পাখা
বিন্দুকে চলেছে নিয়ে একরাশ আকাশ-বলাকা।
পরীর এলিয়ে আসে, ঘুমে চোখ ঢোলে;
হেসে হেসে ছোঁয় তাকে স্নেহেরা সকলে।
কতদূরে? আরও কতদূরে?
দিন যায়, রাত যায়, অবিরাম বিরোম রোদ্দুর।
কী আঁধার কী আঁধার—চোখ যেন এলায় আবেশে—
স্বপনে দেখায় ঠিক সে ছেলে এসেছে ফিরে দেশে—
সেই বিছানার পাশে তেমনি ঘড়িটাও

নিজেরা আপনমনে করে কিসফিস—

ওরা স্বপন কত মধুর
এসেছে ফিরে যা ছিল দূর
এক নিমিষেই পুরোনো সুর।

কতদূরে থেকে যেন মার গলা ওই
শোনা যায় আগের মতই।
রান্নাঘরে কাপ ডিস টুঙ্ টাঙ্; ভোরের ঘুমের
গন্ধ যেন ভেসে আসে ফের।
জেগেছি কি স্বপন মাঝে, তারও গলাধাক্কা
থাকে না অজানা।

ওরা স্বপন কত মধুর
এসেছে ফিরে যা ছিল দূর।

আরে, সামনে এই তো সাদা দেয়াল!
বিন্দুর হুস হোরাল।
তাই তো, কখন পৌঁছেছে সে নিজের ঘরে এসে!
নিজের মনেই উঠলো বিন্দু হেসে।
সেই হাসিটার নাম কী যেন? ঠিকই ছিল জানা,
ওরকম ঠিকানা।
উঠে দাঁড়াতেই ভোরবেলাকার স্বপ্ন
ঠাট্টাহাসি হেসেই নিল সকল ভুলের শোধ!

পাঁচ

গল্প কিন্তু এখনেই শেষ হয়নি। পরেরটুকু
আমার পরে শুনিয়েছিল পাশের বাড়ির খুকুঃ

জানো, কিছুই বলেনি ও মা-কে।
দুপুরবেলা গিয়েছিল অশ্বত্থগাছের কোটরেরানীটাকে
ধরে আনবে বলে,
রোজ ওকে আমরাও তো দেখি, সেদিন যেন কিসের আশাতেও
দেখা গেল, সেটাও যেন কোথায় গেছে চলে!
ফিরে এসে ছলছলিয়ে চোখ
হঠাৎ কেঁদে ফেললো বিন্দু অঝোরঝরে। সেদিনের সেই শোক
আজও, জানো, ভুলতে পারেনি ও।
সত্যি, দেখে নিও,
ও একদিন একা একাই বেরিয়ে পড়বে পরীর দেশের দিকে।
দেখি তো রোজ সকাল হলেই
ফিসফিসিয়ে কী সব বলে
বাদামগাছের শালিকপাখিটিকে।

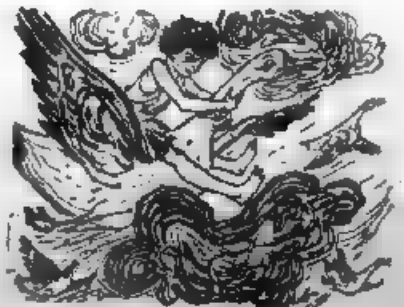

উড়তে ভালোই লাগলো বিন্দুর...

সপ্তদুর্গা

যামিনীকান্ত সোম।

সপ্তদুর্গা অর্থাৎ সাতটি দুর্গ—তাই কাহিনী। ইতিহাসের কাহিনী শুনতে অনেক সময় ভাল না লাগলেও শোনা দরকার। কারণ বাংলার এখন এই দুঃখকষ্টের সময়, প্রাচীনকালের সুখ-সম্পদের কথা, ধন-ঐশ্বর্যের কথা শুনতে ভাল লাগবে এবং বাংলার বীর পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী এখনকার বাঙালীর মনে সৌরভ জাগাবে। তাই আজ শোনাচ্ছি প্রাচীনকালের এক কাহিনী, সংক্ষেপ করে। কিন্তু যে-জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সে-জায়গার চিহ্ন পর্যন্ত নেই এখন। সব একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার শুধু স্মৃতিটুকুই আছে।

বাংলাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসবার পর প্রায় দেড়শ বছর ধরে দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। পরে সম্রাট মুহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে বাংলাদেশ হয়ে যায় স্বাধীন। এই স্বাধীন হওয়ার কালে ফোড়ের নবাব সমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন প্রথম পঞ্চ প্রধানক। তখন সমস্ত বাংলা ও বিহারে এক-চৌদ্দ-ভাগের বেশী মুসলমান ছিল না। নবাব সমসুদ্দীন বুঝলেন, এই অল্প সংখ্যক মুসলমান নিয়ে দিল্লীর সম্রাটের বিপক্ষে বাওরা চলবে না। এজন্য তিনি হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন হাজীপুরের সামন্ত এক ভাদুড়ী ভাদুড়ী। তিনি এঁদের ডেকে পাঠালেন। দাক্ষিণাত্য থেকে এলেন শিখিবাহন সান্যাল এবং ওজানী থেকে এলেন তিন ভাই—সুবুদ্ধিখাঁ ভাদুড়ী, কেশবরায় ভাদুড়ী ও জগদানন্দ ভাদুড়ী। নবাব এঁদের পরম সম্মানে গ্রহণ করলেন এবং সকলকে নিজের কাজে লাগাবার মতলব করলেন।

জগদানন্দ ভাদুড়ী পাকনী উজীর জানতেন। তাঁকে "রায়" উপাধি দিয়ে বললেন "রায়রায়ান" অর্থাৎ রাজার রাজা। আর শিখিবাহন সান্যালকে দেওয়ান। সুবুদ্ধিখাঁকে কেশবরায়কে দিলেন সেনাপতির পদ। সেনাপতিরা সৈন্যসংগ্রহের কাজে লাগলেন। অল্পদিনের ভিতর এঁদের চেষ্টায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সৈন্য সংগ্রহ হলো। আর রায়রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানজীর চেষ্টায় নবাবের রাজভাণ্ডারে বহু অর্থ ও বহু রসদ সঞ্চিত হলো। নবাব সমসুদ্দীন এখন মহাখুশী আইডিয়া বেরিয়ে তিনি "শাহ্" অর্থাৎ স্বাধীন রাজা এই উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সম্রাট অর্থাৎ "গৌড় বাদশাহ্"। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক এবং তারপরে ফিরোজ তোগলক বাংলা-বিহারের সমসুদ্দীনকে অনেকের মধ্যে অনেক না পেয়ে তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীরাই নবাবের উন্নতির ছিলেন প্রধান সহায়। এজন্য নবাব এঁদের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুটি জায়গীর দিলেন। তখন বরেন্দ্রভূমিতে চলনবিল নামে এক অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল। এই হ্রদের দক্ষিণদিকে শিখিবাহন সান্যালকে জায়গীর দেওয়া হলো, আর হ্রদের উত্তর দিকে জায়গীর পেলেন ভাদুড়ীরা তিন ভাই। জায়গীর পেয়ে এঁরা মহা প্রভাবশালী হলেন। এই চলনবিলটাও এসো এই দুই জায়গীর-দারের অধিকারের মধ্যে। ভাদুড়ীদের কথায় অনেক কথা আসবে, তাই এঁদের কথাই বলাই।

সান্যাল এবং ভাদুড়ীরা নবাবের কাছে "খাঁ" উপাধি পেলেন। "খাঁ" মানে সম্মান-জনক উপাধি। ভাদুড়ীদের সুবুদ্ধি খাঁ জায়গীর পেয়ে তো রাজা হয়েই বসলেন। রাজার মতোই তিনি রাজা শাসন করতেন, রাজত্ব করতেন। তিনি নিজের রাজ্যে মুদ্রাও তৈরি করতে লাগলেন। নামে মাত্র তিনি গৌড়ের অধীন, আসলে স্বাধীন-ভাবেই চলতে লাগলেন। গৌড়-বাদশাহকে তিনি বছরে কেবলমাত্র একটি করে টাকা নজর দিতেন। এই থেকে এঁদের নাম হয়েছে 'একটাকিয়া ভাদুড়ী'। আর এঁদের ছেলেদের নাম হলো একটাকিয়া ভাদুড়ী। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত করে বলতেন "ভাদুড়ী চয়"।

চলনবিলের উল্লেখ করেছি। এই চলন-বিলটির অদ্ভুত ইতিহাস। কিন্তর নদ-নদী বন্যার সময় এই হ্রদে এসে পড়েছে, আর কয়েকটি নদীও এ থেকে বেরিয়েছে। এত বড় বিরাট ব্যাপার ছিল এই হ্রদটির। এখন এর কিছুই নেই, সব শুকানো। এই হ্রদের অর্থাৎ চলনবিলের মাঝখানে বর্ষাকালে তখন নৌকায় লোকজন কুটুম্বিতা নজর পড়তো না। দূরদিকের অনেক জায়গার অবস্থা জল ছোট্টো থাকতো। প্রতি বছর পৌষ পড়তে পড়তে এই শুকনো জায়গাটা হতো খুব বেশী উঁচুরা খুব এতে ধান হতো প্রচুর। ফলও প্রচুর হতো অফসলী হতো। এই রাজ্যে কারও কোন অভাব বা দুঃখ ছিল না। তখন এক টাকায় আট-নয়মন চাল-পাওয়া যেতো। আন্দাজ করলে দেখ, কী সুখের সময় তখন ছিল।

ভাদুড়ীদের রাজ্য অনেক জায়গায় ছোট ছোট ভাগে ভাগ ছিল, তেমনি আবার প্রত্যেকটিই সুরক্ষিত ছিল সুন্দর প্রাচীর দিয়ে। তা ছাড়া এখানে সুখও ছিল। সুখ ছিল সু-একটি নয়, একেবারে সাত-সাতটি। নগরের উত্তর দিকে একটি, পূর্বে একটি, পশ্চিমে দুটি এবং দক্ষিণে ছিল তিনটি। সেই জন্য এই রাজধানীর নাম সাতগড়া। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত করে বলতেন "সপ্তদুর্গা"।

নগরের মধ্যে হিন্দুও বাস করতো, মুসলমানও থাকতো। হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ছিল খুব বেশী। এখানে কোন জায়গাই হিন্দু-মুসলমান ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। যে-সময় হিন্দু-মুসলমানে ও মুসলমানে-মুসলমানে সাংঘাতিক কাটাকাটি মারামারি হতো অন্য জায়গায়, সেই সময় সাতগড়া যাঁরা মুসলমানেরা একটাকিয়া রাজবংশের চাকরি করতো নির্বিবাদে। মুসলমানেরা অবশ্য কোন কোনটাই এক-টাকিয়া রাজাদের সঙ্গে বিবাদ করেনি। হিন্দুদের সঙ্গেও বিবাদ করেনি, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি তো ছিলই না।

সপ্তদুর্গা সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে, বহু গল্প আছে। এই ভাদুড়ী বংশেরই এক রাজা—রাজা গণেশনারায়ণ খাঁ গৌড়ের বাদশাহ হয়ে সমস্ত বাংলাদেশে একছত্র রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী অনেক পরের ও সে হলো স্বতন্ত্র কাহিনী।

অগ্নি-পরীক্ষা

শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ত্রৈলোক্যের রাজা হলেন তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ। দৈত্যদের [illegible] তাঁরা তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেই থাকতে। প্রহ্লাদের অসাধারণ ঐশ্বর্যের ওপর লোভ করা। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ঐশ্বর্যের ভাগ্যাতে পারলেন না। তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ছেড়ে পালাতে হলো।

ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য-সুখভোগ ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে নিজের দুঃখের কথা জানালেন, কীভাবে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করা যায়।

বৃহস্পতি বললেন, "দৈত্যরাজ্যের এ-সব ব্যাপারে কুটবুদ্ধিসম্পন্ন শুক্রাচার্যের সঙ্গে কোনো-রকম কূটনীতি আছে শুক্রাচার্যের। তাঁকে ধরতে পারলেই কাজ হবে।"

বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র গেলেন শুক্রাচার্যের কাছে ছদ্মবেশে।

ইন্দ্রের কথা শুনে শুক্রাচার্য বললেন, "দৈত্যরা প্রহ্লাদ নিজে। তাদের ক্ষতি হয় এমন পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু দেবতাদের কূটনীতিতে দৈত্য দৈত্যরা স্বর্গের রক্ষা করিবার করে থাকে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তবে প্রশ্নের কথা, দৈত্যদের রক্ষা এখন প্রহ্লাদে। তিনি মহা ধার্মিক। স্বয়ংসুদ রাজত্ব পেয়েও তিনি অধর্মের কিছু করেন না।"

ইন্দ্রদেব রাগে চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "তা হলে কি আমাদের রাজ্যহারা হয়েই থাকতে হবে চিরদিন, আচার্যদেব?"

শুক্রাচার্য বললেন, "সময়ের কথাই বটে। এর দুঃসময়ের উপায় হতে পারে যদি প্রহ্লাদের আচার-ব্যবহারে, তাঁর চরিত্রে কোনো দোষ ধরিয়ে দেওয়া যায়। তা হলেই স্বর্গরাজ্য থেকে তাঁর পতন ঘটবে, আর তখন দেবতাদেরও রক্ষা উদ্ধার করার সুযোগ হবে। তবে-তার দেবতাদেরই নেওয়া উচিত।"

শুক্রাচার্যের ইঙ্গিত বুঝে দেবরাজ ইন্দ্র নিজেই ব্রাহ্মণের বেশে প্রহ্লাদের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

*

রাজসভায় সমাগত লোকজনের সমাদর হলো। অভ্যর্থনাও তাঁর যথেষ্ট। তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে তাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয় না।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণ সেজে গিয়েছেন। আসলে কে তিনি, প্রহ্লাদ চিনতে পারলেন না। হাতে স্বর্গ, আদর-যত্ন করে কাছে ডেকে বসালেন, "আপনি কী চান?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "মহারাজ, আমার প্রার্থনা আছে। অভয় দেন তো বলি।"

"কিন্তু আগেই জানা দরকার, আমাকে নিরাশ হতে হবে না তো?"

প্রহ্লাদ হেসে বললেন, "না না, নিরাশ হবেন কেন? আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।"

ব্রাহ্মণ বেশধারী ইন্দ্র জানতেন, প্রহ্লাদের অনেক ধনসম্পদের অভাব ছিল না। এখন কিছুই তাঁর নেই। তা ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁকে হয় লড়তে হবে, আর্থিক ক্ষতি আর কষ্ট নিতে পারে না।

প্রহ্লাদ জানতেন, ব্রাহ্মণ মূর্খ ধনরত্ন চান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ধনসম্পদ-টনসম্পদ কিছু চান?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন, "না।"

"তবে কি আপনি বিত্তসম্পদও চান?"

এবারও ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "না।"

"তবে কী চান আপনি?" প্রহ্লাদ একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—তাঁর গৃহের অভাব, না বস্ত্রের অভাব, না খাদ্যের অভাব?

ব্রাহ্মণ প্রত্যেকবারই উত্তর দিলেন, "ওসব তুচ্ছ জিনিসের ওপর আমার লোভ নেই।"

তা হলে কী চান তিনি? ব্রাহ্মণ তখন স্পষ্ট করেই বললেন, "আমি চাই আপনার চরিত্রটি—যে-চরিত্রের গুণে আপনি স্বর্গের রাজ্য আপনি ফেরা দিয়েছেন, আমি যাচ্ঞা করে নিরাশ হব না। সেই কথা রক্ষা করুন, মহারাজ—আপনার চরিত্রটি আমাকে দান করুন।"

একি অদ্ভুত বায়না! কোনও চরিত্র কি দান করার জিনিস? প্রহ্লাদ বললেন, "এ যে অসম্ভব কথা বললেন আপনি। চোখের চাহনি তো চলিষ্ণুচিত্তের মতো স্থৈর্যকে রাখা চলে না যে, তাকে ধরে দেওয়া যায়! আমি কথা দিয়েছি সত্য—আপনি নিরাশ হবেন না, কিন্তু আপনার আদেশ রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি তো আমার নেই।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার প্রার্থনা আমি জানিয়েছি। আপনার কথা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার নিজের।"

ব্রাহ্মণের [illegible] কিসে মিটতে পারে, স্থির করতে না পেরে প্রহ্লাদ মাথা হেঁট করে রইলেন।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র রাজের জ্ঞান করে বললেন, "কথা দিয়ে আপনি কথা রাখতে পারলেন না। আপনার ধর্ম রইলো কোথায়? আপনি তো পাপী!"—এই বলেই তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে গর গর

রাগে গজরাতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছেন ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী ইন্দ্র

করতে করতে রাজসভা থেকে চলে গেলেন।

ইন্দ্রসেনের কৌশলে প্রহ্লাদের চরিত্রে সন্দেহের ছায়া পড়ল। তাঁর মনেও হতে লাগল—এই পাপেই হয়তো তাঁর সর্বস্ব খোয়াতে হবে।

প্রহ্লাদ যে-ভয় করছিলেন, এক এক ঘটতেও লাগল তাই।

তিনি দেখলেন—তাঁর শরীর থেকে একটা আলো বেরিয়ে এলো, আর তা জ্যোতির মূর্তি ধরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি চললুম।"

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি?"

উত্তর হলো, "আমি ধর্ম। চরিত্রের সঙ্গে আমি থাকি। তোমার মনে পাপের কল্ক ঢুকেছে, তোমার চরিত্র আর তেমনটি নেই; আমারও তাই তার সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে।" এই বলে জ্যোতির মূর্তি মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদও যেন মনমরা হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদের শরীর থেকে আর-একটা আলো বার হলো। সে-আলোও জ্যোতির মূর্তি ধরে তাঁর সামনে এসে বললেন, "আমি চললুম।"

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি?"

উত্তর শোনা গেল, "আমি সত্য। ধর্ম যেখানে থাকে, আমিও সেখানে থাকি। ধর্ম তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমাকেও তাই সঙ্গে ছেড়ে যেতে হচ্ছে।"

জ্যোতির মূর্তি মিলিয়ে যেতেই প্রহ্লাদ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

এরপর তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এলো জ্যোতির তৃতীয় এক মূর্তি। তিনি বললেন, "আমি শক্তি। সত্যের সঙ্গী আমি। সত্য তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমিও চললুম।"

শক্তি চলে যেতেই প্রহ্লাদ হয়ে পড়লেন যেন অবশ—অবসন্ন। উদাস দৃষ্টিতে তিনি শুধু তাকাতে লাগলেন।

দেখতে না-দেখতে তাঁর চোখের সামনে প্রকাশ পেলেন এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি। প্রহ্লাদ শুনতে পেলেন সেই মূর্তির কণ্ঠ, "আমি মহালক্ষ্মী। শক্তি ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তোমার যে-শক্তি আর নেই। আমিও তাই তোমাকে ছেড়ে চললুম।"

মহালক্ষ্মীর সেই মূর্তি অন্তর্ধানের পরে স্বর্গের দিকে চললেন। ইন্দ্রসেন সেই পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাতে বরণ করে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদকেও হারাতে হলো স্বর্গের সিংহাসন।

বক-প্রকৃতি

॥ নরেন্দ্র দেব ॥

রাজকুমারীর শুনের পাখি
সোনার খাঁচায় একলা থাকে
ভোরের আলোয় সকাল বেলা
আকুল সুরে সবাই ডাকে।

ছোট্ট একটি বনের পাখি
মনেতে উড়ে খাঁচার ধারে
খোকার চোখার পথ না পেয়ে
ফিরতে আবার আকাশ পরে।

খাঁচার পাখির মনটি হুহু
উঠছে কেঁদেই দুঃখে আরে;
বনটি হয় মনের সেরেও
পড়তে চোখে অশ্রু ঝরে।

বনের পাখি শুধায় ডাকে,
কিসের তরে দুঃখী তুমি?
খাঁচার পাখি বলতে কোরে—
চাই ফিরে যেন আকাশ ভূমি।

মেলিয়ে আমার চপল ডানা
উড়বো উধাও হাওয়ার বুকে,
তবেই যাবে দুঃখ আমার
থাকবো আমি সুখের সুখে।

বড় আছে তাই দৃষ্টি সবাই,
খাঁচার বাহে রাখতে হয়,
রাজকুমারীর খেলা যারে
উপায় কিছুতেই হবার নয়।

বনের পাখি বলবে হেসে,
আকাশ পারে সৃষ্টি যেজে—
আমরা তুমি থাকবে ভালো
সোনার খাঁচায় বাইরে এলে?

থাকতে হবে পাচ্ছো ভালো
খুঁজবে বাহে সুখের আশা
পড়বে মনে আমার কথা
ফিরবে যখন বনের বাসা।

শুনতে পেয়ে হৃদয়ের কথা
হাসিয়ে গলা বললে বক,
হায় সেটা নেই, সে চক্ষু সেটা
বনের পাখির বক্ষের সখ!

বন্দী জীবন হয় না সুখের
সইই বড় আদর ঢালে,
দুঃখ কষ্ট থাক্ তবু তোর—
আকাশ আলোয় মুক্তি ভালো।

সুরের সোনা দিস্‌নে কানে

শ্রীজ্যোতিলাল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কা আর কাক-বৌ।

এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মনের মত একটি জায়গা খুঁজে পায় না—যেখানে ওরা একটি বাসা বেঁধে বাস করবে।

কাক একটু নিরিবিলি পছন্দ করে। সে বললে,—চলো, মানুষের বসতি ছেড়ে একটু বনের ধারে গিয়ে থাকি—কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

উঁচু ডালে বাঁধবো বাসা—
থাকবো মনের সুখে—
কারো কোনো ধারবো না ধার
শান্তি হবে বুকে॥

কাক-বৌয়ের কিন্তু তা পছন্দ নয়। সে একটু লোভী কিনা,—তাই বড়লোকের বাড়ির আশে-পাশে থাকতে চায়।

প্রকাণ্ড হেতলা বাড়ি—চারদিকের বাগানে

"অবশেষে একটা বড় [redacted] বাসা বাঁধি।"

ছোট-বড় নানা জাতের গাছ—সেইটে দেখিয়ে কাক বললে,—চলো, আমরা ওখানের একটি বড় গাছে বাসা বাঁধি। ও-বাড়িতে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। সে রোজ সকালে উঠে পিয়ানো বাজায়। কারী মিষ্টি শব্দ। আমি ওরা রোজ যা খাবার ফেলে দেবে তাই খেয়ে আমাদের দুটি প্রাণীর দিব্যি চলে যাবে। কে আর মিছিমিছি মনসুরে-কপচুরে ঘুরে বেড়ায় বলো? একটু আরাম তো চাই।

কাক জবাব দেয়,—তোর বড় আলসি কাক-বৌ। আমাদের এত লোভ ভালো নয়। মানুষের বসতি থেকে দূরে থাকলে ভালো করে। এখানে-ওখানে উড়ে কি [redacted] রোজকার খাবার জোগাড় করা যেত না? কথায় বলে, লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু।

কাক-বৌ কিন্তু ওর কথা কানে তোলে না। বলে,—ওরে কাক, তুই বুঝিস নে! বড় গাছে নাও বাঁধতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে বাসা বাঁধলে কোনোদিন খাবারের অভাব হয় না।

ঠোঁট নেড়ে কাক বলে,—তোর যেমন ইচ্ছে! কিন্তু আমি বলে রাখছি—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে-দড়ি—ক্ষণেকে চাঁদ॥

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কাক-বৌয়ের কথাই থাকলো। সেই বড়লোকের বাড়ির সামনে একটি প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের ডালে ওরা সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে ফেললে। বড়লোকের মেয়েটি রোজ রোজ মাথা থেকে চুলের কাঁটা ফেলে দিয়ে নতুন কাঁটা ব্যবহার করে। কাক আর কাক-বৌ সেই চুলের কাঁটা কুড়িয়ে এনে সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে নিলে।

বাসা দেখে কাক-বৌ ভারী খুশী। বললে,—দেখলি কাক, ভাগ্যিস বড়লোকের আওতায় আছি। তাই [redacted] রোজ চুলের কাঁটা পাওয়া গেল। আর সেইজন্যেই এমন সুন্দর বাসা আমাদের হল। এ বাসা আমাদের কোনোদিন ভাঙবে না, আর ঝড়ে উড়ে যাবে না।

কাক ফোঁস্‌ করে কাটলে,—কী যে বলিস তুই! পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে! আজ আছে, কাল নেই! সেই বাসা নিয়ে গর্ব করিস তুই! বনের ধারে থাকলে আমরা সাঁচা মনের সুখে থাকতুম! কেউ আমাদের জ্বালাতন করত না।

কাক-বৌ ফোঁস করে উঠে বললে,—তোর যেমন বুদ্ধি! তোকে এত করে বুঝিয়ে বলি, কথা তুই কানে তুলিস না! এই যে রোজ বড়লোকের মেয়ের পিয়ানোর সঙ্গে মিষ্টি গান শুনছি,—এই শুনতে শুনতে আমাদেরও গান গাইবার ইচ্ছে মনে জাগবে। আর পিয়ানোর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদেরও কণ্ঠ মিষ্টি হবে। আমরা গান গাইতে পারি না বলে, কোকিলরা আমাদের কত ঠাট্টা করে! অথচ মজা দেখ, ওদের ডিম ফোটাবার জন্যে কাকের বাসায় চুপি চুপি রেখে দিয়ে যায়। মোদ্দা মরি।

একটু দম নিয়ে কাক-বৌ আবার বলে,—এইবার আমি ঠিক করেছি, যে করেই হোক, গানের গলা আমার মিষ্টি করতেই হবে। রোজ পিয়ানোর সঙ্গে গান গাইলে গলা ভালো না হয়ে যায়! তুইও আমার সঙ্গে গাইবি রোজ, বুঝলি?

কাক-বৌয়ের কথা শুনে কাক হো হো হি হি করে হাসতে লাগলো। বলল,—তোর যেমন কথা কাক-বৌ! কাকের গলায় কখনো গান জন্মে? বিধাতা যে আমাদের মেরে রেখেছে! আমাদের যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

টিপ্পনী কেটে কাক-বৌ বললে,—তোর ও-সব হতাশার কথা আমি ভালো বুঝিনে। বনের ধারে থাকলে গানের গলাও ভালো হবে না, আর বড়লোকের বাড়ির ভালো-মন্দ খাবারও খাওয়া যাবে না। এখানে আছি—বেশ আছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কাক উত্তর দিলে,—থাকতে চাইছ এখানে, থাক। আমি বাধা দেবো না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখিস—আমাদের দেশের প্রবীণ মাতব্বরেরা বলে—

"পরের সোনা দিস্‌নে কানে—
ফেড়ে নেবে হাঁচকা টানে॥"

আর দুদিন পরে তোর বাচ্চা হবে। কখন, কোন্‌দিক থেকে কী বিপদ আসে কেউ বলতে পারে? বড়লোকের বাড়ির আওতা ছেড়ে—বনের ধারে গিয়ে থাকলে, প্রাণে ভয় নিয়ে বসবাস করতে হত না!

কাক-বৌ ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—কোনো ভয় নেই তোর। এত উঁচু গাছের ডালে আমার বিপদ কিসের? এক কড়ের

বাসা ছেড়ে নীড় ফেলে দিল

ভয়। সে ভয় [redacted] অনেক আছে।

কাক আর কাক-বৌ তখন সেই উঁচু গাছের ডালেই মনের আনন্দে বাসা বেঁধে বাস করতে লাগলো।

কয়েকদিন বাদেই ঠিক কড়ো কাক-বৌয়ের বাচ্চা বেরুলো। কাক-বৌয়ের আনন্দ দেখে কে! ওরা খুব ছেলেবেলা থেকেই পিয়ানোর গান শুনতে পাবে, কোকিলের মতো ওদের মিষ্টি গলা হবে,—এই আনন্দেই সে একেবারে আত্মহারা!

আরো কিছুদিন যাক—কোনো অসুবিধে নেই এখানে। বড়লোকের ছেলে যে-সব খাবার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাই খেয়েই ওরা মনের আনন্দে আছে। কাক-বৌ বলে,—দেখলি মজা! আমি আগেই বলেছিলাম না? বড় গাছে লোকে বাসতে হয়। তা হলে আর ঝড়-বাদলে কোনো বিপদের ভয় থাকে না!

কাক কোনো উত্তর করে না, শুধু মাথা নাড়ে!

কিছুদিন বাদে সেই বড়লোকের বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়!

দলে দলে লোকজন খাটছে, মালীরা বাগানের আগাছা সাফ করছে। মিস্ত্রীরা নতুন করে অট্টালিকার রঙ লাগাচ্ছে। মুদি, ফাকড়া, গয়লা, বাসনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা এদের আনাগোনা বেড়ে যেতে লাগলো।

কাক শঙ্কিত হয়ে বলল,—বাড়িতে কী যেন কাণ্ড হবে. আমরা এখান থেকে পালাই, চল—

কাক-বৌ হেসে উত্তর দিলে,—তোর যেমন বুদ্ধি! আমাদের পালাবার কী হয়েছে! আমি খোঁজ নিয়েছি। বড়লোকের সেই সুন্দরী মেয়েটার বিয়ে হবে। চারদিকে সব লাল রঙের চিঠি পাঠানো হচ্ছে, দেখিসনি? আরো ও মজাই হল! মিঠাই-মণ্ডা, মাছ, মাংস প্রচুর খাওয়া যাবে। তুই চুপ করে বসে দেখ্ মা কণ্ডটা!

কাক আর প্রতিবাদ করে না, শুধু আপন মনে মাথা নেড়ে বলে, ক-ও-রা—কা—কা—!

আস্তে আস্তে বড়লোকের বাড়ি নতুন রঙে নেজে ঝলমল করে ওঠে। দোলাংগুলো নতুন রূপ পায়। বাড়ির সামনে আকাশ ছোঁয়া তোরণ আর নহবৎ বসে।

লোকজনের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। নানা যায়গা থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে সেই বিশাল অট্টালিকা ভর্তি করে ফেলে। ছেলে-মেয়েদের কত রকমের সাজ পোশাক। ঘরে ঘরে সব বাসন কোসন আসে। কত রকমের গয়না-গাঁটি পরে মেয়েরা খাবারে ঘুরে বেড়ায়। উদ্যানের ফুয়ারা-চোয়া ফোয়ারাগুলি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়।

কাক বলে,—এখনো ভেবে দেখ্ কাক-বৌ! কাক-বৌ জবাব দেয়,—তোর যেমন কথা! এত ভুই ভাঁড়ু কেন আমায় বলতে পারিস?

একটু থেমে সে আবার বলে,—তার চাইতে চল্ আমাদের আত্মীয়-স্বজন যে-খানে আছে—সবাইকে নেমন্তন্ন করে আসি। আমরা এখানে কী সুখে আছি—সবাইকে দেখাতে হবে তো! জ্ঞাতি-কুটুম্বরা আমাদের বড়লোক দেখলে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে!

কাকের মনে ইচ্ছে ছিল না। তবু কাক-বৌয়ের প্রস্তাবে কাকেরও ওর কথায় রাজি হতে হল। সে আত্মীয়-স্বজনকে নেমন্তন্ন করতে।

এদিকে বড়লোকের বাড়ির মানেজারের হুকুমে একদল ইলেকট্রিক মিস্ত্রী উঠে পড়ল বাগানের লম্বা লম্বা সব গাছগুলির উপর। বাড়ির এককন্যে মেয়ের বিয়ে। গোটা বাগানটা ছোট ছোট লাল-নীল সবুজে বেগুনী বালব দিয়ে সাজাতে হবে। প্রত্যেকটি গাছের ডালে-ডালে বিজলীর তার ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছে তারা।

যখন সেই সব মিস্ত্রীরা দল বেঁধে গাছে উঠল দেখলো, একটা কাকের বাসা। ছোট্ট ছোট্ট কাকের ছানাগুলি কিচের মচমচ—কা—কা করে চেঁচাচ্ছে।

আর একটি মিস্ত্রী তাকে সার দিয়ে [illegible] দিলে,—ঠিক কথা বলেছিস ভাই! এই রকম নোংরা কাকের বাসা থাকলে ইলেকট্রিকের তার গাছের ডালে জড়াবে কী করে?

ওরা একটা কাঠের টুকরো দিয়ে সেই কাক আর কাক-বৌয়ের বাসা ভেঙে নীচে ফেলে দিলে! কাকের ফুলে-ফুলে ছানা-গুলি তলায় পড়ে যে চোট পেলে তাতেই মরে গেল!

তারপর মিস্ত্রীর দল নিজেদের কাজ শেষ করে লম্বা মইয়ের মই বেয়ে নীচে নেমে গেল!

এর অনেকক্ষণ বাদে কাক আর কাক-বৌ বহু রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ধুলোয় লুটোচ্ছে, আর তাদের ছানাগুলি মরে পড়ে আছে—এধারে-ওধারে! রাশি রাশি লাল পিঁপড়ে ওদের ঘেঁকে ধরেছে!

গুণধর

লেখা ও ছবি—শৈলেন চক্রবর্তী

গুণধর গোরুর কথা জানো কি?
জান না। তবে বলি শোনো—
তার চারটি পা, মাথায় দুই শিং, [illegible]
কানও দুটি কিন্তু বেশ বড় বড়।
বড় মানে কী? বেশী শোনে
বেশী শোনে মানে কী?
বেশী বোঝে.
এমন কি মানুষের কথাও বোঝে সে।

আমার সঙ্গে কী ভাব!
ভাব তো ভাব, কিন্তু কেন ভাব?
তা বলবো না।
কিছুতেই বলবো না—
শুধু একটু বলছি—
আমি তো বই পড়ি, নামতা পড়ি
কত কিছু পড়ি।
পড়ার ঘরের পাশেই গোয়াল।
আমার পড়া শোনে আর ভাবে কাটে
আর মধ্যে মাঝে বলে,
বি এল্ এ রা—আ—আ—আ—
কিন্তু তাও নয়—
একদিন কাকা বললে
তিন পাঁচে কত রে?
আমি বললুম, তেরটি।
কাকা বললে, তুই একটা অপদার্থ গোরু!
পাশের ঘরে গুণধরের কী হাসি!
তারপরে সে আমায় বললে কি জানো?
বললে, তুমিও গোরু, আমিও গোরু—
কী মজা, হায় হায় হায়
বি-এল-এ রা—আ—আ,
তোমার সঙ্গে বেশী ভাব, আর হায়
বি এল এ রা—রা—রা—
এই তো সে আমায় হয়ে ছেটে চলে,
পিঠ দুলকে দেয়,
আর, আমার বারান্দাখানা
আনন্দে চিঁচিয়ে ওঠে।
যা থাক, নামতা তো আমার মুখস্থ!

একাগ্রতা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহাভারতে আছে—কৌরবদের শস্ত্র-পরীক্ষার সময় দ্রোণাচার্য এক গাছের ডালে পাতার ফাঁকে একটা মাটির পাখি রেখে তার বুকে পরীক্ষার্থীদের শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী দেখছ তোমরা?" তাতে যার জবাব দিয়েছিল—"গাছ দেখছি, ডালপালা দেখছি, আকাশের দেখছি"—তাদের আর পরীক্ষা নিতেই দেননি। এই রকম পরীক্ষার্থীই ছিল বেশির ভাগ। কেবল অর্জুন বলেছিলেন, "শুধু পাখিটা দেখছি।" দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন, "গোটা পাখিটা দেখছ?" অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন, "না প্রভু, শুধু ওর চোখটা দেখছি।" খুশী হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য বলেছিলেন, "এইবার তীর ছোড়।" অর্জুনের তীর পাখির সেই বিন্দুর মত চোখটাই বিদ্ধ করেছিল। দ্রোণাচার্য বলেছিলেন—তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ—ওঁর তুলনা নেই।

কিন্তু শুধু ধনুর্বিদ্যা নয়—মানুষের জীবনে যে-কোন বিদ্যার পারদর্শী হতে গেলে, যে-কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলেই চাই এই একাগ্রতা, তন্ময়তা।

আধুনিক যুগের একজনের কথাই বলছি।

তোমরা পেনিসিলিনের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। সে এক আশ্চর্য ওষুধ—এতকাল যে-সব রোগ ছিল চিকিৎসার অসাধ্য বা দুঃসাধ্য—যা ছিল কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক—তা অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সেরে যাচ্ছে এই ওষুধের কল্যাণে।

বহু রোগের বীজাণু ধ্বংস করতে পারে এই ওষুধটি। অবশ্য বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে অনিষ্টও হয় মানুষের। চট করে সেরে-যায় বলে চিকিৎসকরা যেখানে সেখানে পেনিসিলিন প্রয়োগ করেন—তার ফলে রোগীর এক এক সময় প্রাণান্ত হবার যোগাড় হয়। এঁর আবিষ্কারক স্বয়ং আলেকজান্ডার ফ্লেমিং—আমাদের দেশে এসেই বলে গেছেন, "সেজন্যই তোমাদের, তোমরা পেনিসিলিনের এত অযথা ব্যবহার বন্ধ কর।"

কিন্তু মহাসন্ধিক্ষণী জিনিস বলেই এত সতর্কতা তাঁর। পাদুপত অস্ত্র দেবার সময় মহাদেব অর্জুনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "খুব সাবধান! এ অস্ত্রের হাত থেকে দেব অসুর যক্ষ রক্ষ কারও নিস্তার নেই বটে—কিন্তু নামান্য মানুষের ওপর কখনও প্রয়োগ করতে যেও না—তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, বিশ্বে প্রলয় দেখা দেবে।"

এমন ওষুধ আমরা বার করতে পারি না কেন?

কেন পারি না—তার জবাব পাওয়া যাবে এই আশ্চর্য ওষুধ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে।

গল্পটি বলেছেন তাঁরই কর্মসচিব বা সেক্রেটারি। ঘটনার মধ্যে তিনিও জড়িত ছিলেন।

১৯৪৪ সাল। জিলেছে নিত্য বোমা পড়ছে। এক আধটা নয়—অসংখ্য, অজস্র। গোটা লেনটাই ধ্বসে হতে বসেছে প্রায়।

সাধে আলেকজান্ডারের তখন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, কী সব জরুরী নোট দিচ্ছেন, সেক্রেটারি বসে লিখে নিচ্ছেন সেগুলো। বলতে বলতেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন তিনি—কোন সুদূরে মন চলে যাচ্ছে। চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেলছেন মধ্যে মধ্যে।

এমনি একটি তন্ময়-মুহূর্তে বাজছে তাঁর। এখন সময় বোমা পড়বার বিপদ আসার জানিয়ে সাইরেন বেজে উঠল।

এরোড্রোম নয়—বোমারু [redacted] উড়ে আসছে। উড়ুক্কু বোমা যাকে বলে—ডাই। সাধারণ বোমার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী।

মুখ শুকিয়ে উঠল সেক্রেটারির। তিনি অসহায় বিপন্নভাবে চাইলেন স্যার অলেকজান্ডারের মুখের দিকে।

কিন্তু সেই জ্ঞানতপস্বী নির্বিকার। তিনি নিজের সাধনায় ডুবে গেছেন তখন। তেমনি স্থির নিশ্চলভাবে বসে রইলেন তিনি।

আর একটু পরে দ্বিতীয় বার বাজল সাইরেন। অর্থাৎ এসে পড়েছে।

আর সে ত খোলা জানলা দিয়ে নিজের চোখেই দেখছেন সেক্রেটারি। কানেই শুনতে পাচ্ছেন তার আগমনের বিকট ঘর্ঘর ধ্বনি।

অমোঘ অবার্থ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসছে, তাদেরই লক্ষ্য করে।

সেক্রেটারি স্থির হয়ে নেতে উঠলেন ভয়ে, হাত এত কাঁপছে যে পেন্সিলটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। আবারও অসহায় করুণভাবে চাইলেন স্যার আলেকজান্ডারের দিকে। তিনিও চেয়ে আছেন জানলার দিকেই—কিন্তু নির্বিকার প্রশান্ত তাঁর মুখভাব, ললাটের একটি রেখাও চঞ্চল হচ্ছে না ঐই আসন্ন মৃত্যুর সামনে।

ছমে সে বস্তুটি মাথার উপরে এল।

না,—এ বাড়িতে পড়েনি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। একেবারে কান-ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া বাকে বলে।

কিন্তু ফেটে একেবারে বাড়িটার উপর দিয়েই। তার ফলে গোটা বাড়িটা ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল। দূরে গিয়ে যেখানে পড়ল—সেখানকার সে বিস্ফোরণের শব্দও কম নয়। কানে যেন তালা লেগে গেল সে শব্দে। তবু এতটুকু বিচলিত হলেন না স্যার। তেমনি স্বপ্নালু সুদূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।

একটু পরেই আবারও সাইরেন বাজল,—'অল্ ক্লিয়ার' সাইরেন। বিপদ কেটে গেছে—এবার অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এই সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কাণ্ড ঘটে গেল। স্যার আলেকজান্ডার হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, "জুকোও, জুকোও! করছ কি—শুনতে পাচ্ছ না—এখনি বোমা পড়বে যে!"

বলতে বলতে নিজেও ঝিয়ে খুড়ি মেরে একটা টেবিলের নীচে ঢুকলেন!

আগের সাইরেন বা বোমার শব্দ কোনটাই কানে যায়নি তাঁর। এইটেকেই তিনি বিপদসূচক সাইরেন ভেবেছেন। এমনি তন্ময়তা ও একাগ্রতা না থাকলে পৃথিবীতে কোন বড় কাজই করা যায় না—কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

স্বপ্নালু সুদূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি

কে জবদ??

লীলা মজুমদার

১নং

ডাই

কাল যখন গুপ্তস্থানে তোমার চিঠি পেলুম না, তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, সে আর কী বলব। তবে কি তুমি এত সহজেই জব্দ খেয়ে গেলে? চিরকাল তো দেখে এসেছি যে, স্বয়ং হেডস্যার পেছন ফিরে বোর্ডে কিছু লিখতে গেলেই, তুমি ছোঁড়ি কাউকে, ঘুষি দেখাতে, সে-সময় তো তোমার অন্য মূর্তি দেখতুম।

এমনও নয় যে তোমার অসুখ করেছে। তা হলে আমার চিঠিটা নিতে কী করে? তাছাড়া মামার সঙ্গে হুক মুলিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া হচ্ছিল, সে কি আমার চোখে পড়েনি ভেবেছ?

তোমাদের বাড়ির লোকদের ধারণা, আমার সঙ্গে মিশলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাই তাঁদের মন ভোলাবার জন্যেই ওদের এসব চেষ্টা, সে কি তুমি বোঝ না?

তাহলে তোমার এও জানা উচিত যে, আমাদের বাড়ির লোকদের বিশ্বাস, তুমি একটা পাজি ছেলে, তাই আমাকে ও-স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

তোমার সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাব, একথা জেনেও আমি তোমাকে ছাড়িনি; আর তুমি কি শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ নাকি? আমাদের বাড়ির লোকরা বলে, তোমার চেঁচির বাগানো দেখেই তোমাকে ছাড়ে ছাড়ে ভেবে যায়। সে কথা কি তবে সত্যি?

অবিশ্যি এও হতে পারে যে, অন্য কোনো দুষ্টু লোকে আমার চিঠিখানা লিখেছে, তুমি সেটা পাওনি। কিন্তু তুমি তাদের বলে না নিলে গুপ্তস্থান খুঁজে বের করা কারো পক্ষে তো সম্ভব নয়।

তোমাদের বাড়ির লোকদের ডিনারে আমার বাবা নেই। ওরা বাবা তোমার ওপর কোনো হুকুম জোর-জবরদস্তি করে তো আমাকে একটু জানানোই হয়। ওদের আমি একবার দেখে নিই! হাই হক, আমাদের বাড়ির লোকদের ছেলে খারাপ হলে আর ওরা হতে পারে না।

এ চিঠির উত্তর তোমার দেওয়া চাই-ই। কারণ সেই তাদের এ-রকম বন্দী অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমার অবস্থা তো সবই জানো, ওদের খাবার জোগানো আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না অথচ কষ্ট ইচ্ছিল হবার ভয়ে মরে গেলেও তো প্রাণঘোড়া লোকজন। ভালো চাও তো চিঠি পেয়েই গুপ্তস্থানে উত্তর রেখে দেবে।

ইতি

২নং

ডাই

তা বললে তো চলবে না, এই সময় ওরা মরে গেলে হবে না। আমি আর ধরে আনতে পারব না বলে রাখলুম। প্রাণ হাতে নিয়ে ও-কাজ করতে হয়েছিল। আর বাগানের ও-সিকোটাস্তে কি ফল ধরুবন, তোমার কোনো ধারণাই নেই। আমি বলেই পেরেছিলাম। বড় জোর তিন বারে কাজ। তারপর তো আর খাবারের দরকার হবে না, এখন কার প্রাণ রক্ষাবিচার কিসের? তবে আশা করি ওদের এত সস্তা মনে হয়নি? তা হলে হিংসে হয়ে উঠে আবার পরস্পরকে না আক্রমণ করে!

আমাদের বাড়ির লোকরা রবিবারের ডিনারের খোর জন্যে বাড়িসুদ্ধু সকলের টিকিট কিনেছে আর প্রতিবার ডোরে বস বেঁধে লোনাবপুরে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে লুচি পাঁঠা রান্না হবে। আমাকে হিংসে করে আমার বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো, তাতে আমার কাটচল্লাও এসে যাবে না। তাছাড়া ওরা যে লোক ভালো নয় সে তো আমি বরাবর জানি। গত বছর রান্না দেখতে যাওয়া নিয়ে কী ঝামেলা করেছিল, সে আমি আজও ভুলিনি। না বলে যাব না তো কী করে বেড়াব? বললে কি ওরা যেতে দিত? বলতে চাও? সে যাক গে, এবার একটু চুপচাপ থাকো, এদের মনের সন্দেহ টন্দেহ দূর হক, তারপর আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। ওদিকে আমিও বিষম ফ্যাসাদে পড়েছি, টাকাকড়ি না হলে তো কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। তোমার জন্যেদিনে পাওয়া টাকাগুলো এরই মধ্যে কী করে খরচ হয়ে গেল, ভেবে পেলুম না। সব টাকা আমি জোগাব, আমি কি একটা ব্যাঙ্ক নাকি? ঐ যে কি নাম, স্কুলে যাচ্ছি যা নিয়ে দেবতারা ঝগড়া করতেন, ইচ্ছে-গাই না কী যেন?

ইতি

পুঃ—কালকের চিঠির উত্তর দিইনি, কারণ ফুলুরা কোথেকে আমার সঙ্গে কটলেট খেতে যাবার সময় পাইনি।

৩নং

ডাই

তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে বাকি রইল না, তোমার কতদূর অধঃপতন হয়েছে। দশটাকার টাকা দিয়ে তো কবে সেই টিকিটের আলবাম কিনেছিলুম, কোন্ কালে সে হারিয়েও গেছে।

আর টাকার অভাব আবার একটা কথা নাকি? আমার অনেক হাতের লেখা লিখতে হয়, নইলে টাকা রেজগার করা কি এমন শক্ত বুঝতে না। আমি এক কায়দার উপায় বাতলে দিচ্ছি, তাতে কিছু টাকার উপায় হবেই। যেমন: (১) ছেলেভোলার লোকান— কোনো মূল্যবান লাগে না। তোদের রান্নাঘরে ও ভাঁড়ারঘরে সব পাবি। (২) ধারের ব্যবসা। রামার কাছ থেকে নগদ টাকা ছেড়ে দু-টাকায় কারবার তিনটাকা দেবে। আবার খাটানি, হয়ে যাচ্ছে চারটাকা—তা হলেই হবে ৫০ পার্সেন্ট লাভ। তোদের পুরোনো টেডিওই লটারি করে দে, একটাকা টিকিট। তিন দিনে নতুন টিকিট বিক্রি হবে—আর পেন্সিল দিয়ে একটা নতুন রেডিও কিনবি, বাকি টাকা তোমার। এইগুলো করে দাখ, নিশ্চয়ই বড়লোক হবি।

ইতি

পুঃ—আর সাথে, দু একদিনের মধ্যে খাবার বন্ধ। ওদের মধ্যে তিনজন মরতে চলছে না। কাটলেট খায় না কেউ। বুদ্ধিও না।

৪নং

ডাই

তোর আহ্লাদ দেখে অবাক হই! আমি সব করব আর উনি শুধু বুদ্ধি জোগাবেন, এতো মজা মন্দ না। এদিকে চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ওদের জব্দ করে তোদের বাড়ি গোল্লায় দিচ্ছিস, রেখেছিস? সন্দেহ করে না আশা করি?

করল আমার খুব মনে হয় না—আমাদের পাছু নিয়েছে। জানিস তো ওর কি রকম লোভ! আমাকে এক দণ্ড ছাড়ে না, ইস্কুলে সঙ্গে সঙ্গে যায় আসে, গোপনকথাদের সাথে দিয়ে যাই আসি। তবে, টিফিন নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে। কেউ নিশ্চয় ওকে টাকা দিয়ে বশ করেছে। কারণ চিরকাল তো ওর টাকি পড়ের মাঠ বলে জানি, অথচ কাল যখন সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, পকেট থেকে অনবরত লক্ষ ইচ্ছিল ও চাল করতে পারি পেলে এ চিঠির বাবস্থা করবে।

যাই হক তুই কিছু ভাবিস না, কাল একটা হেস্তনেস্ত করবই। কিন্তু ভাই মনে থাকে যেন, এবার আজাতে বাজা করতেই হবে, আমি আর শূন্য হাতে পকেটে ফেরী নই। এত করছি শুধু, ঐ জন্যেই।

ইতি

৫নং

ভাই

গুপ্তস্থানের কথাটা ন—কে বলতে হয়েছে, কারণ এর আমাকে দুশ্চিন্ত উপায়ি জেরাপ করেছিল, 'চিঠিপত্র নেওয়া দানার আর কোনো বাবস্থা করা হেল না। তবে ও কাউকে বলবে না বলেছে। ওর নাকি ভয় করে, যদি ধরা পড়ে তাই। তাই ওকে কিন্তু সেনাপতি না করলে ঘরতো সব ফাঁস করে দেবে। এদিকে ওদের তো প্রায় সমস্ত দফা শেষ। পেয়ারাকে আর চুকতেও ইচ্ছে করে না। সেই অনাদের 'পরই কাজ চালাতে হবে। টাকায় কিছু, করতে পেরেছিস নাকি? বেশী কেনবার কী দরকার? গোটা পাঁচেক হলেই তো যথেষ্ট। আমি ছোড়দাদের পাকাচুল তুলে একটাকা জমিয়েছি, বাকিটা কিন্তু তোকে তুলতেই হবে, নইলে সব মাটি, আর সময়ও নেই।

ইতি

৬নং

ভাই

শুনে খুশী হবি, সব বাবস্থা করে ফেলেছি। ন—ই আমার পাপে বর হল। একেও বলে টানতে হল। বলেছি চলো করে দেব। ওর কাছ থেকে কিসটাকা ধার নিয়ে পাঁচটা কিনেছি। আর যা যা লাগবে তোর টাকাটা দিয়েই হয়ে যাবে। আজ রাতে ন—কে দিয়ে সব বাবস্থা করে ফেলবে। তুই ন—কে দিয়ে নেই অন্যদের জোগাড় করে পাঠাস আর টাকাটাও দিস। তা হলে কাল হোয়ের মধ্যে সব হয়ে যাবে। শুধু তাদের বাড়িতে রাখা চলে না, এই এক মুশ্কিল থেকে গেল।

ইতি

৭নং

ভাই

আমার মাঠা মাঠা সর্দি জ্বর হয়েছে জানতুম অত জেলাপ আমার সইবে না। তার ওপর সকাল থেকে মন খারাপ, কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। ন—কে দেখা নেই, সেই কাল সন্ধেবেলা টাকা নিয়ে আর অন্যগুলোকে নিয়ে গেছে তো গেছেই, কাজ হাসিল হয়েছে কিনা তা পর্যন্ত বুঝলুম না। সব জনাস ভাই, নইলে এই জোগলঙ্গা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

ইতি

ভাই গুপি,

আর গোপনতার কোনো দরকার নেই, যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। শম্ভু আর মন্টু দুজনে ছিলে রাতে নতুন খুড়োর পুকুরে পাঁচটা ছিপই ফেলা ফেলে রেখেছিল। ভোরে গিয়ে দেখে পাঁচটা চার সের সাড়ে চার সের রুইয়ে কাতলা পড়েছে। সেইগুলোকে তুলে নিয়ে চারটেকে ওরা পুকে. কমিটির চারজনার বাড়িতে নিজেদের নামে দিয়ে এসেছে আর একটা দিয়েছে নতুন খুড়োকে। একটা মিথ্যাবাদী যে, বলেছে চাঁপিগঞ্জে গিয়ে নাকি কোন কম্বুর পুকুর থেকে ধরেছে। তাঁরা তো সব আহ্লাদে আটখানা। মাছের গায়ে তো আর টিকিট ঝোলানো নেই যে, নতুন খুড়োর পুকুর থেকে ধরা।

নতুন খুড়ো এইমাত্র জাঠামশাইকে বলে গেলেন, শম্ভু আর মন্টু নাকি পুজোয় নাটকে রাজা আর শত্রু-রাজা হবে, আর তোকে আমাকে নাকি মন্ত্রী আর সেনাপতি করা হবে। সে পার্টগুলো কত ছোট তোর মনে আছে তো ভাই? আর শম্ভু মন্টুর পেজমি দেখলি। নতুন খুড়োর পুকুর থেকেই মাতামাতি মাছ চুরি করে—চুরি নয় তো কি ভাই?—ওঁকে আর ওঁর দলটিকে দিয়ে আমাদের পার্টগুলো বাগিয়ে নিলে। এই বয়সেই এই, আরো বড় হলে যে পাকা দাগী চোর হবে না, তাই বা কে বলতে!

চাঁদের বুড়ী

নৃপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

চাঁদের বুড়ী চরকা কাটে সারাটা রাত ধরে,
জ্যোৎস্না ছেকে কালপেঁচারা আকাশ দিয়ে ওড়ে...
কিন্ধিং ছাকে,
বনের ফাঁকে
জোনকিরা জ্বলে,
মটমটিয়ে বাঁশের ঝাড়ে বাতাস কথা বলে.....
বুড়ি ওড়াও, সুতো ধরো,
খবর পাঠাও হাতে,
মনে মনে ডাক দিয়ে যাও
নিশুতি এই রাতে।
চাঁদের বুড়ী মুচকে হেসে ঝরাও উলের হাসি ছেলে
বুলকথাদের রুপোর কাঠি ছোঁয়াও কাছে এসে...
তাকতে ডাকতে ভোর হবে ই, পথটা অনেক দূর,
আসতে যদি না পারে সে
দেখবে ঝুলাল ঘোমে
পাঠিয়ে আছে এর বদলে সোনালী ভোরবেলা।

অথচ বুদ্ধিটা ছিল তোর আমার! কতবার থেকে ফাঁড়িং ধরে এনেছিলাম আমি, নেহাৎ তুই ধরতে পারলি না বলে কেড়ো দিয়ে ধরতে হল। কিন্তু সমস্তটা আমাদের মাথা থেকেই বেরুল, অথচ ফল ভোগ করছে ওরা দুটোতে। তোর বাবাও আমাদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন, নতুন খুড়ো তাঁকে কি বললেন জানিস? বললেন, ঐ জন্য গুপি দুটি গুণধরকে আলাদা করে দিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন, দাদা। শম্ভু মন্টুর মতো ভালো ছেলেদের সঙ্গে মিশলে এখনো ওদের সুমতি হতে পারে। নিজের পুকুরের মাছ উপহার পেয়েই একেবারে গলে জল। ঐ বুড়োকে কী করে জব্দ করা যায় এখন তাই ভাবছি। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে, গুপ্তস্থানটা ওরা জেনে গেল বলে। নইলে কচুকলের পেছনের ডাঙা সেয়ালের আলায় ইঁট সরিয়ে তার পেছনে চিঠি রেখে, আবার ইঁট বন্ধ করায় কথা তোর ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুতে ভাই?

ঠিক করেছি, তোর জ্বর হয়েছে বলে বাবা জাঠামশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার তোকে দেখতে যাব। তখন বাকি কথা হবে। ইতি—তোর প্রাণের বন্ধু

ভানু।

বুধো-ডাক্তারের ষাঁড়জব্বী

শেষে ঘেনুর কপালে ফোঁটা উঠলো। ফোঁটা বড়সড় হয়েই উঠলো। কী জ্বালা! উঠবি তো। ওঠ না কেন অন্য কোথাও। তা নয়, উঠলো কিনা ঘেনুর বেঁকে-চুরে-চুকচুকে ওপর-কপালের ঠিক মাঝখানে! পোকা নয় যে, ঘেনু টুঁসকি মেরে সেটা ফেলে দেবে। কুটো নয় যে, সটি করে ঝেড়ে ফেলবে। কাক-চড়ুই নয় যে, হুস্ করে উড়িয়ে দেবে। তা হলে ঘেনু করে কি এখন কপালের এই সিঁদুর রোঁইর মতন আঁচিলটাকে নিয়ে?

মরীহে, খেতে না খেলেতে কিছুতেই ঘেনুর কোনোদিন নেই। খালি বুকচুক্ করে আঁচিলটাকে তার টানতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া সবাই যখন অসভ্যের মতন পাটি-পাটি করে চেয়ে দেখে তার কপালের দিকে, তখন কী বিশ্রীই যে লাগে ঘেনুর, সে আর বলে বোঝানো যায় না। আরে, অমন করে দেখবার কী আছে? ঘেনু কি আঁচিল সারাবার কম চেষ্টা করেছে? চুন দিয়েছে, চুল জড়িয়েছে, সোডা-সাবিজমাটি ল্যাপরেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বরং পাঁচিল সারানোর সোডা, কিন্তু আঁচিল সারানোর ভাঁমেরেও ক্ষমতা!

ঘেনুর কষ্টটা আর কেউ না বুঝুক, পেনু কতকটা বুঝতে পারতো। ঘেনুর কষ্ট দেখে একদিন তাই সে নিজে থেকেই বলেছিল। তা ছাড়া বন্ধুর আপদ-বিপদে সাহায্য করাও তো দরকার। সে সুযোগ যখন এসেছে তখন পেনুর নিজে থেকেই সেটা করা উচিত। তাই সে সেদিন ঘেনুকে বোঝাতে লাগলো। "দেখ ঘেনো, তুই তো অনেক কিছু করলি, তা চল্ না কেন একবার বুধোবদ্যির কাছে, তোর আঁচিলটা সেরিয়ে আনি।"

"বুধো?" ঘেনু প্রশ্ন করলে, "সে উদ্যে আবার কে?"

ঘেনুর মন্তব্যে পেনু একটু চটেই উঠলো, সে জবাব দিলে, "আজ্ঞে, বুধোদাকে আর উদ্যে বলতে হয় না। বুধোদা, নিজে ডাক্তার না হলেও ডাক্তারের ছেলে। বাবার ডিস্পেনসারীতে বসে বসেই ও অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। আরে, কতলোক তো ওর হাত থেকেই ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেলো, তা তোর তো সামান্য একটা আঁচিল ছোস—হ্যাঁ! বড় হলে দেখবি, বুধোদা কী নাম-করা ডাক্তার হয়!"

বুধোদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পেনুর এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী ঘেনুদের মনে তেমন একটা আশা হয়। সে ভাবে, হয়তো কিছু হতে পারে এর, কিন্তু-কিন্তু করে জিজ্ঞেস করে "হ্যাঁরে, তোর বুধোদা শেষে এমন ওষুধ দিয়ে বসবে না তো যে, আমার কপালসুদ্ধু পুড়ে মরবে?"

"ওরে ঘেনো, তুইও যেমন বুধোকে বুঝিস। তোকে তো ও ওর দাদা-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তার ভাবোই হবে তোর। বিনি-পয়সায় একটা বড় ডাক্তার দেখাতে পারবি।" পেনু বুঝিয়েছে থাকে ঘেনুকে, "আজে থাকতেই দাদাডাক্তার কেন? বুধোদার বাবা আমাকেও কোনো।"

ঘেনু ভেবে দেখলে, পেনুর কথাটা ঠিক। তেমন একটা কিছু হলে বুধো ডাক্তারের

দাদা-ডাক্তার তো রয়েইছে হাতে। কুছ্-পরোয়া নেই, ঘেনু দেখাবে পেনুর বুধোবদ্যিকে তার আঁচিলটা।

দিন-ক্ষণ দেখে ঘেনুকে নিয়ে পেনু হাজির হলো তার বুধোদার কাছে। বুধোদা তখন তার ঘরে বসে মোটা একটা ডাক্তারী বইয়ের ছবি দেখছিল। পেনুকে দেখে সে বেশ খুশি হয়ে উঠলো। চেয়ার-খানা দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "আরে, তোকেই খুঁজছিলাম পেনো। এই বইটা দেখেছিস না? এর মধ্যে মানুষের চেনা হাত-পায়ের সব ছবি আছে, বুঝলি? এর মোটাকতক আমাকে এঁকে দিতে হবে।"

পেনু চালাক ছেলে। বেশী বাজে কথা না বলে সে কাজের কথা পাড়লে। "ছবি হবেখন। তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে বুধোদা। ঘেনুকে নিয়ে এলুম তোমার কাছে। ওর বড় অসুখ।"

বুধোদার [illegible] দেয়ালে ঝোলানো কঙ্কালের ছবি, বইয়ের ভাকে লাল, নীল গুহ্যদের লিখিয়া ও আরও সব টুকিটাকি দেখে ঘেনুর মনে হলো, বুধোদা বয়সে তার চেয়ে তেমন বড় না হলেও ভবিষ্যতে বড় হবার উপযুক্ত বটে।

ঘোলাটে কথা শুনে বুধোদা হাত পুটিয়ে ঘেনুকে বললে, "বসো ওই চেয়ারে। কী অসুখ? পেটের ব্যথা গাঁচোড়-পাঁচোড় করে, না পাতলা হোলে ঘোর বুজরু যায়?"

ঘেনুকে অসুখের বিবরণ নিজে কিছু বলতে হলো না। পেনুই গড়গড় করে সব বলে গেলো।

বুধোদা ঘেনুর আঁচিলটা খুঁটিয়ে টেনে টেনে দেখলে, তারপর কপালে দুবার চোকা মেরে বললে, "কিছু ভাবিস না।"

ঘোনু ভরসোয়ের দুই ভিন বেরু ওরলে। কিন্তু পেনু বুধোদার ওপর ভরসা করায়, "হাঁ, ভরসা পাই।"

পেনু ও ঘেনু দুজনেই বুধোবদ্যির এতক্ষণ বুধোদার দেয়া পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব দেখছিল। বুধোদার মুখের ভাব দেখে একসঙ্গে বলে উঠলো, "কী হলো?"

বুধোদা ওদের কথা কানে করে বলে উঠলো, "তোদের কী বুঝিস তোরা? যার নাম ঘেনু-ঘেনু বিবর্ণিমা, বুধোদা কিনা তার নাম দিচ্ছে কী এসব আঁচিল?"

ঘেনু এই বড় ডাক্তারী শব্দের নাম শুনে ভেবা মেরে গেলো। সে সন্ত্রস্ত উত্তর দিলে "আজ্ঞে, ঘেনু চুল-উদ্যে সারিয়েছিলুম।"

বুধোদা বললে, "এ চুলের দোষ নয়। দেখছিস না, ঝিনুকের মতন গোল উঠেছে। এ সারজরীর কেস।"

ঘেনুর বিবর্ণিমা আরও বাড়তে উঠলো। সে ভাবলে, তাহলে কি শিব-জাতীয় কিছু নাকি রে বাবা! সে আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলে, "সারা মানে?"

বুধোদা জবাব দিলে "মানে, অপারেশন করতে হবে। ঘরভর্তানি এক মিনিটে সারিয়ে দেবো। কিন্তুসু টের পাবিনি। কুচ্ করে এমন কেটে দেবো যে, আঁচিলের আঁচটুকুও আর থাকবে না তোর কপালে।"

"এসাবে ভবে ঘোলুম, ঘবে ঘেলুম"

সিং-স্টিচের ব্যাপার নয় জেনে যেন্থ আশ্বস্ত হলো। অপারেশন থিয়েটারে যেতে হয়তো একটু লজ্জাই হতো। তবে ঘেন্নামতো কিছু, তা পাত্তা না।

বন্ধুর হিতৈষী বন্ধু, কয় কাজে আসে, তোষ কবি সেই কথা স্মরণ করে পেনু বলে উঠলো "কি রে ঘেন্নো! বলেছিলুম কিনা যে বুধোদার কাছে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কত বড় ডাক্তারের ছেলে বুধোদা! ডাক্তারি এসে আমার সঙ্গে!"

কাঠের চতুষ্কোণ টেবিলের ওপর তুলো ডাক্তার এবং ফিনাইটের শিশি সাজিয়ে রেখে হয়ে গেছে। টানা থেকে একটা লম্বা কাঁচি বের করে ফিনাইট দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে সে বলে উঠলো "এই যে পেনু! কাছে এসো। ভয় পেয়ো না। ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে ওপর দিকে।"

কাজে-ডাক্তার একটা ফিনাইট-ভেজানো তুলো ঘেন্নর ক্ষতস্থানের চারপাশে বুলোতে বুলোতে আদেশ করলো, "চোখ বোজো ঘেন্ন।"

ঘেন্ন সাহেব বন্ধুকের মত চোখ বুজে ফেললো। চোখ বুজে সে বুধো-ডাক্তারের সার্জারীর কালো দেখবার কিছু, সুযোগ প্যাকড্ না বটে, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছিল ঠিকই।

ঘেন্ন বেশ বুঝতে পারলো যে, একটা চিমটে যেন তার আঁচিলের গোড়াটা কষে চিমটে দিয়ে ধরেছে। মাথাটা তার কটকট্ করে উঠলো। চোখ খুলে প্রতিবাদ করবে কি না সে, একথা ভাবতে ভাবতেই কুট্ করে একটা শব্দ হলো। তারপরে ঘেন্নর গালের ওপর টপটপ করে কি একটা জলীয় পদার্থ গড়িয়ে পড়লো।

অন্ন চোখ খুলে দেখে যে, তার কপাল থেকে টপটপ্ রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বুধোদা চিন্তিত মুখে ঘনঘন তার কাটা জায়গাটা একবার মুছছে, আর একবার তুলো চেপে ধরছে। রক্ত কিছুতেই থামছে না। ঘেন্নর মুখটাও কেমন হাঁ হয়ে উঠছে। বুধোদার হাতে রক্তমাখা তুলোর পুঁটলি-পুঁটলো দেখে ঘেন্ন আতঙ্কিত সুরে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠলো, "আ, এত রক্ত!"

বুধোদা মুখটা কাঁচুমাচু করে জবাব দিলো, "এই একটু রক্তারক্তি হয়ে গেলো। একেবারে শেকড়সুদ্ধু তিলমে কিনা সাফ করে—এই দেখো!" বুধোদা হুংকার দিয়ে উঠলো, "হাত না আইডিওটা এখানে।"

বুধোদার হুংকারে, পেনো, ঘেন্নের মাথাটা ছেড়ে দিয়ে আইডিওনে সিনিটা নিয়ে এলো এবং কোথায় ঢালতে হবে বুঝতে না পেরে কাঁচিটি ঘেন্নর কাটা কপালে উপুড় করে দিলো।

ঘেন্ন সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে চিৎপাত মাছের মতন লাফিয়ে উঠলো এবং "উরে সারেব মরে গেলুম, মরে গেলুম!" বলে ঘরের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিলে।

বুধোদা ঘেন্নর কাণ্ড দেখে রাগে রক্ত-মাখা তুলোটা দিয়ে ধপাস করে তার মুখে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া কষিয়ে বলে উঠলো, "অ্যাবলাচন্দ্র! চালাতে জানলুম কোথায়, আর ঢালবি কোথায়? যার রোগী ধরে এনেছিস না সেখানেই ঢেলেছে দেখছি না! এই পায়না ইদিকে মর্।" বুধোদা ঘেন্নর দিকে তুলো আর কিনিসপত্তর সরাতে লাগলো।

বুধো-ডাক্তারের হাতে ঘেন্নর [redacted] মোটেই আত্মসমর্পণ [redacted] ইচ্ছে ছিল না। বুধোদাকে ধোঁয়া অস্ত্রে দেখেই সে "ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!" বলে বুধোদাদের অপারেশন-রুমের দৌড় দিলে।

বুধো-ডাক্তারের রক্তমাখা মুখ দেখে এবং ঘেন্নর ক্ষতস্থান দেখে পেনুকে কেমন বেশ ঘাবড়ে যেতে দেখেছিল। সে-ও ঘেন্নর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলে, "কেসে-কেসাই! শিগ্‌গির আসুন—বুধোদা সারজারী করে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দিলে—শিগ্‌গির আসুন! সারজারী দেখে যান!"

বুধোদার কাকা মোটা মানুষ। রুগী দেখে

"ডাক্তারবাবু, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

অবেলায় বাড়ি ফিরে তিনি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘেন্নদের চেঁচামেচিতে ঘুমন্ত চোখে "কে রা—কে রা?" করে ওর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং সামনে রক্তমাখা ও টিংচার আইডিওনাক্রান্ত ঘেন্নকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েই হুঙ্কার শুরু করলেন, "এ্যাঁ, ষাঁড়ে গুঁতিয়েছে—এমনি করে?—দেখি কোথা? এ্যাঁ, মাথায়? ও মাথায় গুঁতুলে কেন? ষাঁড়ের সঙ্গে চুপোচুপি করছিলি বুঝি? কী বাঁড়?—পোষা না ক্ষ্যাপা?"

পেনু যত বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ষাঁড় নয়—এটা সারজারী! ডাক্তারবাবু, তবুই বলে ওঠেন "এ্যাঁ! ষাঁড়ের সঙ্গে জারিজুরি—তবুই করেছে বুধো? তার গায়ে কি জোর আছে জা, সে গেছে ষাঁড়ের সঙ্গে গা-জুয়ারী ফলাতে?"

পেনু ঘেন্ন হয় দেখে, ঘেন্ন নিজেই এগিয়ে এলো। এবং ডাক্তারবাবুর গলার ওপর এক পর্দা গলা চড়িয়ে শুরু করলে। "ডাক্তারবাবু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

"রক্ত বন্ধ চবে কী করে?" ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "ষাঁড়ের গুঁতোর জোর তো কম নয়! যেমন হয়েছো তোমরা!"

"আজ্ঞে, এটা গুঁতোবার কেস নয় ডাক্তারবাবু!" ঘেন্ন কপাল থেকে রক্ত মুছে বলতে থাকে, "আঁচিল-কাটা কেস। আমার আঁচিলটা বুধোদা অপ্তর করে দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবুর কাছে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি গর্জে ওঠেন, "এ্যাঁ, বুধো হাঁকি করে তোমার আঁচিল কেটেছে? তোমার ওপর সার্জারী ফলিয়েছে? বাবু ডাক্তার হয়েছেন! কোথায় গেলো সেই ষাঁড়টা? বলো, তোমার বন্ধুপড়া আগে বন্ধ করি, তারপর বের করছি আমি বুধো-ডাক্তারের ষাঁড়িজারী! পেনো, তোল ডিসপেন-সারী ঘর। নিয়ে আয় চাবি।"

পুষি আর বুধো

॥ গোবিন্দপ্রসাদ বসু ॥

পুষি : মিয়াও, ম্যাও, মাঁও...
দুধ-মাছ-ভাত আমায় খেতে দাও,
তাই তবে খাইলে -আমি পুষি!

বাঘা : ঘেউ, ঘেউ-উ, ঘেউ...
একমুঠো ভাত আমায় দিলে কেউ,
আমি বাঘা তাহলেই হবো খুশি!

পুষি : ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা, টিকটিকি
একবারটি সামনে আসুক দিকি;
কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব ঠিক!

বাঘা : চোর কি ডাকাত আসুক আমার কাছে
পাড়া তবেরে কত আছে!
টুঁটি ওদের আনবো টেনে ঠিক!

পুষি : ছোট্ট বলি আমায় কেলে করে
সবাই দিন একলা ঘরে থাকে।

বাঘা : সন্ধ্যে-দিনের দুপুরে দুটিবেলা
আমার সাথে বুলটু করে খেলা।

পুষি : বলছ যে কে কাকাতুয়া?
ওরে,—ওদেরে দেখি নুমি!

বাঘা : বাজছে কে বাঁশি
কই—ছুটে দেখে আসি!

কে নেবে ভার ?

অমিতা চৌধুরানী

(গুরু আশ্রমগৃহে বসে বসে ভাবছেন, তাঁর গুরুর পর কে নেবে আশ্রম পরিচালনার ভার। এমন সময় এক শিষ্য প্রবেশ করলো)

শিষ্য—ভাবছেন কী গুরুদেব!
কী ঘটেছে কোথা, আদেশ করুন,
জানিয়ে দেব সবাইকে সে কথা।
পূজোপাঠে, নাম-কীর্তন,
বাসনা যা থাকে; বলুন আমাকে।

গুরু—বয়স হলো বড় হলাম
এবার ছুটি চাই।
কাকে দেব আশ্রম-ভার
ভাবছি বসে তাই।
কাহার মনের বাসনা যা
প্রচার করো আজ
পরখ করে দেখবো আগে
পরে দেব কাজ।
কিংবা যে কেউ বড় হবে
স্বভাব গুণে জানে
তারেই দেব আশ্রম-ভার
পরম সম্মানে।

(শিষ্যের প্রস্থান)

প্রথম পুথীর প্রবেশ। (মিটিমিটি ভঙ্গিতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল)

গুরু—কী পরিচয় তোমার বাছা?

পুথী—আমি বড়লোকের ছেলে,
মণ্ডামিঠাই সে-সন্দেশ
খাই যে কিলে পেলে।
বেড়াই হেসে খেলে।

গুরু—বেশ, বেশ! বিদ্যা কতদূর?

পুথী—বিদ্যা? বিদ্যা অনেকদূর!
ভাবনা নাই কিছু।
ছোটা চারেক পণ্ডিত
ঘোরে রোজই আমার পিছু।
খুব বেশী নয় বয়স দু-তিন
পাঠ করেছি শুরু,
কিন্তু তবু পাইনি আজও
মনের মতো গুরু।
প্রবেশিকা সামান্য সে কথা
অক্লারণে হারাইনি আর মাথা।
পরীক্ষা তো দিতে পারি,
যখন-খুশি হলে
কারণ, আমি বড়লোকের ছেলে।

গুরু—বটেইতো! বটেইতো!
বয়স হলো কত?

পুথী—আজ্ঞে! বয়স আমার?
তা বেশী নয়—উনিশ বছর
ভরে নাড়া, নাড়ে নাড়া
তাইতে মাইরে নাই।
বাসেন্ট্রী ঢাকেন্ট্রী
দিলুম্ তুকা খালাস
কেওড়া কেওড়া তলে
আমি পাকা নামবাজ।
সেন্সাসেও পাবি অবধা
যদি করতে চাস
সুমধুর নাম-গানে
খুশি হয় ভগবান।

(বিকৃত কণ্ঠে গলা ভাঙ্গা গুরু করলো গুরু বাক্য যাহা দিবেন)

গুরু—থাক্ থাক্ বাছা।
মূর্খ কেন কও,
আগে দেখি ছেলে
সমঝদারও খবর পেলে
পরে কাজ দেবে।

(হতাশ ভঙ্গিতে সকলের সঙ্গে সেও নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ পুথীর প্রবেশ

(ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়, মুখময় নিষ্প্রভ কালিমা)

গুরু—কে তুমি সুকুমার
পরিচয় কী তোমার?

পুথী—দরিদ্রের ছেলে আমি
দিনভর করি কাজ—
জলে ভিজি—রোদে পুড়ি
ছোট কাজে নাহি লাজ।
রাতে পড়ি পাঠশালে
লিখি, শিখি, পড়ি,
চাষ করি, ভাঁট বুনি
হাতের শিল্প গড়ি।
ঘরে বৃদ্ধ বাপ-মা
ছোট ভাই বোন
ঘুচাতে পারি না একা
দুঃখ অনটন।

(গুরু আসন ত্যাগ করে উঠে আশীর্বাদ করলেন, আর সব পুথীরা ছেলে প্রস্থান করল)

(সমাপ্ত)

রাজার দো শিং

রবীন্দ্র সরকার

আয়নাতে নিজের মুখোমুখি গিয়ে রাজা হঠাৎ দেখলেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে।

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। তাই তো মাথায় দুটি শিং নিয়ে তিনি কী করে লোকের সামনে বেরোবেন। হায়ে যে দুঃখে দুঃখো করবে। এখন কী উপায়!

দুশ্চিন্তায় রাজার চোখে ঘুম নেই। আহারে রুচি নেই। কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না। সব সময় মুখ ভার করে বসে থাকেন। সামান্য কথা নিয়ে রানীর সঙ্গে খিটিমিটি লেগে যায়। মন্ত্রী কোন কাজের কথা বলতে এলে বলেন, "পরে হবে, এখন আমার সময় নেই।" প্রজারা কোন অভিযোগ জানাতে এলে খবর পাঠিয়ে দেন—"আজ সভা হবে না। শরীর ভালো নেই।"

সবাই অবাক। তাই তো! আমাদের রাজা মশাই তো এমন ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর কী হলো! সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। রাজাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না।

রাজাও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। ভরসা করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। আয়নার সামনে গেলে দুঃখে চুল আঁচড়ান। চুল দিয়ে ঢেকে দুটি শিং ঢেকে রাখেন। কিন্তু ভয় যায় না। শিং দুটো এখন অবশ্য ছোট আছে। কিন্তু বড় হবে তখন তো আর চুল দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। কী সর্বনাশ হলো। ভগবান কেন তাকে এই শাস্তি দিলেন। রাজা কাঁদি কেঁদেই ফেলেন।

রাজার কপালের জোরে শিং দুটি আর বড় হলো না। বড় বড় চুল দিয়ে তিনি তা কোন রকমে ঢেকে রাখলেন। ধীরে ধীরে মনের জোরও অনেকটা ফিরল। এখন দু-এক জনের সঙ্গে কথাও বলেন। সভাতে গিয়েও মাঝে মাঝে বসেন। প্রজাদের নালিশ শোনেন। মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য শাসনের কথা বলেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু রাজা হাঁফ ছাড়তে পারলেন না। ভাবলেন—আর কেউ দেখতে না পেলেও নাপিত তো একদিন দেখবেই। বাবরি চুল তো রাখা যাবে না। চুল কাটাতেই হবে। রাজা আবার ভাবনায় পড়লেন। তাইতো, কী করা যায়।

অনেক ভেবে একদিন তিনি নাপিতকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কাছে কানে বললেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে। শিং দুটি তিনি নাপিতকে দেখালেন। পরে বললেন, "তুমি আজই যাবে, চুল কাটবে। কিন্তু খবরদার, আমার শিং গজানোর কথা যদি তুমি কাউকে বলো, তবে তোমার আর আস্ত রাখব না। মনে থাকে যেন।"

নাপিত দুই হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না মহারাজ, একথা আমি কাউকে বলব না। মহারাজের শিং, এমন আমি বলতে পারি।"

রাজা খুশি হলেন। নাপিত চুল কেটে চলে গেল।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে নাপিতের অবস্থা কাহিল। রাজার শিং গজিয়েছে এমন কথাটা কাউকে বলতে না পেয়ে সে ছটফট করে মরছে। কিন্তু উপায় কী। রাজার কানে কথাটা গেলে তার প্রাণ যাবে। কিন্তু এদিকেও যে তার প্রাণ যাবার জো হয়েছে। কথাটা বলতে না পেরে নাপিতের পেট ফুলে ঢাক।

এমন চার দিন এমনি করেই কাটল। নাপিতেরও রাজার অবস্থা। চোখে ঘুম নেই, খাওয়ায় রুচি নেই। কথা বলতে ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। নাপিত পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাউকে দেখতে পেলেই ভাবে, "বলে ফেলি, শোন। একটা ভারি মজার খবর।" কিন্তু তার বলা হয় না। রাজার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সবাই ভাবে নাপিত বেটা পাগল হয়ে গেছে।

নাপিত আর সামলাতে না। একদিন চলে গেল গহীন এক জঙ্গলে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গেল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে জনমানবের কেউ নেই। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। নাপিত তখন একটা বড়গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "রাজার, রাজার, ভারি মজার কথা শোন। রাজার দুটি শিং গজিয়েছে।"

কিন্তু কে শুনবে মজার কথাটা। একটা মানুষও সেখানে নেই। আছে শুধু গাছ-পালা। কিন্তু তাতেই নাপিতের আরাম। মনের কথাটা তবু তো বলতে পেরেছে। অনেকটা হাল্কা হয়ে নাপিত বাড়ি ফিরে এল।

নাপিতের একথা কেউ জানে না। রাজার শিং-এর খবরও কেউ জানল না। নাপিত বাঁচল। রাজারও চিন্তা দূর হলো।

কিন্তু একদিন হঠাৎ রাজার শিং-এর [redacted] ফাঁস হয়ে গেল। নাপিতের মজার কথাটা সবাই জেনে ফেলল। কী করে জানল সেটা আরও মজার কথা। সেইটেই বলছি।

সেদিন রাজার বাড়িতে কী একটা উৎসব। আশে পাশের দশ গাঁ ভেঙে লোক এসেছে রাজার বাড়িতে। রাজার বাড়ির উৎসব। ফুলের মালা, নিশান, কত রং বেরং-এর আলো। বাইরে নহবতের পালাই বাজছে। বাড়ির উঠানে ঢাকিরা নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে। হঠাৎ সবাই শুনল একটা ঢাক বারবার বলছে—

রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং
কিস্‌নে কহা, কিস্‌নে কহা?
বাম্বনমে হাজামনে কহা
রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং।

হঠাৎ শুনে সবার মনে সন্দেহ হলো, তারা ভুল শুনছেন না তো? রাজার শিং, এ-ও কি সম্ভব। রাজার শিং আছে, একথা কে বলেছে? তাঁরা নিজেকে প্রশ্ন করেন। আর ঢাকের থেকে জবাব চেয়ে ঢাক—

বাম্বনমে হাজামনে কহা
বাম্বনমে হাজামনে কহা
রাজা কা দো শিং

রাজার শিং-এর কথা আর গোপন রইল না। যে নাপিতে রাজার চুল ছাঁটত তার নাম বাম্বন। বাম্বন নাপিত যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, "রাজা কা দো শিং"—সেই গাছটা একদিন কাঠুরেরা কেটে নিয়ে আসে বাজারে বিক্রি করতে। কোন এক ঢাকী সেই গাছের ডাল দিয়ে ঢাকের কাঠি তৈরি করে। কোন মানুষ নাপিতের কথাটা জেনেছিল। কিন্তু সেই গাছটা জেনেছিল। তাই তার ডাল একদিন ঢাকের কাঠি হয়ে শিং-এর কথাটা ফাঁস করে দিল।

সেই শিংওলা রাজা নেই। বাম্বন নাপিতও নেই। কিন্তু, রাজার শিং আর নাপিতের গল্পটা ঢাকের বোল হয়ে এখনও বাজছে। তারতের উত্তর প্রদেশের কোন গাঁয়ে গিয়ে যে-কোন একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে ঢাকের বোল বলে দেবে—

রাজা কা দো শিং
কিস্‌নে কহা, কিস্‌নে কহা
বাম্বনমে হাজামনে কহা।

বাংলা দেশের ছেলেরা অবশ্য ঢাকের বোল অন্যরকম করে বলে। তারা বলে—ঢাক্ গুড়া গুম গুম, ঢাক গুড়া গুম গুম, গুড়ুম, গুড়ুম্।

নাপিতের পেট ফুলে ঢাক

গদাইচরণ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আজব দেশের মহারাজা, বেজায় তিনি খেয়ালী,
কখন কি তাঁর মরজি হবে সবার কাছেই হেঁয়ালি।

কখনো বা দিলদরিয়া, দরাজ হাতে বরদান,
কখনো বা বেজায় রেগে করেন দাবী গদান।
একটি ব্যাঙ আছে শুধু, সে তাঁর প্রিয় ভৃত্য—
গদাইচরণ; দুই বেলা তাঁর বাড়ে পা টেপে নিত্য।

তারই প্রতি উদয় এবং সদয় তিনি সদাই,
যখন তখন ডাকেন, "ওরে, কোথায় গেলি গদাই?"
অনেক গল্প বলে গদাই, যায় না তাদের গোনা,
কতক গল্প বানানো তার, কতক গল্প শোনা;

গল্প শুনে মহারাজা কাঁদেন এবং হাসেন।
কখনো বা কায়দা করে হাঁচির [redacted] কষেন।
গাদা গেয়েও সোনায় গদাই, সেই কোনো তার জানা,
নাই বা থাকুক সুরের বালাই, হোক না সে তালকানা;

শোনায় বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, ভজন,
টপ্পা, গজল, ঠুংরি, ধ্রুপদ শোনায় ওজন দরজন;
ফৈলটে কি গান মহারাজা অত কি ছাই জানেন?
গদাই যে-গান যা-বলে গায় তাই বলেই মানেন।

বলেন, "আহা, গদাইচরণ হাঁদারে টুকরো ছেলে
বিশ্বভুবন ঘুরলে পরেও তার কি জুড়ি মেলে?
চলতী গেলে মিলবে আবার যখন তখন গদাই,
কিন্তু আহা, গদাই গেলে মিলবে না আর গদাই।"

পাঁচ মিনিটের গিন্নী

শ্রীবেণু গাঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ মিনিটের গিন্নী হয়ে বসল ইন্দ্রা রান্নাঘরে।
সরষে বাটা বেটুক ছিল ঢেলল সেটা মুগের ডালে।
মা বসেছেন ঠাকুর-পুজোয় গিন্নীপনা করছে খুকু।
শুনবে নাকি, বলব খুলে, কেমন মজার ধাপ্পাবাজি।
এক ঘটি জল সবটা দিলে ডালের হাঁড়ির মুখে ঢেলে।
পেয়ে খানেক লবণ দিলে হাঁড়ির ভেতর সবটা ঢেলে।
টিনের ভেতর হলুদ গুঁড়ো ছিল যত সবগুলো দেয়।
ছয় পয়সার চুপি চুপি মুঠো খানেক হেডপাতা নেয়।
হেডপাতা আর গোলমরিচ দিশ্বিদিক দিল ডালের গর্ভে।
ডালের হাঁড়ির মধ্যে খুকুর খুন্তি কাঠির বাজনা বাজে।
শেষকালেতে উনুন থেকে ডালের হাঁড়ি তুলতে গিয়ে
উল্টে পড়ে খুকুমণি মেঝের উপর হাড়মাড়িয়ে।
ভাঙল হাঁড়ি, গরম ডালে পুড়ল খুকুর হাত দু'খানি।
গড়াগড়ি দিয়ে খুকু সারাটি দিন কাঁদল জানি।

একটি অদ্ভুত ম্যাজিক

জাদুকর পি. সরকার

উপরেই পড়ে রইলো। খুঁজে খুঁজে একটা স্লেট এনে হাজির করলাম। এই স্লেটের উপরে গুটোনো স্লিপগুলো রেখে ওদের একজনকে বললাম, যে কোনও একটি স্লিপ তুলে নেবার জন্য। শেখ গামাল তুলে নিলেন একটি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আমি পুড়িয়ে [redacted] বাকি স্লিপগুলো—ছাই হয়ে গেল তা। এবার ঐ ছাই একটু তুলে নিয়ে বাঁ হাতের কব্জির একটু উপরের দিকে ভেতরের পিঠে ঘষে নিলাম আস্তে আস্তে। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, কব্জির উপরে লেখা ফুটে উঠেছে—'ব্রেজিল'। শেখ গামাল স্লিপটা খুললেন আমার অনুরোধে।

সবাই দেখে অবাক হলেন যে, ঐ স্লিপটার ভেতরেও লেখা আছে 'ব্রেজিল' কথাটা।

এখন শোনা, কেমন করে এই মজার ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলাম।

করেছিলাম কি জানো? চারজনে চার দেশের নাম বলতে কী হবে। লেখার সময়ে আমি কিন্তু প্রত্যেকটি স্লিপেই লিখেছিলাম 'ব্রেজিল' কথাটা। এর পরে বাথরুমে গিয়ে পাত্র খোঁজার অজিলায় হাতের উপরে ঘষে মুখ সাবানের কুচি ঘষে ব্রেজিল লিখেছিলাম। চারটি স্লিপেই লেখা ছিল ব্রেজিল। কাজেই যে স্লিপই তোলা হক না কেন, হাতে ব্রেজিল লেখা স্লিপ আসবেই আসবে।

বাকী তিনটে স্লিপে আগুন লাগানোর পর ঘরে যায় ছাই। কারসাজির আর কোন প্রমাণই অবশিষ্ট থাকে না। হাতটা যখন সবার সামনে এগিয়ে দেওয়া যায়, তখন তাতে কোনও লেখার চিহ্নই থাকে না। কারণ, সাবানের ফেনা দেখা যায় না এমনি-ভাবে। এই সাবানের ফেনার উপরে ছাই ঘষে দিলে সাবানের আঠালো ভাবের জন্য ছাই-গুলো তাতে আটকে গিয়ে কালো লেখার সৃষ্টি হয়।

ভালো করে অভ্যাস করে নিয়ে যদি এ খেলা দেখাও, তবে খুব বাহবা পাবে দর্শকদের কাছ থেকে।

টাকার খেলা

মনোজিৎ বসু

গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন সাধু-মহারাজ। ধুনি জ্বেলে উঠলো বটগাছের নীচে।

সাধু-মহারাজ রাত শেষ হতে-না-হতেই ঘুম থেকে ওঠেন, গঙ্গায় স্নান সেরে পুজোয় বসেন। পুজো শেষ হলে বসেন ধ্যানে। সেই ধ্যান ভাঙে ঠিক দুপুরে, সূর্য যখন মাথার ওপরে। তারপর চলে হাল্কা গঙ্গার তীর ধরে—কখনও এক ক্রোশ, কখনও দু-ক্রোশ। সঙ্গে থাকে ছয়-শিষ্য ব্রহ্মচারী সাধু-মহারাজের সঙ্গে গল্পও দিব্যি সে-ও চলে ছোটে। বনে বনে ঘুরে, ফল-মূল সংগ্রহ করে গুরু-শিষ্য যখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসেন—সূর্য তখন পশ্চিমে নামে। সারা দিনরাতে সেই একবার মাত্র ফলাহার। অথচ, দুজনার স্বাস্থ্যের কি বাহার! সাধু-মহারাজের বয়স তো বেশ কিছু বটের ওপর —কিন্তু, চেহারা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে, শরীরে পাক ধরেনি কোথাও। যেমন উঁচু-লম্বা, স্বাস্থ্যবান তিনি, গায়ের রঙও তেমনি টলটলে ফর্সা। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়, জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কণ্ঠস্বরও গুরু-গম্ভীর।

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আবার ধ্যানে বসেন বৃদ্ধ সাধু। পাশে বসে ধুনির আগুনে ঠিক-ভাবে জ্বাল দিয়ে রাখে শিষ্য মধু। গঙ্গা থেকে ঘড়া ভর্তি করে জল তুলে আনে। কাঠকুটো লতা-পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে। তারপর, সেও বসে পুজো-আচ্চায়। দুপুরে রাতে বালির ওপরে খড় বিছিয়ে ঘুমোন গুরু-শিষ্য। ধুনির আগুনটা কিন্তু ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে সারা রাত ধরেই। সেদিকে তাকিয়ে বোধ করি আকাশের তারা-গুলোও অবাক হয়ে যায়। শরৎকালের নির্মেঘ আকাশের নীচে, বটগাছের তলায়—গম্ভীর নিস্তব্ধ মন হয় সাধুবাবা আর তাঁর শিষ্য নিদ্রা কোথায়, তাঁরা যেন তখনও ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মহারা।

দু-চার দিন যেতে-না-যেতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামে। খবর রটে মুখে মুখে—হিমালয়ে বারো বছর তপস্যার পর কৈবল্য এক সাধুবাবা গঙ্গার তীরে ফুলডুংরীহাটে এসে আস্তানা গেড়েছেন। মানুষের চেহারা দেখেই তিনি তার ভূত-ভবিষ্যৎ সব নিখুঁত-ভাবে বলে দেন, হরা-মন্তরও মাকি তাঁর মন্ত্রঃপূত জল পেয়ে বেঁচে ওঠে! ফলে, গাঁয়ের লোক দল বেঁধে ছোটে সেই-দিকে। ছেলে-বুড়ো, জোয়ান-মদ্দ, মেয়ে-ছেলে কেউ বাদ যায় না। বটগাছের তলায় যেন হাট বসে—সকাল থেকে সন্ধে।

কেউ বলে—বাবা হাকটা একবার দেখুন। কেউ বলে,—একটা বেকড়-টেকড় দিন সাধুজী, ঘরে ছেলেটা মরমর। কেউ বলে,—কি করলে টাকা ডবল করা যায় সেই মন্ত্রটা একবার বাতলে দিন মহারাজ, আমি আপনার কেনা-গোলাম হয়ে থাকব। সাধু-মহারাজ শুনে হাসেন, আর বলেন—ভগবানকে ডাকো, তিনিই সর্বদিক্‌ রক্ষে করেন। বলেই আবার ধ্যানে বসেন। লোকজনেরা বলাবলি করে—সাধু না-হলে সাধুবাবা সঠিক কিছু বলবেন না। ভক্তি দেখাতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে—তবেই না অমন দৈবজ্ঞ শক্তির কৃপা মিলবে।

সেই থেকে, যার আসে তার কেউ আনে ঘড়া ঘড় দুধ, সুক্তি ঝুড়ি ফলমূল খালা খালা মণ্ডা-মেঠাই। সাধুবাবার জন্যে কেউ কেউ আবার পেল্লাদী অনে যায় যেমন সাধ্যি। শিষ্য মাধব বাধা দিলেও লোনে না কেউ। সাধু-মহারাজ আপত্তি করলেও, নিজেদের জিনিস-পত্র কেউই ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। শেষে—ভক্তের মন কি ভগবান ফিরিয়ে দেন কখনো? আমরা সড় গরিব, যতটুকু সাধ্যি তাই আপনার সেবায় দিচ্ছি। আমাদের অপরাধ নেবেন না, তোহাই মহারাজ! সাধুবাবা অত কি করেন? কেউ মনে দুঃখ পায় সেটা তিনি চান না। ভক্তের দান হাসিমুখেই গ্রহণ করেন। ভগবানকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ বিলিয়ে দেন সবাইকে।

খবরটা ক্রমশ গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে গিয়ে পৌঁছায়। শহরের মানুষও এসে ভিড় করে গঙ্গার ধারে। সাধারণ মানুষ যেমন আসে, তেমনি আসে বড় মানুষের দল। সাধুবাবার পায়ের নীচে গড় করে সবাই; সিকি-দোয়ানির বদলে এখন থেকে মুঠো মুঠো রুপোর টাকা ছড়িয়ে পড়ে। কৈবল্য বাবার কৃপা আর কে না চায়?

সাধুবাবা ক্রমশই বড় চিন্তায় পড়েন।

"সে কী কথা বলছেন বাবা?"

তাঁর সামনে ভজনের ব্যাঘাত ঘটে, ধ্যান-তপস্যা করা হয় দুঃসাধ্য। জনহীন গঙ্গার তীরে সকাল থেকে সন্ধে ওম-ভোকালে মুখর। ভূত-ভবিষ্যতের সঠিক হদিস দিতে চাইলেও, কেউ যেন সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরতে চায় না। তারা চায়, কিসে বেশী টাকাকড়ি মিলবে, কী করলে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে। ধনীরাও অনুরোধ করে মন্ত্রঃপূত ভিজে-না-কিছু একটা দিতে—যাতে জলে তারা আরও অনেক টাকা পাবে, বড়লোক থেকে অবশ্য বড়লোক হবে। টাকা, টাকা, টাকা—সবাই চায় টাকার সন্ধান!

সন্ধ্যের পর, লোকেরা যখন বিদায় নিয়ে চলে যায়, সাধু-মহারাজ তখন শিষ্যকে ডেকে বলেন, "বল্‌ বেটা, এখন আমরা কী করি? এমন হলে তো আর এখানে থাকা যায় না। পুজো-আচ্চা, ধ্যান-তপস্যা সব যে বন্ধ হবার জোগাড়! তার চেয়ে চল এখানকার আস্তানা উঠিয়ে এই বনে, লোকজন থেকে দূরে। লোকজনদের ভেতর আর কথা বলে তাড়াতে পারি না। ওরা আমার কথার আঘাত পায়, সেটাও আমি চাই না।"

শিষ্য বলে, "সে কি কথা বলছেন বাবা? লোকের ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব? তার চেয়ে এক কাজ করুন। বড়লোকেরা যখন আসবে তখন তাদের কাছ থেকে নারায়ণের সেবায় বেশী করে টাকা চেয়ে নিন। আর, সেই টাকা গরিবদের দিন যায়। দেখুন, কদিন বাদেই এ জায়গা আবার আগেকার মতো ফাঁকা হয়ে ওঠে কিনা!"

শিষ্যের কথায় খুশি হয়ে গুরু বললেন, "সাবাস্‌ বেটা, তোর বুদ্ধি আছে।"

পরদিন থেকে শুরু হলো। বড়লোকদের কাছ থেকে রাশি রাশি টাকা চেয়ে নেন সাধুবাবা। পরে আবার সেই টাকাই গরিব লোকদের বার দিতে শুরু করেন। বলেন, "পরের টাকা—এমনি তো আর ফিরিয়ে দিতে পারি না! এখন তোমরা নিয়ে যাও, সুদিনে হলেই শোধ দিয়ে দেও। তোমাদের মুখে সুখে হোক।"

কদিন যেতে-না-যেতেই গঙ্গার ধার আবার আগেকার মতো ফাঁকা। সাধুবাবাকে মোটা টাকা প্রণামী দিতে হবে ভেবে বড়লোকেরা আর সেদিকে যায় না, আর যাদের টাকা শোধ দিতে হবে মনে হচ্ছেই গরিবেরা আর সেদিকে পা বাড়ায় না।

শিষ্যের মুখে হাসি ফোটে।

সাধুবাবাও হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। যারা সত্যিকারের কষ্ট যেমন দু-চারজন লোক আসতো তাদেরও সাধুবাবার কোনো অসুবিধা হয় না তাতে। বরং, খুশিই হন তাদের সত্যিকারের ভক্তি দেখে। আবার পুজো-আচ্চা চলে নিয়ম মতো, ধ্যান-তপস্যাও হয় বিনা বাধায়।

ফাঁকুসে গাছপালা

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের উপকারে লাগে, এই কথাই তো আমরা শুনে আসছি। আমাদের দেশে নানান্ ধরনের গাছ আছে। প্রায় প্রত্যেক গাছই কিছু না কিছু আমাদের উপকারে লাগে। কিন্তু গাছ মানুষের ক্ষতি করে—এটা শুনতে কেমন লাগে? পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব বিচিত্র গাছ আছে, যাদের অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা। কেউ বা দেখতে অক্টোপাসের মতো, কেউ বেতালের মতো, কারও পাতা ছড়ির মতো লম্বা।

নানান্ জায়গায় গাছ নিয়ে নানান্ রকমের গল্প আছে। শোনা যায়, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এমন সব গাছ আছে, যাদের ডাল-পালাগুলো পশুর খাবার মত, আর তার ডগায় লম্বা লম্বা খোঁচাওয়ালা কাঁটা। কোনও পথিক হরদম ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, অমনি দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গাছের কাছে এসে পড়ল, গাছটা তার থাবা দিয়ে পথিকটিকে চারদিক থেকে এমন করে কাঁড়িয়ে ফেললো যে, কাঁটা ছাড়িয়ে সে আর বেরোবার পথ পেল না।

'ফুস' করে' বা কালোছেলে গাছ

তারপরও কিছু গাছ আছে অস্ট্রেলিয়ায়, যাদের প্রথমে দেখলেই মনে হবে ফাঁকুসে গাছ। কিন্তু সত্যি সত্যিই তারা কোন ক্ষতি করে না। এই গাছ-গুলোকেও কিন্তু ওই ধাবাওয়ালা গাছের দলে ফেলা হয়। কারণটা হলো, ঠিক সন্ধে হলেই এদের চেহারা যায় বদলে। সারাদিন বেশ ভাল ছেলের মত থাকে গাছগুলো, কিন্তু সন্ধে হলেই রূপ পালটে ফেলে। বিরাট লম্বা গুঁড়ি, গায়ের রং ফিকফিকে কালো, তার মাথায় গুপর এক-ঝাঁকড়া পাতা। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কালো ছেলে'। কোন পথিক বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যদি গাছটার কাছে এসে পড়ে, ভয়ে আতঙ্কে উঠবে গাছটাকে দেখে।

আমরা তো মাংস খাই, কিন্তু গাছ মাংস খায় এটা অদ্ভুত, না? কিন্তু মাদাগাস্কার অঞ্চলে এমন গাছও আছে। এই অঞ্চলের লোকেরা ওই গাছের নাম দিয়েছে মানুষ-খেকো গাছ। দেখতে বিরাট বড় একটা আনারসের মত, পাতা-গুলো চটচটে আঠালো। ছাড়ির

থাবা নয়!

... আছে আঁকা ছবিতে

* * *

মাছ, আর অসংখ্য। অক্টোপাসের মত তারা লাফিয়ে ওঠে। এই গাছগুলো মানুষ খায় বলে এখানকার শিশুরা ওদের পুজো করে। আমরা ঠাকুরের পুজো করে যেমন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকি, ওরা তেমনি মাঝে মাঝে এক-একটা মেয়েকে উৎসর্গ করে থাকে। গাছের কাছে মেয়ে টেনে নিয়ে আসে আর তৎক্ষণাৎ গাছটি তার ডালপালা দিয়ে প্রেমালিঙ্গনে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে যে, বাইরে থেকে তাকে আর দেখা যায় না। এক সপ্তাহ পরে গাছটার কাছে এলে দেখা যাবে, সেই মেয়েটির হাড়গুলি ছাড়া গায়ের সমস্ত মাংস গাছটা খেয়ে ফেলেছে। হাড়গুলো পড়ে আছে গাছের তলায়।

অস্ট্রেলিয়াতে আর এক রকমের গাছ আছে যাওবাব বা বোতল গাছ। খানিকটা দেখতে ঠিক বিরাট বড় একটা বোতলের মত। এই বোতলের মত পাঁজরা ভিতরে ভরা থাকে জল—সব ভর্তি করে রাখে। সময়মত একটু একটু করে খায়। এই গাছগুলোকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছ বলা হয়।

কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথওয়েলসে এক রকমের গাছ আছে, যাদের মানুষ ছুঁতে ভয় করে। এই গাছগুলো লম্বায় হয় প্রায় একশো ফুট আর গুঁড়িগুলো মোটা হয়

বাওবাব বা বোতল-গাছ

ফুট ছয়েক মত। পাতাগুলো খুব বড় বড়, পুরু, আর প্রায় বারো ইঞ্চির মতো লম্বা। সবচেয়ে মজা হলো, গাছগুলোর পাতার ওপরে অসংখ্য ছোঁয়া থাকে—যার মধ্যে ওরা সাংঘাতিক রকমের বিষ রেখে দেয় রক্ত করে। যে কিছু মানুষ বা কোন জন্তুর গায়ে লাগলে তারা মরে যায়।

গাড়ড়ু-গাধা

শ্রীগণেন্দ্র দত্ত

এক যে ছিলো বোকা-হাঁদা।
সবাই বলে, গাড়ড়ু-গাধা।
কাজকর্ম করবে সে ঠিক,
তাগাগেড়ু হিসেব সঠিক।
তবে কাজের ধরণ-ধারণ
নয়কো তেমন-আমার মতন।
শেষটাকে সে করবে আগে।
পুরুর কথা বললে রাগে।

ঘর তৈরি করতে হলে
সবার আগে ছাদটা ঢালে।
কারণ জানো? বিষ্টি পড়ে
দেয়ালে নয়, ঘরের চালে।

কোথাও যেতে সবার আগে
দরজা জোড়া জুতো নেবে।
রাত্রে যদি চোরটি আসে?
দরজা এঁটে বুঝতে হবে।

আরেকটি তার কাণ্ড আজব,—
তোমরা শুনে হাসবে জানি।
বেরোয় ছুড়ে পড়লে ছায়া,
ঘুমবে বসে দেয়ালখানা।

সবার সেরা তবুও তাহার
বলছি শোনো কাছে এসে :
সবাই যখন কাঁদে তখন
গাড়ড়ু-গাধা উঠবে হেসে।
আবার যখন সবাই হাসে,
হাসবে কেউ গা-মা-পা-ধা,
গাড়ড়ু তখন হাঁউ-মাউ-কাঁউ
উঠবে কেঁদে এমনি হাঁদা।

এই পাতার ডগাগুলো ছুঁচলো, যদি কোন-রকমে মানুষের গায়ে একবার ফুটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

আমাদের দেশে আলোকলতা বলে এক-রকমের লতানে গাছ আছে। যারা কোনও গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। হলুদ রংএর সরু-সরু পাতা। কুইন্সল্যান্ড-এ এই ধরনের গাছ আছে—যারা বীজ থেকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য ডালপালা নিয়ে জড়িয়ে ওঠে এবং সামনের কোনও গাছকে আশ্রয় করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই গাছটাকে মেরে ফেলে। তখন আবার তারা নতুন শিকারের সন্ধানে করে।

এই সব গাছ সত্যিই মানুষের ক্ষতি-কারক, কিন্তু তবুও অন্য সব গাছের মত এরা বছরের পর বছর নিজেদের আয়না পরিষ্কার করে বসে থাকে।

সম্বর্ধনা

॥ পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ন্যাড়া পরে নাকি যাবে বেলতলা
শিখতে কী এক কল।
ফেব্রুয়ারি ঘরেতে জল্পনা করে
গাঁয়ের ছেলের দল—
"বিদেশে গেলে বা ঘুরে এলো কেউ,
কিংবা চাকরী পেলে,
অথবা বয়েস পঞ্চাশ কাটি,
সত্তর হয়ে গেলে,
নয়তো ছোটের লড়াইয়েতে নেমে
কেউ যদি যায় জিতে
চাঁদা করে সভা ডেকে তাকে হয়
সম্বর্ধনা দিতে।"
হঠাৎ পল্টু—"হুররে তোরা,
নেই কিছুতেই সাড়।
বিলেত না যাক, পাক ছুটি মাস
হবে সে তো গ্রাম-ছাড়া।
যা করেই হোক, সম্বর্ধনা
দিতে হবে ন্যাড়াকেই।"
সেদিন বিকালে সমাওড়াতলার
তাই তারা সব জোটে।

পাড়ার সকলে জুটেছে সেখানে,
বিজ্ঞ গাঁয়েরও জন।
দেসো ময়রার খুড়তুতো ভাই
গাইলো উদ্বোধন।
কানাই মুদীর ছেলেমেয়ে ঘাঁচু
ন্যাড়াকে পরালে মালা।
পদ্যে পদ্যে তারপরে যত
লুচেছে হলো ঢালা।
প্রধান অতিথি পালাকোম দাস
বলেন ভাষণ শেষে—
"কাজ শিখে এসে যাবা নেড়ু, তুমি
বসবাস করো দেশে।"
সভাপতির অভিভাষণে বলেন
দোলগোবিন্দ মাজ—
"কারুকে উল্লুল আমাদের মুখ
কল শিখে ন্যাড়া পাল।
বেলতলা থেকে বিলেত আমেরিকা
ঘুরে আসতেও পারে।
আজকাল শুনি, হরে-নরে-বোষ্টমা
রোজ কত পাড়ি মারে।"
সভা শেষ হলো হাততালি দিয়ে,
'হুররে' হলো গান।
তারপর ন্যাড়া পালেরই ধরেছে
সকলের জলপান।

হাঁস মুরগীর লড়াই

প্রীকবিতোষ কুমার চন্দ

মুরগির লড়াই তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছ। কিন্তু আমি জোর করেই বলতে পারি, তোমাদের কেউই হাঁস-মুরগির লড়াই দেখনি। তোমাদের বাড়িতেই এই দুটো পাখির লড়াই লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? কী? —লাগিয়ে দেবে নাকি? তাহলে চটপট নীচের সব মতো জিনিস কটা যোগাড় করে ফেলো:—

(১) হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো ধরে এমন মাপের এক পিস্ পাতলা পিচবোর্ড। (২) সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া বেশ মোটা ও শক্ত পিচবোর্ডের দুটো লম্বা পিস্। ৪নং ছবিটা দেখো। (এই পিস্ দুটোর একটা পিঠ হাঁস কালো রং করতে পারো তবে ভালো হয়)। (৩) কাঁচি; (৪) ময়দার লেই বা গাঁদের আঠা। (৫) টোয়াইন বা মোটা যে কোনো সুতো। (৬) শিরীষ কাগজ। (৭) হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো যদি রং করতে চাও, তবে তোমার পছন্দ মতো জল-রং বা তুলি।

প্রথমেই বই থেকে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো কাঁচি দিয়ে চৌকো করে কেটে নিয়ে এ দুটোর জন্যে নির্দিষ্ট পিচবোর্ডটার গায়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও ও একটা ভারী বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও। এটা বাইরে ফেলে রাখলে দুমড়ে বেঁকে যাবে। শুকিয়ে গেলে এটা বের করে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটোর ধার বরাবর কাঁচি চালিয়ে আলাদা আলাদা করে কেটে ফেলো।

এবারে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্ দুটোতে শিরীষ কাগজ ঘষে বেশ করে পেন্সিল করে নাও, যেন কোথাও খোঁচ না থাকে। শিরীষ কাগজ ঘষা হয়ে গেলে পিস্ দুটো পাশা-পাশি সমান্তরালে রেখে দুটোরই এক দিকের প্রান্ত থেকে ১½ ইঞ্চি দূরে এবং অপর দুটো প্রান্ত থেকে ½ ইঞ্চি দূরে মোটা খাতা সেলাই করা ছুঁচ দিয়ে একটা করে ফুটো করো। ৪নং ছবিটা আবার দেখ।

এখন সমান একটা জায়গায় হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো উল্টে করে রেখে তার ওপরে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্ দুটো সিকি ইঞ্চি ফাঁক রেখে সমান্তরালে পাশাপাশি এমনভাবে রাখো যাতে একটা পিসের এক প্রান্তের ১½ ইঞ্চি দূরের ফুটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিসটার ½ ইঞ্চি দূরের ফুটোটা থাকে, এবং ঠিক তেমনি অন্যদিকে ½ ইঞ্চি ফুটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিসটার ১½ ইঞ্চি দূরের ফুটোটা থাকে। খেয়াল রেখো, হাঁস ও মুরগির পাগুলোর ঠিক মাঝখানে নীচের পিসের ফুটো দুটো রাখতে হবে। ৩নং ছবিটা দেখলেই সব কিছুই পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পারবে। যদি পিস দুটোর এক পিঠ রং করে থাকো তবে রং করা দিকটা নীচের দিকে অর্থাৎ ছবির সামনের দিকে করে রাখতে হবে।

এক হাত দিয়ে এগুলো সাবধানে চেপে ধরে রেখে পিস দুটোর চারটে ফুটোরই ভেতর দিয়ে ছুঁচ ঢুকিয়ে হাঁস ও মুরগির পা ও গা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফুটো করে দাও। তারপর এই ফুটোগুলোর এপাশ থেকে টোয়াইন সুতো ঢুকিয়ে ওপাশে বের করে নিয়েই গেরো দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে দাও, যাতে পিস দুটোর গায়ে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো বেশ টাইট্ হয়ে সেঁটে লেগে থাকে।

এবার এটা তুলে নিয়ে তোমার ইচ্ছে মতো তোমার দিকে বা তোমার বন্ধুদের দিকে হাঁস ও মুরগির ছবির সোজা দিকটা রেখে এক হাতের দুটো আঙুল দিয়ে ওপরের পিসটার বেশী-বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে অন্য হাতের দুটো আঙুল দিয়ে নীচের পিসেরও বেশী বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে সরাবে। ঠিক ও চমৎকার—দেখবে হাঁস ও মুরগির দুটো সত্যি সত্যি লড়াই করবার কায়দায় কেমন পরস্পরকে ঠোকরাতে চাচ্ছে: কিন্তু কিছুতেই তা পারছে না। কেবলই মাটিতে ঠোকর মারছে।

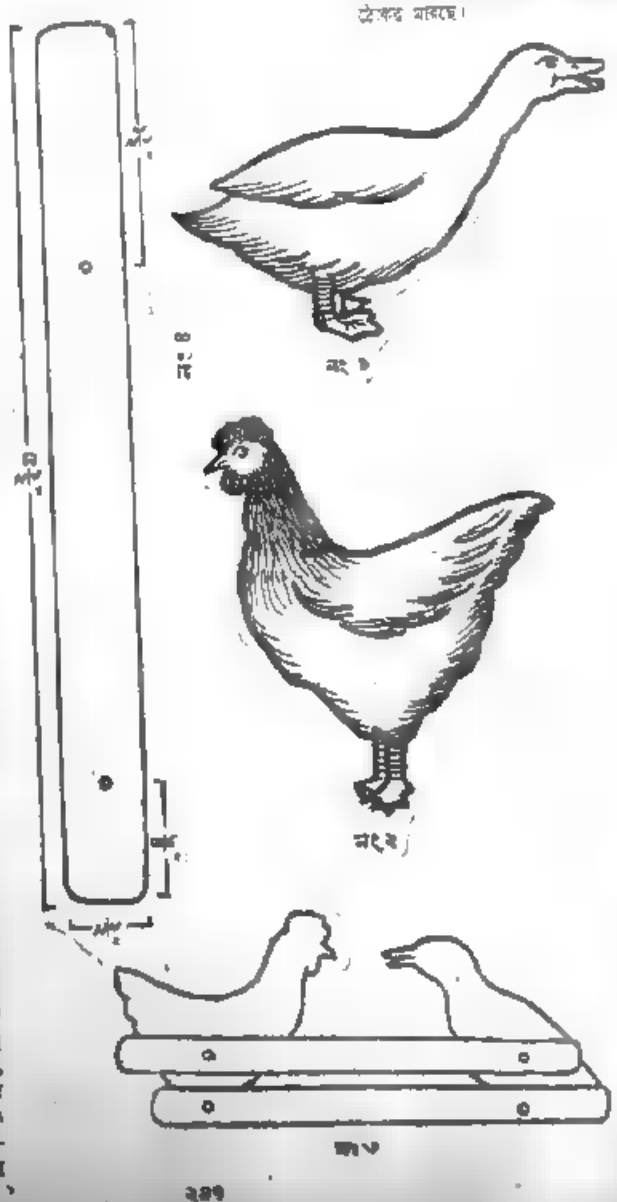

পুতুল-বিলু

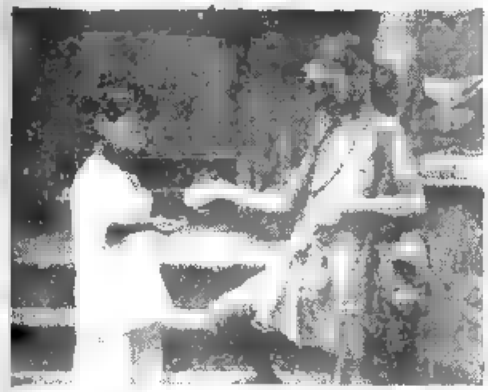

পুতুলকে দেখে খুশি, বিলুর হাতে দিল বিস্কুট,
বলল, "ইস্, পুতুল হয়েছে এটা, ঠিক ওইটুকু ছিল"

একদিন বিলু বেরোলো ওকে কুড়িয়ে আনতে, তুলে এনে রাখলো
বই, খাতা, পুঁথি সব যে বিছানা। মায়ের চোখে লাগলো।

ঘুরে গিয়ে বাড়ি গিলে, পুঁথিটাকে আলো নিয়ে,
চোখ বুজে কী ভাবলো বিলু; শেষে বুকে জড়িয়ে নিয়ে।

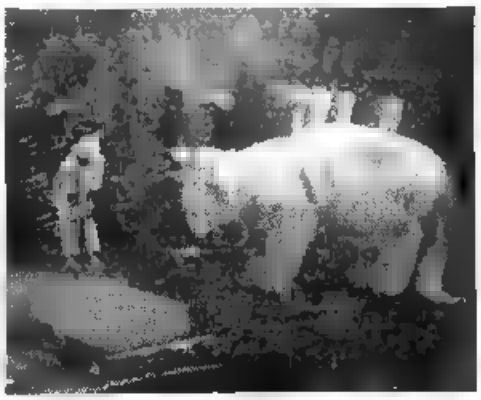

বিলুর বিপদ দেখে, লাফিয়ে পুঁথি উঠলো র‍্যাকের পরে
বলল, "পুতুল হওয়ার ইচ্ছে ছিলো, এখন গিয়েছি ভুলে।"

"ঠিক-ঠিক-ঠিক, ভুল করেছ ঠিক!" হঠাৎ কানে আসে
বিলু দেখে—"ওমা! সে যে ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির পাশে।

'আ-আ-পুঁথিটা বাধা' চেঁচায় বিলু জোরে
ছুটে এসে দিদি জুমার—'ঐ তো পুঁথি ওরে।

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ

ফটো—রেবন্ত ঘোষ

পিকনিক

বাবু আঢ্য

শরৎকাল। বর্ষার শেষে আকাশ পরিষ্কার। বন্যার জল কমতির দিকে। মাঠে কাঁচা ধানের শিষের [illegible] সবুজে হলুদের ছোপ। রাতের আকাশ তারার ঝালায় উজ্জ্বল। বাতাস শিউলির গন্ধে মাতাল। আউশ ধানের গোন্দা তখনও শুনো হয়নি। নতুন ফসলের সুখ আভাস। অসহিষ্ণু মন চলেই অনচিনের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন চালের শুরুতে পাশের জমির আলে-ভাঙা নিয়ে যখন নায়েবের তোরাজ [illegible] বা থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি করার সময় আসেনি, তখন দেশটাকে চেনা-জানার ও সেবা করার মহৎ ব্রত পালন করলে ক্ষতি হয় না, ভাবলেন শহুরে বাবুরা। বললেন চলো গ্রামে। ওদের যাদের যারা অনুন্নতকে উন্নত করতে চাই, গ্রামে শিক্ষার প্রদীপ চাষ জ্বালাতে। কিন্তু এই দেশকর্তব্য তোরাজ করবে কে? ওদের গ্রামের মধ্যে যারা দু একজন বাবু আছে। বাবু মানে শিক্ষিত অর্থাৎ মাইনর পাশ দিয়েছে। কি আর করি? মাথা পেতে নিলুম। কলকাতা থেকে বন্ধুরা গিয়েছেন ঝপাঝিকারে। গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যা-প্রচার ত হবেই, সেই সঙ্গে গুণ্ডিশুদ্ধ সবাইকে চার দেওয়াল ছেড়ে বের করে একটু হাওয়া পরিবর্তন করিয়ে আনাও হবে। সুযোগ বুঝে অম্বরাও উঠি-পড়ি করে লেগে গেলাম আমাদের বিদ্যাগুলি জাহির করতে। অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। কাজকর্মী নয় সব। সকলে অনুরাগী, সেবক অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে পাড়ার ফাঁকা জেলো জমিজমি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম। তাঁরাও বনস্পায়ীর অনাবৃত রূপ দেখে মহা উল্লসিত। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেমন খড়ের ঘর। মাটির দাওয়া। ভিজে মেঝে. পাটকাঠির বেড়া। কাকের কা কা রব। উলঙ্গ শিশু। কেমন ঘরের ভেতর নিভেজলা কুপিলোক জ্বলে। ঘণ্টাটের জন্য লণ্ঠনের হাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, কেমন পাশ্ব থেকে সব কামই লাভ করে আসছে। এই সব দেখে তাঁরা ও মহা উল্লসিত। আমরাও সেবক রাজ গৌরব করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলাম।

শিবরাত্রির অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক ও প্রয়োজন। সে যে কী দুশ্য তা কি করে বলে বোঝাব। বাবুদের ও গাঁয়ের লোক মিলে মিশে ও সংকল্পসিদ্ধির নিয়ে ও পাটে হাসির হলোড় করেছে আমাদের কথে ভর দিয়ে কোনও প্রকারে নীচে নেমেই গরু খোঁজতে আরম্ভ করে দিলেন একেবারেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে। পিছন ফিরে দেখি, যা নিশ্চিন্তিরো হয়েছিলাম

সত্যিই তাই। বাবুরা উঠে বসলেন। দুটি মুসলমান যাত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন যুবক। বৃদ্ধ বললেন, "আপনি আর একটু হলে ছাড়ে কি?" "আপনার শরীরটা আজ ভাল মনে হচ্ছে না।" ইত্যাদি সান্ত্বনাও তাঁদের এই অবস্থায় আমাদের সহানুভূতি ফিরে করতে পারেনি।

দুর্ঘটনা অনিবার্য। "নৌকা বিহার", অর্থাৎ নৌকা ভাসে তাহাকে নিজের নীল

দৃষ্টি

আলোকচিত্রী : শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

ছাদেরও নীচে এবং স্রোতহীন গাঢ়নীল জলের উপর দেশী মিস্ত্রীর তৈরি ডিঙ্গি নৌকার পাটাতনের উপর বসে ধান ধানে পুষ্পে ভরা ধরা প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকন। আপার্টমেন্ট অনুধাবন করে আমরা অর্ধ-ময়লা মোড়ি খাচ্ছি, মাজকোচা দিয়ে কাপড় এঁটে কাঠের বৈঠা এবং বাঁশের লগি হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে অতিথিদের সঙ্গের অভিযান জানালুম। কেন কোন দাদা ও আমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে পাটাতনের ভিতর ঢুকে গেলেন। উপর থেকে আহা, উহু, হা-হা, হি-হি ইত্যাদি হৈ চৈ

পৃথিবীখ্যাত

পেয়ারার জেলী

শ্রীকিষণ [redacted] এণ্ড কোং
১২৮, মিডল রোড, কলিঃ-১৪

বাংলার ভবিষ্যৎ জাতির স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি

বিশ্বনাথ ঘৃত

আমদানীকারক

পঞ্চানন আশ

এণ্ড কোং

হবি, রামকুমার রক্ষিত লেন,
হরতলাঃ — ডিনপাট্টী
কলিকাতা—৭
ফোন : ৩৩-৩৪১৬

স্বরা ঐ সব কৃতী নৌকাচালকদের বাহবা বর্ষণ চলতে থাকল। জন্য মাদীরা [redacted] প্রত্যেকেই কাদো কাঁধে ভর দিয়ে, হামাগুড়ি হয়ে এবং চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ নিয়ে নৌকায় উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্মসম্ভব কাছে বসে পড়লেন। ধাক্কা খেয়ে নৌকা যখন জলে ভেসেছে তখন আর একদফা ভীতি বিহ্বল চিৎকার এবং জড়াজড়ি করে ডিঙ্গির নৌকা ডোবাবার উপক্রম। যা হক নৌকায় টাল সামলানর পর ক্রমে সকলে ধাতস্থ হলেন। মালিনী তাঁদের সবার অনুরোধে পড়তে শুরু করলেন "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ"। প্রত্যেকের জন্যে শালপাতার মালা তৈরি করা হল এবং সিদ্ধমণিরা মাথায় গুঁজলেন সদ্যফোটা শালুক ফুল, প্রায় ডজন খানেক করে। এবার ফেরবার পালা। ইন্দুদা, গাবুদা নৌকার মাঝখানে বসেই ভূভুজুঙ হয়ে ডিগবাজির বৈঠা চলনা শিক্ষা নিয়ে একেবারে সার্টি-ফিকেট নিয়ে ফেললেন। ঘাটে এসে নৌকা লাগানোর পর আমাদের অবর পায় কে? বুঝতেই পারছেন আমাদের মত বীর-পুরুষদের তাঁদের কাপড় ধোয়া, জুতোয় কালা ঝাড়ানো ইত্যাদি সব কাজেই দরকার। এহেন পরিস্থিতি দেখে মূঢ় গ্রামবাসী বিমূঢ় হয়ে শুধু আমাদের তারিফ ছাড়া আর কি করতে পারে। ওদিকে আশপাশের গ্রাম প্রধানদের সাথে উন্নতি বিধায়িনী সমিতির সভা সমাপ্ত হয়েছে।

তার পরের অনুষ্ঠান "ভোজ সম্মিলনী"। ভিজে মাটির উপরে বাঁশের অল্প পরিসর পাটাতন করে বাঁশের খুঁটির উপর বসবার জায়গা এবং ডাইনিং টেবিল করা হয়েছে। আজকে স্থানীয় ছেলেদেরেরাই পরিবেষক। মেয়েরা ভাঁড়ার ঘরে পাশুতাঁত ভোজাকন্দু আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা পরি-বেষণ করে চলেছি। অবশ্যি তাড়াতাড়িতে কেউ লেবু পাননি, আবার পাতায় নুন দেওয়া হয়নি, ডাল দিয়ে ফিরতে না ফিরতে ভাত শেষ হচ্ছে, একজনকে মাটনি দিতে আর-একজন বেগুনে ভাজা চেয়ে বসছে। বাস্তবতার শেষ নেই। একবার ভিজে মাটিতে পা পিছলে গিয়ে ডালের হাঁড়ি আমার গায়ের উপরই পড়ল। কিন্তু তাই কি দেখবার সময়। এদিকে এক দিদিমণি যে লেবু চাইছেন। ভাবলেশহীন মুখে উঠেই চিৎকার করতে করতে ছুটেছি, "বিনু, বিনু, দিদিমণি একটু চাটনি দাও।" সেটা হাতে নিয়ে আবার "বিনু-বিনু, মাছের ঝোলটা এগিয়ে নিয়ে এস।"

এর মধ্যে তৈরি হয়ে বাবুদের অংশ পালে ঘরে ঘরে ঢুকছি এবং উৎসুক হয়ে তাঁদের মুখের দিকে তাকাচ্ছি পরবর্তী অনুষ্ঠানের নির্দেশের জন্যে। খুলনায় এবার অবাক্যের শেষ অনুষ্ঠান শুরু হবে—"স্বপ্নায়োজন"।

এহেন অনুষ্ঠানের নাম শুনে ত চক্ষু চড়ক গাছ। বাবুরা কষ্ট করে স্বপ্ন দেখবেন, তার আয়োজন আমরা কী করে করব। নিজেরা কোন পথ দেখতে না পেয়ে নতুন কিছু দেখবার জন্য উন্মুখ হচ্ছি, এমন [redacted] যেন হঠাৎ গাবুদা আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "হ্যালো, ইয়ংম্যান, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? বিছানা-টিছানাগুলো তোমার ঘরে নিয়ে গেছে ফেলো ত?" এতক্ষণে বোঝা গেল। অনুষ্ঠানের নামকরণ দেখেই বোঝা উচিত ছিল। যা হক তাদের তোষকের ঘরের নিম্নেশ দিয়ে লাইব্রেরী থেকে চৌনের ধুলো আর ছারপোকা ভর্তি হেরিকেনটা ঝেড়ে মুছে স্কুল ঘরে হাজির হলুম। ইতিমধ্যে সবাই সেখানে হাজির হয়ে স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত। চটাইয়ের বেড়া দিয়ে পার্টিশান করে মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাবুদের সময়-জ্ঞান দেখে বিস্ময় বোধ করছিলাম। প্রথমেই গাবুদার বিছানা খুলে লম্বা করে ফেললাম। আজ খুলে উপরে মোড়া লংপ্লেফেলানিত চাদরটার মাঝামাঝি ধরে টান দিতেই লালুদি জোরেকে হাঁকা করে এসে বললেন, "থাক তুই থাক, ওসব গাবুদাই ঠিক করে নেবেন। এখন বিশ্রাম নাও গিয়ে, খাওয়া হয়েছে?" খাওয়া অবশ্য তখনও হয়নি, তবু যেন লালুদির এত দরদে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। খুশী হয়ে নীচে নামতে নামতে শুনলুম গাবুদার অনুযোগ, "তুমি কি বলত লালী, বিছানাটি তেতে নিলে দিব্যি শুয়ে পড়া যেত, দিলে সব ভণ্ডুল করে।" উত্তরে লালুদি যা বললেন, তা শুনে ঘাড়-হেঁট করে মোড়ে পালাতে বাধ্য হলুম। লালুদি বলছিলেন, "ওঃ তাহলে ত বড় অন্যায় করেছি! আচ্ছা গাবুদা পাড়াগাঁয়ে এসে একেবারে জংলী হয়ে গেছ আজি? আমার দিকে অত না তাকিয়ে চামচে দেখ পাঁচ কানা হলের পঞ্চাশটির বেশী খাবেনা।"

ঘাটে এসে হাত ধুয়ে ফেললুম। হোগলা-জলের গায়ে চৌনের ধুলো আর নৌকার কাদার সমন্বয়ে এই অপূর্ব রঙের সৃষ্টি করেছিল। ঠিক করলাম আর এসব বাবুদের সঙ্গেও ঢোকব না।

কিন্তু আমি ঠিক করলে কি হবে, শহুরে বাবুরা কি গ্রামবাসীদের ছেড়েই দেবেন? বিকেলিক করার মেজাজ এলেই যে তাঁরা গ্রামের দিকে পা বাড়ান—গ্রামোন্নয়ন বা অবাদ ফেলে নয়।

শেষ পর্যন্ত সীমাশরণজীকেই আসতে হল।

লাইন-বাবুরা এখানে আসতে চায় না। কিসের টানেই বা আসবে!

এখানে মানুষ বলতে ঝিলাসপুরী কুলীকামিন। তাদের সাময়িক আস্তানা হিসেবে গুটিকতক হোগলার কুঁড়েঘর আর চটের তাঁবু।

এখান থেকে ■■■ মাইলের মধ্যে সীমান্ত। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন বসাবার কাজ চলছে।

• রেলের লাইন, ভাঙা পাথর আর ঝিলাসপুরী লটবহর ছড়িয়ে আছে।

চারপাশে ধু-ধু নিষ্ফলা মাঠ, উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙা আর বালিপাড়ি। নোনা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে কিছু ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন চেহারার কয়েকটা পলাশ।

এ সবও বাধা হত না। লাইন-বাবুরা হুরুত আসত। দুঃখ ফালতু রোজগারের ভরসা থাকত। কিন্তু তার উপায় নেই।

এখানে আসার নাম শুনেই লাইনবাবুরা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বসল।

অগত্যা সীমাশরণজীকেই রওনা হতে হল। সীমাশরণজীও লাইন-বাবু অর্থাৎ লাইন-ইনস্পেক্টর।

সীমাশরণজী যখন এসে পৌঁছলেন, তখন আকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরেছে। সে দিকে তাকানো যায় না। তাকালে চোখ ঝলসে যাবে। আকাশটা যেন পুড়ে পুড়ে গলে গলে নীচে ঝরে পড়ছে।

বিশ মাইল উটগাড়িতে এসেছেন। সীমাশরণজীর মনে হল, এইমাত্র একটা আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলেন। মনে হল, রোদের সাঁড়াশি খেতে খেতে চামড়া মাংস কুঁকড়ে কুঁকড়ে গিয়েছে।

আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সীমাশরণজীর জন্য আলাদা একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হয়েছে।

উটগাড়ি থেকে নামতেই কুলীদের সর্দার তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। কোন দিকে তাকাবার মত অবস্থা নয় সীমাশরণজীর। নিথর বাঁশের মাচানে মেহটাকে সঁপে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন।

কুলীদের সর্দার বলল, "তবিয়ত হচ্ছে ইনাসপিটারজী?"

অস্ফুট শব্দ করলেন সীমাশরণজী। কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না।

সর্দার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটি কামিনকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। ডাকল, "ইনাসপিটারজী!"

চোখ বুজেই সীমাশরণজী বললেন, "হাঁ—"

"ইতিরাকে এসেছি। আপনার তখলিফ হচ্ছে। ইতিরা ছোড়া হাওয়া করছে।"

সীমাশরণজী এবার জবাব দিলেন না। চোখও মেললেন না।

এটা কী তিথি কে জানে! সপ্তাহের ঠিক পরে পরেই চাঁদ দেখা দিত। ফিনফিনে ছোট্ট জোৎস্নায় তাঁবুর ডাঙা আর বাঁশগাড়ি বিজোর হয়ে আছে। আকাশটা অপরূপ নীল, আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কে বলবে দুপুরের এই আকাশটাই গলা কাঁসার রঙ ধরেছিল!

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

জ্বের-ঘোর আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। শরীরটা ঝরঝরে। খানিকটা বাতস্থ হয়ে উঠে বসেছেন সীমাশরণজী।

দুপুরে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁবুর ভিতরকার কিছুই দেখেননি। এখন সীমাশরণজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

তাঁবুতে আসবাব বলতে দুটি বাঁশের মাচান, একটি মাটির সোরাই আর নরকেল পাতার খান-দুই পাখা।

বাইরে একটা গলা পাওয়া গেল, "হুজুর আসব কী?"

জবাবের অপেক্ষা না করেই একটি কামিন ঘরে ঢুকল। তার হাতে তিনটে পিতলের বাসন।

প্রথমে ঘোরাল কটমটে সীমাশরণজী। উদাসীন গলায় বললেন, "তুই কে?"

"আমি রতিয়া। তাজাম থিম আপনাকে বাতাস করলাম। এখন পুছছেন আমি কে?"

সীমাশরণজীর মনে পড়ল। দুপুরের সেই ঘোর-ঘোর অসহায় অবস্থায় সর্দারের মুখে রতিয়ার নাম শুনেছিলেন বটে।

পিতলের বাসন তিনটে মাটিতে রেখে একটা লণ্ঠনটা উসকে আলোটা করল রতিয়া।

একটু আগে উদাসীন অবাসেক্ষের মতো কথা বলছিলেন সীমাশরণজী। আলোতে রতিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

মুটোনো শরীর। চকচকে তামার মতো চামড়ার রঙ। কাঁধ থেকে দুটো নিটোল, মসৃণ, নগ্ন হাত নেমে গিয়েছে। সুপুষ্ট শরীর, খাটো কাপড়ে যার মানে না। বিড়ালীর মতো কটা চোখ। জোড়া ভুরুর মধ্যখানে কালো উল্কিতে সাপ আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত আঁটো কাপড়। তারপর উদাম পা। হাতে রুপোর কাছন, পায়ে গুজরি-পঞ্চম। সারা দেহে এক ধরনের উগ্র মনোজ্ঞতা।

রতিয়া বলল, "যে ক' রোজ থাকবেন, সর্দার আমাকে আপনার খেদমতে দিয়েছেন। কাজে বলেছে। রোটি-ভাজি পাকিয়ে দিতে বলেছে।"

পিতলের বাসনগুলো দেখিয়ে বলল। "এই আপনার বরতন খানা—"

"ঠিক আছে, তুই এখন যা।"

"আপনার বিস্তারা পেতে দিয়ে যাই।"

"দরকার নেই। আমিই পেতে নেব। তুই এখন যা।"

একরকম তাড়া দিয়েই তাঁবু থেকে রতিয়াকে বার করে দিলেন সীমাশরণজী।

যাবার আগে রতিয়া বলল, "কাল ভির আসব ইনাসলিটারজী।"

বলার পর একটু হাসল রতিয়া। তিনটে

বেরোতে হবে? চুল শুকিয়েছে তো?

ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। চুলের কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না তাহলে ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল [redacted] আগেই আপনাকে বেরোতে হবে তবে তাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিকে মালিশ করুন, তাহলেই পরিষ্কার করে শুকনো চুল বেঁধে ফেলুন। জবাকুসুম তেল চুলের একটি বড় বড় গাছ আর এ তেল মেখে স্নান না করলে ঘোম ক্ষতি হবেনা। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই ভিজ আনন্দে ভরিয়ে রেখে। জবাকুসুমের অপূর্ব তেজস-কণাগুলি মাথা ও মাথা ঠিক করে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১৩

চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর চিকন দুটি মিটোল পায়ের ছন্দ বাজিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকাল থেকেই কাজ শুরু হল।

কাজ আর কী! সীমান্ত-বরাবর রোলার লাইন আর মিলপার পাতা হচ্ছে। সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি বসানো হচ্ছে। এই-সবের ইন্সপেক্সন প্রভৃতি তদারক করা।

বিকালপুরী কুড়ানীর ভাঙা ভাঙা লোহায় লাইন টানে। আর হাঁকে, "আরে জু—জো—রা—রু—রু—"

"হাঁইও—"

তাদের কালো-মাজা পিঠ রুদ্ধে রোদে চক-চক করে।

দুপুরের আগে আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

সেই সকাল থেকেই মহড়া চলে। রোদের তাত বাড়তে বাড়তে এক সময় প্রকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরে। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ির উপর দিয়ে লু ছুটে যায়। অনেক—অনেকদূরে আকাশ যেখানে ধনু-রেখায় নেমে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে ঝিল-মিল করে আগুনের একটা ছোরা কাঁপতে থাকে।

এ-বেলার মত কাজ চুকল। বিকেলের পর যখন ঠিকাদার, ঠান্ডা বাতাসে কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি জুড়তে শুরু করবে, তখনই কাজ আরম্ভ হবে।

সীমান্তরক্ষী তাঁবুতে ফিরলেন।

রতিকা স্নানের জল আর দুপুরের খাবার রেখে গিয়েছে।

রতিকা ছিল না। যা খাবারে এসে দেখে নিশ্চিন্তই গেলেন সীমান্তরক্ষী।

বীরেন্দ্রসুন্দর স্নান সেরে খেতে বসেই চমকে উঠলেন। পিতলের থালার রোটি আর মাংস রেখে গিয়েছে রতিকা। থালাটা ঠেলে উঠে পড়লেন সীমান্তরক্ষী। হাঁকলেন, "সর্দার—সর্দার—"

কুলীদের সর্দার ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল, বলল, "জী—"

"এ কী খানা দিয়েছে!"

যেমন এসেছিল, ছুটতে ছুটতে তেমনি বেরিয়ে গেল সর্দার। একটু পর রতিকাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকল। তার পর বলল, "আপনার রোটি এই রতিকা পাকিয়েছে।"

সীমান্তরক্ষী বললেন, "এ কী পাকিয়েছিস!"

"কেন, গোস্ত আর রোটি।"

লাইন-বাবু বলে তাদের সেই রীতিমত। সহজ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দিল।

সীমান্তরক্ষী বললেন, "আমি খাচ্ছি-দাচ্ছি খাই না। এগুলো নিয়ে যা।"

থালাটা নিয়ে যেতে যেতে রতিকা হেসে মুখে বলল, "আপনার জন্যে বহুত আচ্ছা করে গোস্ত পাকিয়েছিলাম ইনস-পিটারজী।"

রতিকা চলে গেল। এ যেন সীমান্তরক্ষীর খাওয়া [illegible] না।

সন্ধে পর্যন্ত লাইন পাতার কাজ চলল।

রাত্রে তাঁবুতে ফিরে সীমান্তরক্ষী দেখলেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রতিকা বসে আছে। তাকে দেখেই মেয়েটা হেসে উঠল। হাসল কিন্তু শব্দ হল না। বড়ই গরীবের বাঁক দিয়ে উলটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ছুরু মুটো কুঁচকোতে উল্কির সপ্তর্ষি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল।

রতিকা বলল, "আপনার রোটি এনেছি ইনাসপিটারজী—"

সীমান্তরক্ষী জবাব দিলেন না। কেন জানি না তাঁর মনে হল, রতিকার সঙ্গে দুটো কথা বলা যায়, তবেই মঙ্গল।

এ-বেলা রোটি, দুধে নরম ছাড়ি, অল্পুরে ছোঁয়া আর হরিণের আচার নিয়ে এসেছে রতিকা। খেতে বসে বেশ খুশীই হলেন সীমান্তরক্ষী। হরিণের আচার তাঁর খুব প্রিয়।

খেতে খেতেই সীমান্তরক্ষী মুখ তুললেন। রতিকা এখনও যায়নি। লণ্ঠনটার পাশে বসে জুলে জুলে করে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সীমান্তরক্ষী বললেন, "তুই এখনও যাসনি?"

"না ইনাসপিটারজী। আপনার খাওয়া হলে তবেই সাফ করব বরতন নিয়ে যাব।"

আর কিছু না বলে সীমান্তরক্ষী হাতটা ছিটকতে লাগলেন।

খাবার পর তাঁবিয়ে বাঁশের মাচানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন সীমান্তরক্ষী। রতিকা ঠক ঠক, ঠুক ঠক শব্দ করে তাঁবু সাফ করতে লাগল।

বাইরে কালাজ্বর মত ফিমিক-ফোটা জোৎস্না চোখ মিরেছে। কাঁকুরে ডাঙা স্নিগ্ধ সুরেরাঁর ইতস্তত অস্পষ্ট হয়ে আছে। দূরের নাড়া ঘিরেছে আর দুপুর পলাশ-গুলি অস্তুত এক শ্রী পেয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্রগতি

অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার তিন বছর পর উহার অগ্রগতি বস্তুতই লক্ষ্য করিবার মত।

খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা সহ আরও কয়েকটি নূতন সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন আরও এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে ২২টি ব্লকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে এবং জেলাগুলিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর উহার ব্যবহারের বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইবার আগেই সমস্ত ব্লকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

শিল্পক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। বর্তমানে ১৫টি বৃহৎ শিল্প কারখানা চালু হইয়াছে এবং আরও ১৫টি কারখানা নির্মাণের কাজ চলিতেছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ১৯৫৬ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। বর্তমানে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ৭৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাইতেছে। ১৯৫৬ সালে এই অনুপাত ছিল ৫৫ শতাংশ। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৬১ সালের মধ্যে ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করা হইবে।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্রগতি

অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার তিন বছর পর উহার অগ্রগতি বস্তুতই লক্ষ্য করিবার মত।

খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা সহ আরও কয়েকটি নূতন সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন আরও এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে ২২টি ব্লকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে এবং জেলাগুলিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর উহার ব্যবহারের বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইবার আগেই সমস্ত ব্লকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

শিল্পক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। বর্তমানে ১৫টি বৃহৎ শিল্প কারখানা চালু হইয়াছে এবং ৫০টি কারখানা নির্মাণের কাজ চলিতেছে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ১৯৫৬ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও অন্ধ্র প্রদেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। বর্তমানে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ৭৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাইতেছে। ১৯৫৬ সালে এই অনুপাত ছিল ৫৫ শতাংশ। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৬১ সালের মধ্যে ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করা হইবে।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন সীমাশরণজী। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন হুঁশ নেই। হঠাৎ পাহাড়ের উপর ঠান্ডা হাত পড়তেই চমকে উঠলেন। পা দুটো টেনে গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। দেখলেন, সামান্য ঝুঁকে ধূর্ত চতুর হাসি হাসছে রতিয়া।

মুখোমুখি সাপ দেখলে যেমন হয়, সীমাশরণজীর অবস্থা ঠিক তেমনি। অস্বস্তি, ভয়ভয় গলায় তিনি বললেন, "কী—কী—কী হইলব?"

"কুছ না ইনসপিটারজী। আপনার পায়ের দাবিয়ে থোড়া আরাম দেব।"

সীমাশরণজী চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, দরকার নেই। তুই যা।"

"তাজ্জব, আচ্ছা জী।" হাঁটু থেকে বেরুবার আগে ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "রাতে কুছু দরকার হলে আওয়াজ দেবেন ইনসপিটারজী। আমি পাশের ঝোপড়িতেই আছি।"

রতিয়া চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সীমাশরণজী। বুকের মধ্যে কেমন কেমন এক ধরনের ঠান্ডা শিহরিয়ে কাঁপুনি উঠছে। কিছুতেই তাকে স্থির রাখা যাচ্ছে না।

সামান্য উত্তেজনা বেশ খানিকটা সময় লাগল। নিজের কথা ভাবতে শুরু করলেন সীমাশরণজী।

তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। সুগৌর বর্ণ, সুন্দর চেহারা। বেশ বয়স হয়েছে। চল্লিশ পার হয়েছেন। কিন্তু ছাতার ফুলে দু-একটা পাক ধরানো ছাড়া বয়স তাঁর চেহারার আঁচড় কাটতে পারেনি। গম্ভীর আর প্রসন্নতা শ্রী হয়ে তাঁর মুখে চোখে লেগে আছে।

সীমাশরণজী বিয়ে করেননি। কামনাতে তাঁর মোহ নেই, আসক্তি নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিকার এবং নিস্পৃহ।

এইটুকুই সীমাশরণজীর সমস্ত পরিচয় নয়। জীবনে তিনি মিতাচারী, অদ্ভুত সংযমী। এমন খাদ্য খান না যাতে শরীর উত্তেজিত হয়। এমন কথা ভাবেন না যাতে মন বিচলিত হয়। নীতি এবং সংযমে তাঁর অটুট নিষ্ঠা।

সীমাশরণজী লাইন-ইনসপেক্টর। সমস্ত জীবন তিনি রেলের লাইন দেখতে আসছেন। রেলের লাইনই শুধু নয়, নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইনও তিনি বসিয়ে চলেছেন। তার বাইরে যাবার উপায় নেই।

এখানে, এই কাঁকুরে ডাঙা অন্ধ বাদি-রাঁড়িতে লাইন পাততে এসেছেন তিনি। সাঁওতাল-বরাবর রেলের লাইন টেনে নিতে মাস-দুই সময় লাগবে।

দু রাত্রি রেলাবের সঙ্গে রতিয়ার কথাটা বড়ই অমঙ্গল, বিশ্রি এক ভয় চমু পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল।

সীমাশরণজী ঠিক করলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। পারতপক্ষে [redacted] সঙ্গে কথা বলবেন না।

সীমাশরণজী আসার পর দিন-দশেক পার হল। লাইন পাতার কাজ পুরোদমে চলছে। দুপুরের আকাশ, বাতাস, কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি যখন অস্বাভাবিক তেতে থাকে, সেই সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। এ কদিনে অনেকখানি লাইন বসানো হয়েছে।

কাজ যেই চুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে চলে আসেন সীমাশরণজী। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজান্তেই একটা বাধার সৃষ্টি চলেছে।

সেই যে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলবেন না, তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই বিজনপুরী জমিনটা ভারি মিষ্টি। হেসে হেসে ঢলে ঢলে প্রচুর কথা বলে। আশ্চর্য! সীমাশরণজী তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে তাল রেখে পাল্টা দিয়ে কথা বলছেন, হাসছেন।

রতিয়া বলে, "ইনসপিটারজী কী সাদি-উদি করেছেন?"

"না।"

গালে একটা হাত রাখে রতিয়া। চোখের কটা তারা দুটো ডরকির মত ঘোরে। কপট দুঃখ করে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, "হায় রামজী! এখনও সাদি করেননি!"

সীমাশরণজী হাসেন। বলেন, "সাদি করিনি ত হয়েছে কী?"

"জমমটাই আপনার বেকারদা হয়ে গেল ইনসপিটারজী। সমঝলেন?"

"হুঁ।" আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সীমাশরণজী।

সীমাশরণজীর এমনিতে বড় ভুলো মন। লাইনের তদারকিতে ব্যস্ত গিয়েছেন। ছাতাটা ভুলে সঙ্গে নেননি। রোদের তাতে চামড়া সেঁকছে।

ছুটতে ছুটতে ছাতা নিয়ে এল রতিয়া। ফিস ফিস করে বলল, "আপনার বহুত ভুল হয় ইনসপিটারজী। ভুল সহজে কমাতে জমো একটা সাদি করুন। বহুকী এলে আর ভুল হবে না।"

সস্নেহে ধমক দেন সীমাশরণজী, "আর যা অজ্ঞানাবাজী—"

একটা লম্বা ছুটোমাছের মত শরীর দুলতে দুলতে চলতে চলে যায় রতিয়া।

[redacted] জোর কাজ চলছে।

আর মাস-খানেকের মধ্যেই সাঁওতাল

পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে যাবে।

সীতাশরণজী আসার পর পনেরো দিনটা মাস পার হতে চলল। এই দেড় মাসে রতিয়ার হাসি, চলাফেরা, কথাবলা নিয়ন্ত্রণ অজান্তেই তার সমস্ত সত্তাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আজকাল রতিয়াকে ছাড়া সীতাশরণজীর চলে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধে—দিনে তিনবার তাঁর তাঁবুতে আসে রতিয়া। তাঁবু সাফ করে। রোস্ট-তরকারি সাজিয়ে দেয়। মাটির সোরাহিতে জল ভরে রাখে। বিছানা পাতে। কখনও কাজ সারে আর হেসে হেসে তামাশার কথা বলে, রসের কথা বলে।

ইদানীং আরও একটা কাজ বেড়েছে রতিয়ার। রাত্রে খেয়েদেয়ে সীতাশরণজী শুয়ে পড়লে নরম মোলায়েম হাতে তাঁর পা টিপে দেয়।

এখানে আসার পরের দিন তাঁর পায়ে রতিয়া হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে বসেছিলেন সীতাশরণজী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করেছিল। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তে রতিয়ার এই সেবাটুকু মেনে নিয়েছেন, খেয়াল নেই তাঁর।

রতিয়ার আসতে দেরি হলেই সীতাশরণজী অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারি করেন; এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘুরতে থাকেন।। রতিয়া যতক্ষণ না আসে, স্বস্তি পান না।

সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুঁজি পোঁতা হচ্ছে। স্লিপার বসানো হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই রেল-লাইন সীমান্ত ছোঁবে। কুলী কাটিন এবং ইনজেনিয়রদের খাস ফেলার ফুরসত নেই।

আজ একটানা সমস্ত দিন কাজ হয়েছে। দুপুরে খেতে আসতে পারেননি সীতাশরণজী। রতিয়া বার দুই ডেকে ফিরে গিয়েছে।

সন্ধের পর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে আসছে। দুপুরের আগুন আকাশটা নিষ্প্রভ এক ধূসরতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ঝিরঝিরে, মিঠেল বাতাসে সমস্ত দিনের অবসাদ জুড়তে জুড়তে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীতাশরণজী। আজও নেই, হেমন্ত নেই, তবু অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে আছে।

তাঁবুর বাইরে থেকেই সীতাশরণজী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "রতিয়া—রতিয়া—"

অন্য অন্য দিন ডাকতে হয় না। পায়ের শব্দ পেলেই নরম হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে রতিয়া।

সাত-পাঁচের ভাবার পরও সাড়া মিলল না। অগত্যা তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেন সীতাশরণজী। রতিয়া নেই। এক কোণে একটা চেরাগের লণ্ঠন জ্বলছে।

লাইন থেকে ফিরে রতিয়াকে দেখে, তার সঙ্গে গল্প করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অহেতুক দুশ্চিন্তে মনটা ভারিয়ে তাঁবুতে ফিরেছিলেন সীতাশরণজী। মনটা এখন উদাস হয়ে গিয়েছে।

মেচানের উপর নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সীতাশরণজী।

ঘনিয়েছে পর তাঁবুর বাইরে খুটখুট শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সীতাশরণজী। অস্ফুট অস্পষ্ট ডাকলেন, "রতিয়া—"

কিন্তু তাঁবুর ভিতর যে ঢুকল, সে রতিয়া নয়। অন্য একটা কামিন। কামিনটা সিগন্যালার খালাসী রোস্টি-তরকারি এনেছে।

খানা মাখিয়ে কামিনটা চলে গেল।

সীতাশরণজী একবার ভাবলেন, কামিনটাকে ডেকে রতিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো সঙ্কোচ ঠেকল। সঙ্কোচটাকে ঝেড়ে ফেলে তাঁর ইচ্ছা করল না।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন সীতাশরণজী। মনের সঙ্গে অনেক যুঝলেন। কিন্তু একটা অন্ধ বন্দনা তাঁকে বিবশ করে ফেলল। আর সেই বন্দনাটাই তাঁকে তাঁবুর বাইরে টেনে আনল।

লাইনের ধারে টিকাকা কাঁকরে কুলীরা ছোলির গীত গাইছে। সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যেখানে নাড়া লিমুল আর ঘুন পলাশগুলি মাথা-বাঁধা জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে চলে এলেন সীতাশরণজী।

লিমুল আর পলাশের নীচে কামিনদের কুপড়ি। কুপড়িগুলোর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলেন। তার পর ভাবলেন, রতিয়াকে ডাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। রতিয়া রোজ তাঁর তাঁবুতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইনজেনিয়রজী যদি তাকে রাতে ডাকেনই, কুলীরা খারাপ চোখে দেখবে না। সীতাশরণজীকে বিশ্বাস করে তারা।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত রতিয়াকে আর ডাকা হল না। অসহ্য অবুঝ এক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীতাশরণজী।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের বাতাসে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল।

কে যেন ডাকল, "ইনজিনিয়রজী—"

চোখ মেলেই সীতাশরণজী দেখলেন, রতিয়া। সন্ধে সন্ধে উঠে বসলেন। মুহূর্তেই যে কথা বললেন, তা এই, "কাল রাতে আসিসনি কেন রতিয়া?"

রতিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে সেই হাসি হাসল, যাতে শব্দ নেই।

একটা রাত্রি না ঘুমিয়ে চোখ লাল হয়েছে। হয়, মুখটা শুকনো, রুক্ষ উড়ুউড়ু। সীতাশরণজীকে দেখতে দেখতে রতিয়া বলল, "তোমার এ কী সুন্দর হয়েছে!"

বিস্ময়ভরে সীতাশরণজী বললেন, "ও কিছু না, কিছু না। কাল তুই আসিসনি কেন, বল?"

রতিয়া এবারেও জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে আগের মতই হাসতে লাগল।

সীতাশরণজী বললেন, "হাসছিস কেন?"

"বলব না।" জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "কাল রাতে একটা বুনো শুয়োর মুখে অমনি কোপড়ির পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একলিন ভরোসা করে কোপড়িতে ঢুকল না। দুটোখাঁড় জ্বলে ধরে লাগব।" খিল খিল করে সমস্ত বনকে হাসিতে ভরিয়ে তুলল রতিয়া।

সীতাশরণজী শিউরে উঠলেন। ব্যস্তভাবে গলায় হিংকার করলেন, "খবরদার যা, খবরদার না।"

হাসি থামিয়ে সীতাশরণজীর মুখের দিকে তাকাল রতিয়া। সে মুখে কী দেখল, সে-ই জানে। আর একটা কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল।

আজ আর বেরোলেন না সীতাশরণজী। সমস্ত দিন তাঁবুতে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। এতকাল নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইন পেতে এসেছেন। জীবনের চলাপথে যখন যিনিই তাঁর উপর দিয়ে চলাফিরা করেছেন, এই সীমান্তে এসে, চল্লিশটা বছর পার হয়ে জীবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যেটা বেআব্রু হয়ে বাইরে পড়ার উপক্রম ঘটেছে। প্রায় দুটি মাস অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে সীতাশরণজী আজ আচ্ছন্ন হলেন। স্থির করে ফেললেন, আজই এখান থেকে চলে যাবেন।

বিকালে কুলীকামিনদের অবাক করে দিয়ে ট্রলিতে উঠলেন সীতাশরণজী।

সকলের সঙ্গে রতিয়াও ট্রলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার ভীরু চোখ-দুটো এক হয়ে রয়েছে। রতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সীতাশরণজী।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় রতিয়া বলল, "ওরলোক—"

ট্রলি চলতে শুরু করল। জীবনের আনন্দ এক সীমান্ত থেকে পালিয়ে গেলেন সীতাশরণজী।

বেকার সমস্যা

পূর্ণেন্দুকুমার বসু

আজ থেকে বারো বছর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীন হবার পর দেশবাসীর আশা ছিল যে প্রায় দুশো বছর ইংরেজ রাজত্বে দেশে যে অভাব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার দ্রুত সমাধান হবে। প্রধান অভিযোগ ছিল দেশে মানুষের কাজের ব্যবস্থা হয় না। যত লোক কাজ করতে পারে তাদের কাজ জোটে না, বেকার অবস্থায় থাকে। দেখে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই সমস্যা সমাধানের কথা সরকার ভাবতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আজও মানুষের সে আশা সফল হয়নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়, কিন্তু দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস ত পায়ইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই প্রবন্ধে সারা ভারতবর্ষে বেকার সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ যে কি দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এর সমাধান যে কী তা বলা খুবই শক্ত, তবে তারও কিঞ্চিৎ আভাস দেব।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি অনগ্রসর দেশ। প্রতি বছর এর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বাড়ার জন্য যত কাজের লোকও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। দেশে যে পরিমাণ কাজের ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে কর্মক্ষম লোকের সমতা থাকছে না, যার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এই সমস্যাটির প্রকৃত রূপ কী? সমস্ত দেশের জনসংখ্যায় তুলনায় এর অংশ কতটা? শহরে এবং গ্রামে এই সমস্যার কি কোনো তারতম্য আছে? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন মনে ওঠে। তারই কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

১৯৫১ সালে আদমসুমারি হয়। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৩৫·৬৯ কোটি। তারপর ৮ বছর হয়ে গিয়েছে, এই সময়ে লোকসংখ্যা কি দাঁড়িয়েছে, তা অনুমান করা যায়। ১নং তালিকাতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সাময়িকভাবে অনুমান করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি বছর প্রায় ০·৫০ কোটি লোক যোগ হচ্ছে।

১নং তালিকা, ১৯৫২—৫৮ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা (অনুমান)

বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)	বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)
১৯৫২	৩৬·৭৫	১৯৫৬	৩৮·৭৪
১৯৫৩	৩৭·২৫	১৯৫৭	৩৯·২৪
১৯৫৪	৩৭·৭১	১৯৫৮	৩৯·৭৫
১৯৫৫	৩৮·২৪		

এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯৬১ সনে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ করার সময় লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪২ কোটির মতন। মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ থাকে গ্রামে আর ২০ [redacted] থাকে শহরে। গ্রামে ও শহরে সমাজ বিন্যাস আলাদা, কাজের ধরনও আলাদা। সেইজন্য বেকার-সমস্যা আলোচনা করতে হলে গ্রাম ও শহরকে আলাদা করে দেখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮২·৬৯ জন লোক অশিক্ষিত, ১৬·১১ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর মাত্র ০·৬৮ জন শিক্ষিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা অন্যরকম। শতকরা ৫৫·২৫ জন লোক অশিক্ষিত, ৩১·২৪ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর ৫·৫ জন শিক্ষিত। আয়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে গ্রামে শতকরা ২৯·২৮ জন আয় করে আর শহরে শতকরা ২১·৫৪ জন আয় করে। শতকরা অর্ধেকের বেশী লোক শহরে ও গ্রামে নির্ভরশীল, শহরে এর পরিমাণ শতকরা ৬৪·০৪ ভাগ [redacted] গ্রামে ৫৩·০৮ জন। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আয় করে কিন্তু তবুও তারা কিছু পরিমাণ পরনির্ভরশীল, তাদের ইংরাজীতে বলা হয় 'আর্নিং ডিপেন্ডেন্টস'। এদের সংখ্যা শহরের থেকে গ্রামে অনেক বেশী, শহরের তাল হচ্ছে শতকরা ৬·২৫ [redacted] গ্রামের তাল ১৯·৬১। (২নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

২নং তালিকা।—গ্রামের ও শহরের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক অবস্থা (শতকরা)

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
শিক্ষা						
১। অশিক্ষিত	৭২·৭২	৯২·৬৪	৮২·৪৯	৪০·৪০	৬৮·০১	৫৫·২৫
২। সামান্য লেখাপড়া জানে	২৯·০৬	৭·২৫	১৬·১১	৪৭·৭৮	২১·৮১	৩১·২৪
৩। শিক্ষিত	০·৭৪	০·০৭	০·৪৬	৮·৭৫	১·৮৪	৫·৪৭
৪। জানা যায় নি	০·০৮	০·০৪	০·০৬	০·০৪	০·০৫	০·০৪
অর্থনৈতিক অবস্থা						
১। রোজগারী	৪৯·১৮	১·৮০	২৯·৮৮	৪৯·০১	৭·৬৬	২১·৫৪
২। রোজগারী, কিন্তু নির্ভরশীল	১০·৭৮	২২·৬৮	১৬·৬১	৫·০০	৭·৬২	৬·২৫
৩। পরনির্ভরশীল	৩১·৫৬	৬৭·১৫	৫৩·০৮	৪৬·৪৯	৮৪·৪৮	৬৪·০৪
৪। জানা যায় নি	০·৪৮	০·৩৭	০·৪০	০·১২	০·২৪	০·১৭
নমুনার সংখ্যা	২০,৬০৪	১৯,৭৫৮	৪০,৪১২	৪৮ ৩২১	৪৮,১৩৭	৮৫

গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮২·৬৯ জন লোক অশিক্ষিত, ১৬·১১ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর মাত্র ০·৬৮ জন শিক্ষিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা অন্যরকম। শতকরা ৫৫·২৫ জন লোক অশিক্ষিত, ৩১·২৪ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর ৫·৫ জন শিক্ষিত। আয়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে গ্রামে শতকরা ২৯·২৮ জন আয় করে আর শহরে শতকরা ২১·৫৪ জন আয় করে। শতকরা অর্ধেকের বেশী লোক শহরে ও গ্রামে নির্ভরশীল, শহরে এর পরিমাণ শতকরা ৬৪·০৪ ভাগ [redacted] গ্রামে ৫৩·০৮ জন। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আয় করে কিন্তু তবুও তারা কিছু পরিমাণ

ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করতে হলে এই সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রবন্ধের আঙ্গি-

প্রশ্নগুলি নমুনা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সরকারী ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে, নীচের লাইনে নমুনার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দেশে কতজন বেকার হয়ে আছে, এ বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন মোট জনসংখ্যার মধ্যে কতজন লোক কর্মপ্রার্থী, কারণ অনেক লোক আছে যারা বেকার কিন্তু কাজ চায় না, এই শ্রেণীর লোককে বেকারের আওতায় আনা যায় না। যারা কাজ চায়, তাদের বলা হচ্ছে "লেবার ফোর্স"। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যারা বসে আছে তারাই প্রকৃত বেকার। তাদের অঙ্কের সন্ধান করাই সরকারের আশু কর্তব্য।

যারা কর্মস্থানে কাজ করতে তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নিজের বাড়ি, (২) নিজস্ব, (৩) নিজের কাজ করে অন্যের (৪) বেতনের কাজ করে। এই তালিকাতে গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে (ইনডাস্ট্রিয়াস স্টেটাস) শ্রেণী বিভাগ করে দেখান হয়েছে।

৩নং তালিকা:—গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ

(শতকরা)

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১। প্রয়োজনীয় কাজ করছে	৫৯·০৭	২৮·০৮	৪৩·৮৮	৫১·৩০	১১·৫৬	৩২·৫৫
২। যারা কাজ খুঁজছে	০·৫২	০·০৪	০·২৯	৩·৪৫	০·৪০	১·৯৯
৩। কাজের লোক	৫৯·৫৯	২৮·১২	৪৪·১৭	৫৫·০৫	১১·১৬	৩৩·৪৪
৪। যারা কাজ চায় না	৪০·০২	৭১·৮৪	৫৫·৭৭	৪৬·৯৯	৮৮·০২	৬৩·৪১
৫। [illegible] যায় নাই	০·০৯	০·০৪	০·০৯	০·০৭	০·০২	০·০৫

উপরের তালিকা থেকে বেকারের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে বোঝা যায়। শহরে পুরুষের মধ্যে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৩·৪৪ ভাগ আর গ্রামে মাত্র ০·৫২ ভাগ, স্ত্রীলোকের মধ্যে গ্রামে বেকারের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু শহরে এর ভাগ ০·৪০। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় (১) লোক বেকার হয়ে পড়লেই গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে, কারণ শহরে কাজ পাওয়ার আশা অনেক বেশী। (২) গ্রামে বেশীর ভাগ অশিক্ষিত লোক থাকে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় চাষের কাজ/ বৈশাখ ভাগ লোক শহরে কিছু না কিছু চাষ করে, এইজন্য তারা বেকারের পর্যায়ে আসে না, কিন্তু তারা বছরে বহু সময় বেকার অবস্থায় থাকে, (৩) গ্রামে মেয়েরা চাষের জন্য বাড়ির কাজ করে, কিন্তু শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, সেইজন্য মেয়েরা

কাজ চায়। ৩নং তালিকা থেকে দেখা যায় শহরের বেকারের সংখ্যা বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে মোট লোকসংখ্যার ৪৩ ভাগ যারা গ্রামে আর ১৭ ভাগ যারা শহরে এই ভাগ অনুযায়ী গ্রামের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ কোটির ৯৬ ভাগ শহরের ৭ কোটির ২·৫। এই লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেখতে পাওয়া যায় যে গ্রামে পুরুষের মধ্যে বেকার সংখ্যা গ্রামে ও শহরে মোট ১১ লক্ষের মত। ৫ বছর পরে সংখ্যার মধ্যে বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে যারা বাড়িতে কাজ করে, বা বছরে কিছুদিন কাজ করে বা ভাল ইত্যাদির বন্ধ সম্পূর্ণ চাষবাস করে যদি কর্মপ্রার্থী লোকের হিসাব করতে হয় তা হলে তার সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। ১৯৫৬ সনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন দেখা গেছে যারা বসে আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ১৯৫৬ সনে এই সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। অবশ্য ২, বছরে এই সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনার শুরু বেকারের সংখ্যা এইরূপ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬ সাল থেকে, এই পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। পরিকল্পনা শেষ হবে ১৯৬১ সনে। সরকার আশা করেন এর পর বেকারের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাবে।

গ্রামে ও শহরে যারা কাজ করছে তাদের শ্রেণী বিভাগ কী রকম? কারণ ঐ বেকারদের কাজ দিতে হবে, কী ধরনের কাজ সৃষ্টি করতে হবে তা জানা প্রয়োজন। শহরে এবং গ্রামে সরকারিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু হয়েছে যে এরই ধরনের কাজ চালানো সম্ভব নয়। ৫নং, ৬নং এবং [illegible] তালিকায় এই প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে।

৫নং তালিকা:—গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)।

বয়স	গ্রাম	শহর
০—৬	০·০০	০·০৮
৭—১৫	১১·৫৯	৯·৭০
১৬—২৩	৩১·৬৮	২৮·২৬
২৪—৩১	৬৭·৫৯	৩৭·৩০
৩২—৩৮	৭১·২৮	৫৯·৫৭
৩৯—৪৬	৭৪·৯০	৬১·৬১
৪৭—৫৬	৫৫·০১	৬১·০৫
৫৭—৬৬	৬১·০৯	৫৯·২০
৬৭—৬৯	৩২·৫৬	৪৯·২৩
৬২——	১৯·৫৪	১৫·৩০

এবং তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যায় গ্রামে ছয় বছর থেকে ছেলে কাজ করতে আরম্ভ করে তার কাজ করে যায় অনেক বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। ৭-১৯ বছরে গ্রামে ৫ জন করে একজন গ্রামে ১১ জন তার বয়সের ভার ৭ জন। ৬২ বছরের বেশী বয়সে যারা কাজ করে শতকরা ১৭ জন আর শহরে কাজ করে ১৫ জনের মত।

৭নং তালিকা:—নিযুক্ত লোকের শিক্ষার হার হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

শিক্ষার মান	গ্রাম	শহর
অশিক্ষিত	৭৯·৬৯	৪৫·৫৭
অর্দ্ধশিক্ষিত	১৯·৭০	২৪·৩৭
শিক্ষিত	০·৫৭	১০·০৭

পত্রিকা-বিক্রয় [illegible] প্রয়োজন
[illegible] ও [illegible] জন্য
[illegible] হয়ে [illegible]
[illegible] আছে।
[illegible] সহ যোগাযোগ করুন
বিক্রয়াধ্যক্ষ
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬নং [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ৩৫-২৩৬৬

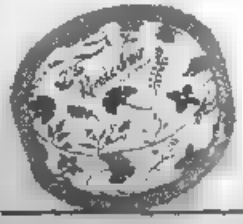

রেকোকল্পীর
ফেস পাউডার
মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
রেডা কেমিক্যাল ● কলিকাতা—১

গ্রামে প্রশিক্ষিত লোক কাজ করে প্রস্তুত শতকরা ৮০ জন আর শহরে করে প্রস্তুত ৪৬ জন, প্রশিক্ষিত অথচ অশিক্ষিত লোক কাজ করে গ্রামে শতকরা ২০ জন আর শহরে করে প্রায় ৫১ জন।

৯নং তালিকা গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা ১৫টি টাকা দিয়া বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

ধবলের, অসাড়তা, নখ ও দন্তের কৃষ্ণতা, বিশেষ **চর্মরোগ** দুষ্টি, স্ফোট, বৃণাদির দাগ কুৎসিত চেহারাদের ৩০/৩২ দিনে নিরাময় করা হয়।

ইহাই রোগী পরীক্ষা করুন।

২৩ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত মেসার্স ডিকিনসন

পণ্ডিত এস শর্মা (নম্বর ৫—৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ বাস্তিজনিত শুভাশুভ সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও স্ত্রীলিঙ্গ সহ ৸৹ টাকা পাঠাইয়া জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতবংশীয় জ্যোতিষ-সম্রাট—সময় ৭,, শনি ৫,, সন্ধ্যা ১১,, বেলা ১২,, সকাল ১২,, অবর্তমানে ৭,, **সাক্ষাতেরদের ব্যবস্থা চিঠিপত্রী**—১০৲ টাকা।

- জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাথ বিদ্যারত্নের সহিত দেখা হয়। পত্র আসে চটিল।

ঠিকানা—**অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিষসঙ্ঘ**

পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

রোগের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ

(শতকরা)

কৃষি	৪৪·২১	২০·৫২
শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি	১০·৮২	৪৭·২৭
যানবাহন চলাচল	৩·৮০	৭·৬৫
অন্যান্য	৪·১৭	২৩·০৪

৯নং তালিকা—গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত শতকরা ৮৪ জনের অধিক লোক কৃষিতে কাজ করে তার পরে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি কাজে শতকরা ৮০ জন লোক কাজ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শহরে ও গ্রামে কাজের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

যদি এই বিপুল সংখ্যক বেকার [illegible] কাজের সংস্থান করতে হয় তা হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে ও [illegible] খুবই শক্ত কিন্তু তার উপায় সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করব।

প্রথমেই দেখতে হবে বেকারের সংখ্যা কতে আর খুব বেড়ে না যায়। ১নং তালিকাতে দেখান হয়েছে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে [illegible] প্রায় ৩·৫০ কোটি। এই হার কমাতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারত সরকারকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। গ্রামে শতকরা ৮৪ জন লোক চাষের উপর নির্ভর করে। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও মাথা পিছু কমে যাচ্ছে। বেকার লোকেদের আর চাষের জমি দেওয়া সম্ভব নয়, বরং চাষের কাজ থেকে কিছু সংখ্যক লোককে অন্য কাজে নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদের কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রসার করা প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের প্রসার হলে গ্রাম থেকে আর লোক শহরে [illegible] আসবে না।

কুটির ও ক্ষুদ্রাকারে শিল্প পরিচালনা করা যায় যেমন (১) মৃৎশিল্প, (২) হস্তশিল্প ও সরঞ্জাম, (৩) কাঁসারিশিল্প, (৪) কাঁচা পাকাদি, (৫) বিবিধ। বস্ত্রশিল্প বলতে মিলজাত কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে না, হস্তচালিত বা বৈদ্যুতিক তাঁতে প্রস্তুত জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এই আওতায় আসে (ক) রঙীন বা সাদা লেস, ফিতা, (খ) হোসিয়ারি দ্রব্যাদি, (গ) পাটের কাজ। যেগুলির রপ্তানির জন্য [illegible]। কাষ্ঠ-সমস্যার প্রতীকারে গ্রামে গৃহনির্মাণের অনুকরণে ও মালপত্র, দরজা জানলার প্যানেল ও ফ্রেম। কাঁচা পাকাদি বলতে মোজাইক বাঁধাতে বাবহারের জন্য ধাতব পাতটি। বিবিধের মধ্যে অনেকগুলি বলা যেতে পারে, যেমন দেশলাই তৈরী, কাগজ বস্তা সরবান তৈরী, শিল্পে বাবহার্য চুনাপাথর তৈরি। এই ধরনের ক্ষুদ্রাকার শিল্প যদি গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে তাহলে গ্রাম থেকে শহরে লোক চলে যাওয়া বন্ধ হবে। গ্রামে নতুন নতুন কাজের সন্ধান পেলে, গ্রামগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। সরকার [illegible] বিষয়ে অবহিত আছেন, [illegible] ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদে বেশ মোটা টাকা ধরচ করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত [illegible] তেমন ভাল ভাবে এগোয়নি। গ্রামবাসীর মধ্যে [illegible] কাজের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা দলে দলে কুটিরশিল্পে মন দেয়। এ ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় প্রথার [illegible] করার প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

শহরে সরকারের অধীনে-চালনা শিল্পের [illegible] প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর এ বিষয়ে সরকার খুবই সচেতন এবং অনেকগুলি ভারী শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এ কাজের প্রসার অনেক হবে। বেসরকারী বিভিন্ন ভারী শিল্প সংস্থাগুলি যতদূর সম্ভব জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যমে ভারী শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।—(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (২) গ্রামে কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সমবায় চাষ ও (৩) পার্বতিত্য দেশের নতুন ভারী শিল্প সংস্থা গঠন ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ।

তিন দিকে জল

সমরেশ বসু

আজ সকলের কৌতূহল মিটেছিল লোকটার সম্পর্কে। মেটাল খেলানীর।

কেন এমন হয়, লোকটার সম্পর্কে আর কৌতূহলী হয়ে কোনো লাভ নেই জেনে কেউ হয় না। কারণ তাহলেও লোকটাকে ঠিক ঠাহর পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু খেলানীর কৌতূহল কি-না সে জানে। ওর চোখে একটা খেলার ইশারা কেমন যেন হাতছানি দিয়ে ফিরতে লাগল। লোকটাকে দেখলে খেলানীর ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটি বন্দুকের ছিদ্রের মত হাসির টানে বাঁকে। কালো দুটি টানা টানা চোখের তাঁতি সুতো ধনুকটার, জলদুকরের তপ্পালি সংকেতের মত কি একটা কথা যেন শুধু বলার জন্যে টানটানির চাপা পড়ে থাকে। কাঁপে, থিরথিরিয়ে ওঠে। নতুন খোলস-ছাড়া সাপের মত তার কালো রঙের ছটা শুধু চলকে যায় না। লোকটার কাছে এলে, খোলস-ছাড়া সাপের মতই তার গাঁতি খসে নিরস্ত্র হয়ে ওঠে।

শ্যাওলাঝুরাণী কুলকক্ষে মিলিয়ে খেলানীর রূপ যাচাই চলবে না। সাক রূপে এমন কিছু নেই। সব মিলিয়ে একটা নিরালা নদীর ঢঙ। তার খবর কেউ রাখে না, কিন্তু পাহাড়ের ঢলটা নেমেছে অনেকদিন। বেরে যাবার পথে কোথায় যেন থমকে গেছে। সেখানে একটি প্রতীক্ষমান আবর্ত পাক খাচ্ছে প্রায় বাইশ চব্বিশের গহীনে।

আদিবাসী নাকি ছিল। এখন এই বাদা অঞ্চলের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেছে পুরো-পুরি। কোন্ পুরুষে এসেছিল কোথা থেকে, তার হিসেবনিকেশ জানা নেই খেলানীর। ওর মা ছিল এক জোতদারের কাছে এই জলপুরের বাদাতেই। বয়স হয়েছে এখন। জ্যোতদার ঘর করে আজার ঘর একটু জায়গা দিয়েছে জীবনস্বত্ব স্বরূপ। মা ঘরে এখন কুলিমজুরি করে।

বাদায় যেমন করে আদিবাসীরা।

খেলানী এখন পুরোপুরি বাসাবনের মেয়ে। এখানে লাল মাটি, চুড়ো পাহাড়, বুড়ি অরণ্য নেই। এখানে কালো মাটি, সোনা জল আর সাপ-চকচকে কালচে সবুজ অরণ্য। সুন্দরি অর্জুনের কোমরে কোমরে হেতাল আর তোলপাতার জলসা। সেখো আর কেওড়ার পায়ে পায়ে নিম কটারির ঝড়। দিগন্ত জুড়ে আবাদ।

দুলাল সেরেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল খেলানীর। জাতের লোক ছিল সে। সব কালেও কেউ মরে না, সেই বিচ্ছের জমাতে দুলাল যায় গেল। সাঙা করবার লোকের অভাব ছিল না। চাট কাপড় সেরের মাদুরও

পেশয় খুলো ছিল চারপাশে। কিন্তু ওই লোকটাকে দেখে খেলানীর কুল জানো জাগে।

প্রথম প্রথম অবশ্য জলপুরের গঞ্জে লোক বাঁকে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই থেকেই শুরু। তারপর একদিন গঞ্জ থেকে হাইজ-কলেক্টর পুরিয়ে লোকটা প্রস্থিত। লোকটার মধ্যে কিন্তু ওকলক্ষ করবার উপায় নেই সন্ধ্যালোক হয়ে পড়ে। নজর হতে পারে, চুলে বোধহয় তেল দেয় না কোনো-দিন, না দিক ক্ষতি নেই। তাতেই লোকটাকে মানিয়েছিল। কালকোঁচ ধুতি, সেটা কোনদিন ফর্সা থাকে, কোনদিন থাকে না। গায়ের জামার বরাবরই দুটো হাট করে খোলা। লোকে বলে মেরেধেরে বুকের দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। লোকটির ক্ষেত্রে সেটা উল্টো। তিরিশ হতে পারে, চল্লিশ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। দশটি বছর হেমাকুল পাহাড়ের নানান আবাদে জানাচে জায়ের করে রেখেছে। চেহারায় তেমন বিশেষত্ব কিছু নেই। আর দশটা ভব-ঘুরের মতই। গায়পাতলাইন একটি ধূসর পাহাড়ের মত। তার গায়ে পুথিবীর বয়সের দাগ কতখানি পড়ে, ঠাহর পাওয়া যায় না সহসা। কেবল চোখ দুটিতে কী এক চুম্বক আছে। একটি বুড়াগত অচেনা হাতছানি

মত কী যেন লক্ষ্য করা যায়। চোখে চোখ পড়লে তাই একটু লক্ষ্য করে দেখতে হয়। দেখতে দেখতে হয়তো সময়ে হাতছানির ইশারায় বুঝি পা বাড়াতেও ইচ্ছে করে। বাড়ালে তা হয়তো কোথায়, কে জানে। ওই চোখও তা জানে না। পা যে বাড়াবে, সে হারিয়ে যাবার জন্যেই বাড়াবে।

লোকটা দৈনিক আবার ওই নুনের এসে হাজির, খেলনারীর পা আর এক মুহূর্তের জন্যে হতে চাইল না। আসলে খেলনারীর চোখের কোণে যে জগদ্ধাত্রীর গুপ্তলিপি-সংকেতের মত কী একটি যা জানার ইশারা খেলছিল, সেটা হারিয়ে যাবার ইঙ্গিতই সংকেত।

যাদ জানলে তানিচারি, খেলনারীর না। যাবুর সঙ্গে ঘর করবে, তাতে ঘোর হয় আপত্তি ছিল না তানিচারির। নয় তো জাতের লোকের সঙ্গে সম্ভব। কিন্তু এই লোকটিকে ছেড়ে সারা জগদ্ধাত্রীর ঘাট আবার মানুষেরই। বাবু নয়, চাষা নয় যে-মানুষের ঠিকানা নেই, তার কড়া নাড়বে কোথায়?

জগদ্ধাত্রীর পল্লীর লোকেরা লক্ষ্য করেছিল খেলনারীর ছটফটানি ইশারাটা। মন দেয়নি। লোকটিকে নিয়ে তারা আর মাথা গলায় না।

এক সময়ে গোটা জগদ্ধাত্রীর আবাদ গড় ঘামিয়েছে। লোকটার নাম বুঝি ছিরণ। প্রথম যখন এসেছিল জগদ্ধাত্রী, তখন সে ছিপছিপে যুবা। মস্ত চওড়া কাঁধ আর মানুষ নাকি। লগে এসেছিল ভাসতে ভাসতে। জগদ্ধাত্রীর মা-ভাসানী ঘোটালে কয়েকদিন থাকল। তারপরে দেখা গেল, ডাঙার কাবুর ডিসপেন্সারিতে ওষুধ তৈরী করছে।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ভবাভাঙা দুনের মনে হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা আপনার মধ্যপথে থামাই। পড়াশোনা করেছেন নাকি?

ছিরণ। বলে, ওসব কিছু নয়। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে ওইটুকু বাঁচি। কিছু জানা হয়ে যায়। তারপরে আবার দেখা গেল লগের টিকাকার বাবু হয়ে বসে আছে ছিরণ। কিন্তু কত-ই বা কর্তদিন। লোকের মাতকা গ্লোকপ্রসাদ লাহাকে করল কিছুদিন। হয়তুয়া ফোর্টের উকিলরা জগদ্ধাত্রীর ছিরণবাবুকে চিনে ফেলেছিলেন। এক বাকে বলে দিলেছিলেন তাঁদের নিজেদের মক্কেলদের, যা ঘটবে, অমনি ওই ছিরণটির সঙ্গে পরামর্শ করবে তারপর আমাদের কাছে আসবে। আউটের জ্ঞান ওর জবর।

কিন্তু পাওয়া যাবে কোথা করে তাকে? সে হয় তো তখন নদীর ওপরে মাঝি-মাল্লির সাঁকিসের ছোটর চালাচ্ছে। হাটে যা চালায় ইতালিম। শীতের দরমুজের তরমুজের সঙ্গে গাইডটে যাবে কে?

ইংরেজী হাতের লেখা নাকি চমৎকার। অনেকের অনেক দরখাস্ত লিখে দিয়েছে। এমন জমজমাটের সময় হেঁকি করে দেখ। জগদ্ধাত্রীর মাস্টারখানি, সঁকলের গোটা জমাটে তার হাতটিও বুঝতে পাবে না।

তারপরে যদি দেখা যায়, জগদ্ধাত্রীর গঞ্জের এক পুরো-মাতাস-লোক দুপুরে, বাজারের মেয়েপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে দুনিয়ার গল্প ফেঁদেছে লোকটি, তাতে [redacted] হবার কিছু নেই।

তবু ইজ্জৎ আছে। ডাক্তারবাবু হাত তুলে নমস্কার করেন। তাঁহার ডাক্তারবাবু কুশলে কিন্তু সমীহ করে কথা বলেন।

যে যাহই সমীহ করুক, তানিচারি জোকা নয়। বাকার কাজো মাটির একটি টুকরো নেই, এমন লোকের কাছে মেয়ে ছিড়তে দেবে কি সে।

কিন্তু ছিড়তে না দেবার ক্ষমতা তানি-চারির নয়। জগৎের গুরুতেই বাঁধ দিয়ে আটকানো যায়। বন্যাস্রোতকে বাঁধা যায় না।

ছিরণ ফিরে গেল। সন্ধ্যার আঁধারে যা ঢাকা দিয়ে খেলানীও কিছু দিল তার।

ছিরণ তখন বাঁধের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ওপারের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনে এসে দাঁড়াল খেলানী। হাতে একটি ছোট পুটুলি তার। গলার রুপোর হারগাছটি খোলা ছিল। পরে আসতে ভোলেনি সে।

ছিরণ তার আপাদমস্তকে লক্ষ্য করে দেখল। খেলনারীর সর্বাংগে [redacted] শেষ লক্ষ্যটা এক্কেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঠোঁটের হাসিটুকু পাঁত দিয়ে ধরে রেখেছে চেপে। দু চোখ কিন্তু যেন হাতড়ে ফিরছে ছিরণের বুকের মধ্যে। ফিসফিস করে বলল, পালাবে এইটি।

ছিরণ ফিরে তাকাল একবার নদীর দিকে। ভাটা সমান নদী সমুদ্রে যাচ্ছে। কিন্তু তার মুখের চেহারা [redacted] পরিবর্তন হল না। শুধু চোখ দুটি যেন আরো গাঢ় গভীর হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। —বাঁশি, বাঁশি কই?

খেলানী ছিরণের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নচিহ্নিত ভংগিতে ঘাড় নেড়ে জানাল, বাঁশি নেই। ছিরণ উত্তর দিকে, বাঁধের নীচে ঘোলা গঙ্গের স্রোতের ধারে একটি নৌকো দেখিয়ে বলল, ওই নৌকোটায় গিয়ে বোস। সুকাঁদি মাঝি আছে। আমি আসছি।

—কোথা গো?

উৎকণ্ঠিত চাপা খেলানীর গলায়।

ছিরণ বলল, কিন্তু চরমাঠীর ধান চালানের কাজে হাত দিয়েছিলাম। বলে আসি, থাকব না, নৌকোটা খুনসিকে পড়ে যাবে নইলে।

বলে ছিরণ বাঁধের মাঝে গঞ্জের চালা-ঘরের ভিড়ে হারিয়ে গেল। খেলানী সেই দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভীরু পায়ে সুকাঁদির নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল।

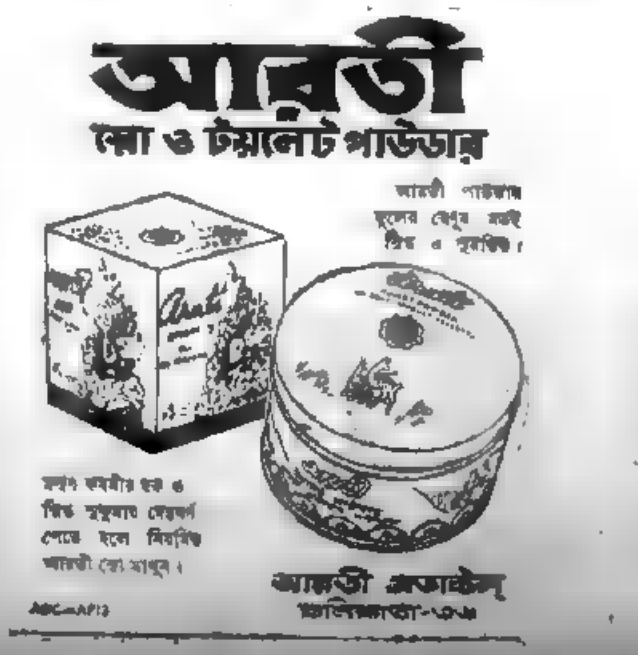

কিন্তু নৌকোয় উঠল না। হিরণের [redacted] দাঁড়িয়ে রইল।

এখন বড় নিরালা। নৌকো নেই, লঞ্চেরও সময় নয় এখন। আর এ নদীতে লোক নামে না। রূপোলি-সবুজ কাশবনেরা আছে এই স্তিমিত নদীর জলে। তবু চন্দ্রাভাখানি ছবিকে দেখতে ভাল লাগে।

সুরীন নৌকোর গলুয়ে চুপ করে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। খেলানীকে একবার ছবিকে দেখছে মাত্র। কিছুই বলেনি।

একটু পরেই হিরণ এল। বলল, উঠিলাম?

খেলানীর চোখে এর মধ্যেই অভিমানের ছায়া। বলল, তুমি চলে যেতেছিলে যে।

বলে হিরণের দিকে তাকাল। হিরণ হাত বাড়িয়ে খেলানীর হাত ধরে বলল, আয়। নৌকোয় উঠ, নিদেশ দিল হিরণ, মাঝি-খানির ঘাটে চল সুরীন।

খেলানী গলুয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মা খুঁজতে আসবে হয়তো এখুনি। পরে সুরীনের কাছে খবর পাবে। তখন এই ঘাটে বসে কাঁদবে, গাল দেবে।

খেলানী ফিরে তাকাল হিরণের দিকে। হিরণ বলল, ডোঙায় হাঁসি খেলানী?

খেলানী বলল, জানি না।

হিরণ বলল, সহরে যাবি?

—কোন্ সহরে?

—কলকাতায়।

খেলানীর দুই চোখে কলকাতার রঙ্গমহল ঝলমল হয়ে জ্বলে উঠল। বলল, যাব।

কলকাতা কোত্তেকীর দেখেনি খেলানী।

হিরণ জিজ্ঞেস করল, পাটলিতে টোর কী আছে?

—দুইখান কাপড়, দুইখানা জামা।

হিরণের ঠোঁটে একটু হাসির আভাস ফুটল। তার চোখে মুখে কোথাও একটি চুরের নিয়ে পালাবার ত্রাস উত্তেজনা নেই। যেন জানেনা সব যেন ওই চোখে আর কালো-কালো চুলের অন্ধকারে মিলে আছে।

নৌকো থেকে পাড়ে ওঠবার সময় খেলানীর হাত থেকে পাটলিটা নিয়ে, নৌকোয় ফেলে দিল হিরণ। বলল, ও কাপড় থাক্। সহরে গিয়ে নতুন কাপড় পরবি। ওগুলো টোর হাকে নিয়ে দেবে সুরীন্, কেমন?

খেলানী হিরণের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে তার বুকের কাছে চোখ এল। এসে তাকিয়ে রইল পাটলিটার দিকে। ওই পাটলিটুকু তার বিয়ের সম্পত্তি ছিল একটি। কিন্তু সে আর হাত বাড়িয়ে নিল না।

হিরণের বুকের আকাশে ডানা মেলে, মাঝি-খানির ঘোড়ায় চড়ে মহকুমা সহরে এল। মহকুমা সহর থেকে কলকাতা।

তখন কলকাতার যে-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল হিরণ, দেখে, খেলানী তার কাপড় টেনে ধরল। বলল, কোথা যাইছ?

হিরণ বলল, ভয় পাচ্ছিস কেন এইখানে আমার বাসা আছে। কড়া নাড়ল হিরণ।

একটি লোক এসে দরজা খুলে দিল।

সামনে ছোট একটি উঠোন, তারপরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

হিরণ দোতলায় উঠল। দোতলার বারান্দার মাথাতেই সাইনবোর্ড ছিল, ব্রুবি হোস্টেল ডাক্তির আপ্ত কাঁচার। চার্জ মডারেট।

কিন্তু হিরণ যে সব ফিরে দেখল না বারান্দায় যিনি চেয়ারে বসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করল, টেডলার সিঁড়িঘরটা খালি আছে নাকি মহেন্দ্রবাবু?

মহেন্দ্রবাবু হাঁ করে দেখছিলেন খেলানীকে। বললেন হ্যাঁ, আছে। কি কি। কিন্তু এটি কে হিরণবাবু?

হিরণ বলল, বউ।

মহেন্দ্রবাবুর লম্বা দাড়িগুলি হিরণের ধাক্কায় টসকে কলাতে লাগল। কপালের ওপর যেন দলা পাকাতে লাগল কালো কালো পাকুড় সাপ।

কিন্তু খেলানীর ত্রাস পেয়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন কিরে করলেন কবে?

—এই দু চারদিন।

—দু চারদিন। এই ছাড়ু ছাড়ে?

—হ্যাঁ। নিন্, চাবিটা নিন।

বলে সে টেবিলের কাছে গেল। চাবিটা নিতে নিতে মহেন্দ্রবাবু ফিসফিস করে বললেন, দেখবেন, কোনো রকম ঘরণ ফোসফালোর কেস্ হবে না তো। হোস্টেলটিই কিন্তু ভরসা।

হিরণ খেলানীর হাত ধরে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, না, সে ভয় নেই।

সিঁড়ি-ঘরের সরজা খুলে বসিত জানালা হিরণ। ছোট একটি বিছানাও পাটপেতে ছিল সেখানে। গত বছরের একটি ক্যালেন্ডার দেয়ালে, তাতে একটি চেশিনের ছবি।

হিরণ বলল, এই ঘরটার আমরা থাকব। কেমন লাগছে?

একটু ফাঁক কুঠার ন. গ. বলল খেলানী, ভাল।

হিরণ আর একটি দরজা খুলেছে। বাথরুম ছোট্ট ছাদ। কল চাপলে। সেখানে দাঁড়ি কেড়ে খেলানী টাঁকি দিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। তার ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায় বিশ্বিত খুশির হাসিটা একটু, একটু, করে ছড়াতে লাগল। একটু একটু করে সবোপরি একটা ঢেউ খেলে গেল তার কোপে উঠে হিরণের বুকের কাছে মিলিয়ে এল।

হিরণ বলল ভাল লাগছে খেলানী?

খেলানী ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, খুব ভাল লাগিতেছে আমার

হিরণ তাকে বুকের মধ্যে নাগাল দিয়ে বলল, আমরা এখন এখানেই থাকব তা হলে

হিরণকে শুধু, মহেন্দ্রবাবুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাদের। হিরণ পাড়ি ঝুটছে সেবা, তাদের চিকুনি আলতা পাউডার কেনা, কিছু বাদ দিচ্ছে না। কিরকম হলেই খেলানীকে নিয়ে হয় সিনেমায়, না হয় সিনেমায়।

মহেন্দ্রবাবু, ডিরেকলে রুমমেট হিরণ একটি ভয়ঙ্কর লোক। মাঝে মাঝে আসে। দু এক রাত থাকে। আবার চলে যায়। শোনা যায়, কাগজপত্রে নাকি কী সব লেখে। অর্থাৎ পড়লেখিকে।

কিন্তু বিয়ে? মহেন্দ্রবাবু ডিরেকলে হিরণের মুখে শুনে এসেছেন, মেয়েমানুষের সঙ্গে? মাপ করবেন মহেন্দ্রবাবু। ওর ভয়ো নেই।

সেই লোক হিরণ? তাও আবার ওই জরদ্গবের মত দেখতে একটি মেয়ে। খালি হাসে নয় তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এসব মাসে গেল না, খেলানী ছাপিয়ে উঠল।

একদিন বলল, চলো আমার টিকছে না এখেনে। আর কোথাও চল।

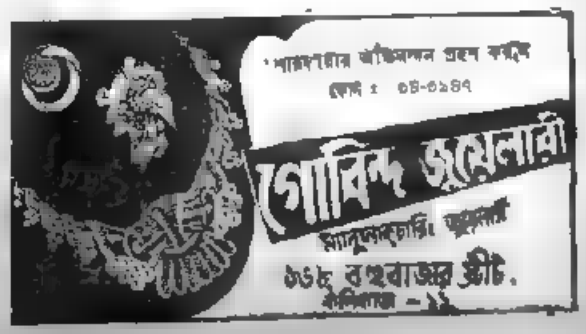

হিরণ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল খেলানীর দিকে। এর মধ্যেই একটু যেন ফর্সা হয়ে গেছে খেলানী। আবেগে চলচল করছে। চোখের তারায় একটি চুলুচুলু আবেশ।

সে বলল, যাবি?

খেলানী বলল, হুঁ।, আর হোথেও চল।

হিরণ বলল, আর দুটো দিন সেরী কর। তারপরে যাব।

সুদিন হিরণের নাওয়া খাওয়া বেড়াবার সময় হল না। তৃতীয় দিন বাসা ছেড়ে, খেলানীকে নিয়ে বেরুল। কিন্তু জামাকাপড় সব পড়ে রইল।

হিরণ বলল, একটা বড়ুনি শাড়ি দে, আর জামা দে। এগুলো এখানেই থাকুক এখন।

ভোর ভোর বেরিয়ে আবার সেই দক্ষিণের পুনর্যাত্রা দেখে খেলানী বলল, কোথা যাইছ গো?

হিরণ বলল, সাগরে।

—সাগরে?

—হুঁ। আকুলা দ্বীপের নাম শুনেছিস খেলানী?

—না।

—সেখানে আমার এক বন্ধু আছে। শুকুলা মাছের আড়তদার করে। সেখানে যাব।

খুব খুশি খেলানী। বাবু, জগৎপুরে তো নদী মাটোখারির ধারে তো নয়। সাগরে, আকুলা দ্বীপে যাবে।

আশ্বিন মাস। সাগরের চেহারা খুব সুবিধের নয়। কিন্তু মাঝি যখন সাহস করল, তখন পিছনে ফেরবার কারণ নেই।

সন্ধ্যা ঘোঁষে প্রথম ভাটার মুখেই নৌকা ভাসল। রাত্রে নৌকা মাচতে লাগল উথালিপাথালি। মাঝিরা চিৎকার করে নানা-গুলি জনামী দেবতার সঙ্গে কথা বলল।

খেলানী কোসে বমি করে অস্থির। কিন্তু ভোররাত্রেই নৌকা এসে লাগল আকুলা দ্বীপে।

হিরণ যাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিল, সে লোকটির বয়স হিরণের চেয়ে বেশী বলে মনে হল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তাভ চোখ।

বাড়ির ওপরে বাঁশের ঘর। মাথায় ঢেউ-খেলানো টিনের ছাউনি। আকুলা দ্বীপেও বন আছে। সেদিকটায় কেউ যায় না।

লোকটির নাম অধীর। সে ছাড়াও আর তিনজন শুকোনা মাছের ব্যবসায়ী আছে এই দ্বীপে। প্রত্যেকেরই দু তিনটি করে নৌকো, জনা পাঁচ ছয় করে মুসলমান মাঝি আছে।

হিরণ বলল, অধীর, তোর এখানে কিছু-দিন থাকব।

অধীর বলল, থাকতে পারবি?

—কেন থাকতে পারব?

—একলা একলা টিসি।

—খেলানী তো রইল। তবে একলাই যাব বটে। কিন্তু একলাই আসিব। যেখানে যাব, সেখানেই যাবে ও।

অধীরের মুখে একটু অস্পষ্ট হাসির আভাস দেখা গেল। সে খেলানীকে ঘরে বসাল ডেকে। হিরণকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। বলল, তা হলে সারা দেশ ঘুরে এই-দিন [redacted] সেই মেয়েকে খুঁজে পেলি?

—কোন্ মেয়েকে?

—যে তোর মরই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে? তোর ওপর বিশ্বাস করবে?

—বোধহয়।

অধীরের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসি আবার দেখা দিল। বলল, এমন করে বোধ-হয় বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘোষও খোঁজতে পারত।

হিরণ ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, মিথ্যে কথা। থাকতে পারলে নিশ্চয়ই কেরানী বিয়ে করে ঘর করত না।

অধীর বলল, আচ্ছা বিজলী চৌধুরী?

হিরণ বলল, ও-পাখি তো সোনার খাঁচা ছাড়া কিছু চিনতই না।

অধীর বলল, কিন্তু কথা হচ্ছিল তোর সঙ্গে ভাসতে চেয়েছিল।

হিরণের হাসিটা ছুরির ফলার মত চকচকিয়ে উঠল। বলল, মেয়েটার সাহসের তড়ং ছিল খুব। আসলে মেয়েটার ধারণা ছিল, আমায় মত একটা বিকৃতমনা ভবঘুরের পকেটকে ও জব্দ করবে, তারপরে মাথায় আমলা পরিয়ে, মুখে পান গুঁজে দিয়ে, টা টা করে চাকরি করতে পাঠাবে।

অধীর হেসে ফেলল। বলল, তুই দেখছি কিছুতেই আর মত বদলাচ্ছিস না হিরণ। সংসারে থাকতে গেলে, কলা বিক্রীর ছাড়া উপায় কী? একটা বাঁধা নিয়মে কাজকর্ম ছাড়াই বা হচ্ছে কোথায়?

হিরণ বলল, সেইজন্যেই ওদের ছড়াইনি। সংসারের ইচ্ছেমত, ধুলিমাখা হাকতে চাই। সেইজন্যেই খেলানীকে নিয়ে বেরিয়েছি। ও তো আস্তাকুড়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে তুলবে না কাছা টেনে ধরে। বি এস-সি পাস করেছি বলে, চিপসটেন কেটে কেটে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক না হতে পারার জন্য খোঁটা দেবে না। বাঁধা সড়কের ধারে ভদ্রলোক হয়ে বাস করতে চাইনে বলেই বউ করেছি খেলানীকে।

—কিন্তু এটাকে কী জীবন বলে হিরণ।

—প্রতিবাদের জীবন।

—তা হলে রাজনীতি করলিনে কেন?

—সেটাও ওই সব নামী অনামী ভদ্র-লোকেরাই করে থাকেন।

অধীরের শান্ত হাসিটাও মুহূর্তে প্রতিবাদ ও বিদ্রূপাত্মক মনে হল। বলল, খেলানী যদি কোনোদিন বাঁধতে চায়?

হিরণ বলল, ফেলে রেখে যাব।

অধীর প্রসঙ্গ ত্যাগ করল। বলল, আমা-দের মুক্তরানী স্টীমের বাসায় যোগিতা মাসি?

—হ্যাঁ। তোর দাদা বউদি ভালই আছেন। তোর বউদির এখন ছেলেমেয়ে সন্তান, সকলেই ভাল আছে। তুই নাকি প্রায় বছরই এ ব্যবসায় পড়ে রইলি, তোর দাদা বল-ছিলেন।

অধীর বলল, প্রায়টা বাদের ওপর নয়। কার ওপর ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে বসে, ম্যাটিক ফেল করে বারো বছর বিনা পয়সায় খাওয়া, সেটাও আর সম্ভব ছিল না। এই ভাল আছি।

বলে অধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হিরণ বলল, যতদিন থাকি, তোর কাজেকর্মে সাহায্য করব। খেলানী আর আমি, দুজনেই করব। তাদের দরকার বলে আগেই বলিস।

অধীর হেসে বলল, বাঃ। সংসার পাতবার আগেই সংসারী লোকের মত কথা বলছিস যে? তবে কাজকর্ম তুই করিস, তাদের না। দিনে মাইনের লোক তো খত হলেও।

হিরণ বলল, কিন্তু সেটভাতা আছে।

—সেটাও সাতের।

অধীর হাসল।

খেলানী অন্ধকার হয়ে গেল সমুদ্রের মত। তার সেই অন্ধকারে শুধু হিরণই নয়, সাতটা অন্ধকার অধীরের ইন্দ্রিয়গুলো [redacted] সবাই যেন খেলানীর সর্বাঙ্গে এসে এই কদর্য নির্জন অধীরের ধরের কথাটা মনে করতে লেগে গেছে যেন।

মাঝে মাঝে খেলানী মুখ তার করে থাকে। যেমন মুখ তার করে এই অধীরের অন্ধকার।

হিরণ বলে, কি হয়েছে খেলানী?

খেলানী বলে, তোমার মুখে হাসি নাই কেন সারাদিনে? আজি বন্ধুর সঙ্গে কথা, কথা তার কথা?

হিরণ অধীরের অন্ধকার কথাগুলির ওপর বড় বিরক্তা খেলানীর। সে [redacted] হিরণ শুধু তার কাছে থাকুক।

হিরণ আদর করে বলে তুই আমার মুখে হাত চাপা দিলেই পারিস।

হেসে খুব তাড়াতাড়ি কদর্য খেলানীর মুখের ওপর হাত চাপা দিতে গিয়ে হিরণ হঠাৎ বালির ছিটের ব্লাউজের পেট ঘিরে রোদ হড়ানো বালিতে পড়েছে দিয়ে ঢেকে ফেলে খেলানী যেন নিজেকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

অন্ধকার খেলানীর শরীরে তার একটা পরিবর্তন লেখা নিয়েছে এই ঢেকে রাখার মধ্যেই. চোখের কোলে একটু কালি, চাউনিতে একটি ক্লান্তির ছায়া। কালো হয়েছে আগের একটু, সেটা হিরণও হয়েছে। এখানে সবাই কালো হয়ে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় হিরণ আর খেলানী সমুদ্রের ধারে বসে আছে। অধীর তার গ্রামিকের নিয়ে মাছ ধরতে গেছে। এখনো ফেরেনি. যদিও অধীরের ফেরার কথা নয়, তবু সে সবার মনে মনে ভাবছিল।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার। অন্ধকারের আকাশ জুড়ে নক্ষত্রা. দূরে, বহু দূরের উত্তরের কালচে রেখাটা যোধহয় খেলানীর ছিলো। জোয়ার আসার সময়। সাদাদের জলে যে শুভ্রতা, তাকে ভাঙতে আসার সুরটুকু ধ্বনিত। ঝিরঝিরে সো সো শব্দে বাজছে।

খেলানী বলল, কত রাত হো? চু রাত কোথা গেই হইছে গো?

হিরণ বলল, কোথাও নয়।

—কোথাও নয়?

হিরণ বলল, হুঁ খেলানী. এই গোটা পৃথিবীটায় তিন ভাগ জল, এক ভাগ মাটি আছে।

খেলানী যেন হতবাক হয়ে গেল: বলল, তিন ভাগ জল? সা রা গো!

তারপরে খেলানী ফিরে বলল, আমার

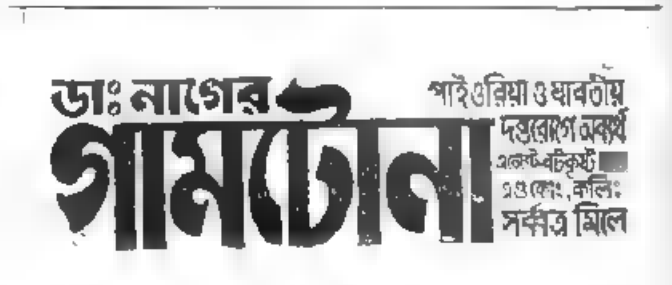

এবার পূজোয় আমাদের বিখ্যাত
ফেব্রী—4 Seasons, 3 Aces,
Florida & 3 Flowers ব্যবহারে
ও উপহারে আনন্দ বেশী করুন।
প্রস্তুতকারক:
মায়ার টেক্সটাইল ওয়ার্কস
ফোন : ৬১—৩১৬১
১২৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তার এখেনে ভাল লাইগছে না, হইলে?

হিরণ বলল, চল যাবি?

—হ্যাঁ।

কোথায় যাবি?

—যেখানে যাবে।

—বেশ। কাল পরশুই যাব।

একটিন পরেই হিরণ প্রবীরের হাতটাকে জোরে আঁকড়ি ধরে টুক্‌ টিপে খোলা কাকে ফিসফিস করে বলল, খেলানী বুন, আমরা কেমন ভিজিকে রেখে বলল কোথা যাবে এখন?

হিরণ বলল, এখন কলকেতা থাক খেলানী, এরপরে বুঝিস, কি চারটিন থাকে, তখন জলপায় চলে যাব।

খেলানী বলল, আমি কিন্তুক যাব না।

হিরণ হকচকে গেল।—যাবিনে?

—না।

খেলানী হাত ধরে কাছে [redacted] মুখ তুলে ধরল। খেলানীর মুখে যেন একটা বিচিত্র রহস্যের ছায়া।

হিরণ যেন ভয় পেল হঠাৎ। বলল, তবে কোথায় যাবি?

খেলানী বলল, জলপুরে।

—জলপুরে?

হিরণের সেই গল্পপড়ালাদীন পাহাড়ের মত ভূকৈলাসগড়ীর মুখ মনিটা হয়ে উঠল সজল, তুই পরশু, আকাশের বাঁধ ভাঙাভাঙি কেন বল তো?

খেলানী জবাব দিল না, নত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল খেলানী। বলল, বলা যায় কিনিক? বুইঝতে পার না?

এই প্রথম স্পষ্ট হিরণ, খেলানী গরবিনী হয়েছে তুইটে ওর এত আনন্দ?

মুখে আরো কঠিন হল হিরণের। সে বলল, কিন্তু আমি তোর সঙ্গে তো সেখানে যাব না। তোর হাতে ওখানে থাকতে পারব না।

খেলানী হিরণের জামার কোচড় খুঁটতে খুঁটতে বলল, তুমি যাওগা, বুইঝস? তুমি যাওগা, আমি ফিরে যাই। মন কইরলে আবার এইস জলপুরে, আঁয়া! আইসবে তো?

হিরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খেলানীর মুখের দিকে। এমন কথা কোনো মেয়ের মুখে সে তার কোনো দিন শোনেনি। শুধু কি রক্তের কোষ ভরে এইটুকু নিতেই তার সঙ্গে এসেছিল খেলানী? এইটুকু নিয়ে ফিরে যাবে আবার সেই আদিমের জলপুরে, পরে গোড়ি বাঁধে। খাটাস [redacted] ছেলে নিয়ে হাসুলে? হিরণকে বাঁধবে না, ডাকবে না, খোরপোষ খেসারত কিছুই চাইবে না!

খেলানী জোর ছাড়ে নিয়ে কলকাতা লোকার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওরা কালিং হইয়ে উত্তরে যাবে। আমি এদের সাথে যাইবা, আঁয়া?

হিরণ যেন মিশিপাওরা মানুষের মত বলল, না।

খেলানী একটু যেন আলতো আশা করল। হিরণের চুলে আঙুল হাত বুলিয়ে বলল, জলপুরে আবার এইস, কেমন?

হিরণ তাকিয়ে রইল। খেলানী নেমে গেল জলের দিকে। একটু পরেই কাপাড়ীদের ছোটো নৌকা ছেড়ে গেল।

হিরণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম পৃথিবীর এক প্রান্ত স্পর্শের এক ফোঁটা সে তার বহু, বহু যুগ যুগান্তরের ফেলে আসা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে শুনতে পাচ্ছে।

টি মার্চেন্টস্ বি, কে. সাহা প্রাঃ লিঃ
পাইকারী ■ খুচরা চা বিক্রেতা
■, কেলাক স্ট্রীট, ১৩১।১এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সেতুর কথা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

১। সরলভাবে বসানো সেতু (simply supported)।

২। সংযোজনী সেতু বা অবিচ্ছিন্ন সেতু (continuous)।

৩। ঝুলন্ত সেতু। এর উচ্চ সংস্করণ ঝুলন্ত সেতু (suspension)।

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

[illegible] ৫০০ ফুট [illegible]

[illegible]

৯। কাষ্ঠ-লৌহনির্মিত সেতু (wrought iron)

৫। ইস্পাতনির্মিত সেতু।

৬। উচ্চ টেনসে ইস্পাতনির্মিত সেতু (high tensile)

৭। কংক্রিটসহ ইস্পাতের সেতু (reinforced concrete)।

৮। সাইপনির্মিত সেতু।

৯। জল-তলের সেতু।

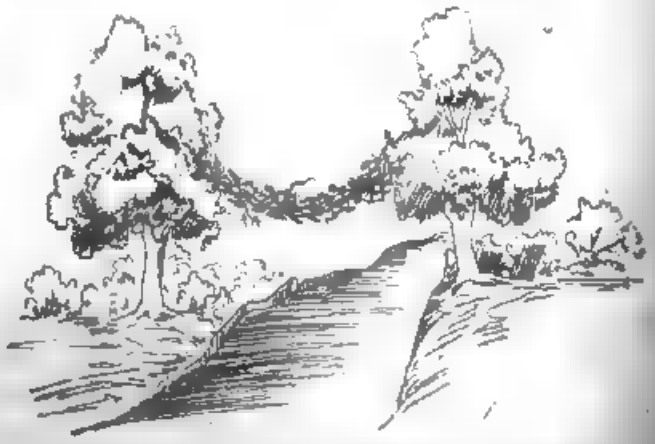

প্রাকৃতিক ঝুলন সেতু

'মানুষ ও দেবতা'

চিত্রাকর্ষক বইখানা একবার পড়ে ফটিনকে মহিমান্বিত দেবের উপহার করুন। শ্রী হট্ট সি ভৌমিক, রিডার ইনস্পেক্টর কো: পো:— কুরুলিয়া কমিশনারী, মধ্য প্রদেশ মূল্য— আড়াই টাকা মাত্র। একত্র তিনখানা লইলে পোস্টেজ লাগে না।

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

'বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধৌত' (Scientifically Bleached) ইহা যেমন নরম তেমনই সবল যার শরীরে সয়।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২
ফোন নং ৫৮—২৯৮৩

১০। ইস্পাত অথবা [redacted] তারের ইস্পাতের তন্তুনির্মিত সেতু (cable wire)।

১১। অগ্রে শক্তিসম্বন্ধ কংক্রীটের সেতু (pre-stressed concrete)।

নির্মাণপ্রণালীর বিভিন্নতার দিক দিয়ে বিচার করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে সেতুকে বিভক্ত করা যায়—

১। ইস্পাতের ঢালুনির্মিত কড়ি বা পাটি গার্ডার (plate girder)।

২। সচরাচর পরীক্ষামূলক ইস্পাতের কাঠামো [redacted] রিভেট্ট দ্বারা ট্রাস (riveted truss)।

৩। পিন-সংযুক্ত লোহ কাঠামো বা পিন দিয়ে জোড়া ট্রাস (pin-jointed truss)।

সেতুনির্মাণের সৃষ্টি প্রধান অংশ থাকে— একটি উল্লম্বভাবে, অপরটি উপরে সুলভান গাঁথনি। ভার বহিবার সাধারণতঃ যাকে সেতু বলে থাকি। বহু উত্তরের সেতু-নির্মাণে সবচেয়ে সমস্যা সেই সেতুনির্মাণ সম্ভব যার একটি সেতুস্তম্ভের বায় উপরের একটি ছয় নির্মাণের ব্যয়ের সমান। এই কারিগরিক সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

রৌহবন্ধ ও রজ্জুবন্ধ সেতুর বিভিন্ন অংশে স্থাপনের উপর সেতুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১। শিরোগামী সেতু বা ডেক শ্রেণীর (deck)

২। অর্ধ-মধ্যগামী সেতু (half-through)।

৩। পূর্ণ অন্তর্গামী বা পূর্ণ মধ্যগামী সেতু (full-through)।

এ ছাড়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল সেতু আছে। কোথাও বা সেতু বাড়ির মত চালা দিয়ে ঢাকা কোথাও বা সেতু খোলা যায়, যার অর্ধ উচ্চতাকে ডাইনে-বাঁয়ে পাক দিয়ে সরিয়ে যেমন পোর্ট কমিশনারের সাকুলার রোডের সেতু, কোথাও বা কাৎ করে উপরে উঠিয়ে জোড়া বা সমকোণ ভাবে খাড়া উপরে তুলে, যেমন বাল-বাজারের খালের মুখের সেতু। কোথাও বা করা ভাসিয়ে ভাসমান পুল তৈরি করা হয়, যেমন প্রাচীন হাওড়ার সেতু ছিল।

এখন বিভিন্ন রীতিতে সেতুকার ভিত্তির নিক্ষেপণের প্রক্রিয়ার উপর সেতু বিভাগের কথাই শুধু আলোচিত হবে।

১। সহজভাবে বলানো সেতু

একটি কড়ি অথবা এই জাতীয় ইস্পাতের গার্ডারকে দুটি সরলোমক সেতুস্তম্ভের অথবা ভীরস্তম্ভের উপর সমস্ত করলে সেতুর ভার সমভাবে দুই স্তম্ভের উপর পড়বে। এইরূপ সেতুকে সহজভাবে বলানো সেতু বলে। ইস্পাতে তৈরি এইরূপ সেতুর উত্তাব ৬০০ ফুট; নিকেল-ইস্পাতে নির্মিত হলে ৭৫০ ফুট পর্যন্ত করা যায়। ইঞ্জিনিয়র ফ্রেডেরিক ফ্রেডেরিকো নদীর উপর সেতুটি ৭২০ ফুট উত্তারের, ফ্রান্সের নরমেন্ডিয়া প্রদেশে প্রায় ৩০০ ফুট উত্তারের ক্যান্টনির্মিত সেতুও দেখেছি। পাটি গার্ডারে ১০০ থেকে ১২০ ফুট পর্যন্ত ব্যবধানের সেতুনির্মাণের রীতি। পাটি গার্ডারের গভীরতা উত্তারের ১।১২ হইতে ১।২০ ভাগ সাধারণতঃ হয়।

২। সংযোজনী বা আর্টিকুলেটেড সেতু

যদি সেতুর কাঠামোকে তিন বা ততোধিক আকারগ্রাহী সেতুস্তম্ভের উপর স্থাপন করা যায়, তাকে সংযোজনী সেতু বলে। যদিও সেতুর ভার সমভাবে দুটি বা সেতুস্তম্ভে নাস্ত করা যায়, কিন্তু মধ্যস্তম্ভের অবাধগতির দরুণ লোহ কাঠামোর মধ্য-স্থলে সর্বাধিক বঙ্কীকরণের (Bending Moment) বহু হ্রাস ঘটে ও বঙ্কীকরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কংক্রীটের সেতুতে এই প্রণালীর সুযোগ নেওয়া হয়।

৩। অর্ধবক্রীয় বা বৃত্তাভাসীয় সেতু

এর আকৃতি প্রাচীন কালের কড়ির স্বরূপ-জনলার উপর খিলানের মনস্তত্ত্বে, কিন্তু আকারে বৃহৎ। বর্তমানে নরম-জনলার উপর লিন্টেল সেতুরারই প্রচলন অধিক। যা ইস্পাতের, প্রস্তরের, ইস্টকের অথবা কংক্রীটের (সাধারণ অথবা লৌহ-সংযোজিত) হয়ে থাকে। এর ভার কখনও কখনও এবং কখনও দ্বিধাকভাবে নাস্ত হয়। যেখানে ভূমিরবর্তী ভূমি সেতুর পদস্তম্ভ ঢাল সহজে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে সেতু নিম্নের জমি ও নদী থেকে ভাল উঠেছে এবং যেখানে সহজে সেতু-পদস্তম্ভ নদীগর্ভে নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সেখানে বক্রীয় অথবা ঝুলন সেতুর সাহায্য গ্রহণ করার রীতি। তিন হাজার ফিট উত্তারের বক্রীয় সেতুনির্মাণ সম্ভব। নিউ ইয়র্ক সহরের হেলগেট সেতুটি ১৭৭ —৬" উত্তারের দুই স্তম্ভ-শীর্ষবিন্দু ভারের উপর থেকে ১৩৫' ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত বক্রীয় সেতু। এর ইঞ্জিনীয়ার অ্যালফ্রেড মেরেডেথের এটি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। দুই স্তম্ভশীর্ষের সেতু যোগাযোগ দিকে যাওয়ার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তিন স্তম্ভবিশিষ্ট বক্রীয় সেতু আরও সুবিধাজনক। তিনটি স্তম্ভের দুটি দুই ফাঁকের এবং তৃতীয়টি নীচে সংযুক্ত।

জর্জেসনী নদীর উপর ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে প্রসার সেতুটি নদীগর্ভ হইতে ৪৩০ ফুট উর্ধ্বে, ৫০০ ফুট উত্তারের সেতু। এর নির্মাণকাল ১৯০৭।

হেলগেট সেতুর দীর্ঘ ব্যাসের বক্রীয় সেতুর সৌরব অ্যাস্টোরিয়ার মিডটাউন হাওয়ার্থ সেতু হরণ করে। এর উত্তার ১৩৩০ ফুট ও জলার পথ নদীর জলের উপর হতে ১৭৫'

ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত। সাধারণ নির্মাণ বিভাগের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার ডঃ ব্লাডফীল্ড সাধারণ বিন্যাস ও রাজস্ব চলমান এর বিস্তৃত পরিকল্পনা ও গণনার জন্য দায়ী। প্রতি ফুটের ওজন ৫৭,৫০০ পাউন্ড। ১৯৩১ সনের মে মাসে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওই বৎসর নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে কিলব্যানকুল নদীর উপর বেয়নী সেতু খোলা হয়—এর উচ্চতার মান ১৩৫২ ফুট ১ ইঞ্চি। অর্থাৎ সিডনি সেতুর চেয়ে ২—১" বেশী। এটির প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ও এইচ অম্মান। শ্রী অম্মান প্রথমে জিনভেনহুলের অফিসে কাজ শুরু করেন। যে সোনার কাঁচি দিয়ে বেয়নী সেতুর উদ্বোধনপর্বের ফিতা কাটা হয়েছিল, সেই সোনার কাঁচি ১৯৩২ সনের মার্চ মাসে পশ্চিমের উপর প্রথমে সিডনি হারবারের সেতুর উদ্বোধনপর্বের কাজে লাগে। সিডনি বন্দরের সেতুটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী সেতু ■ সবচেয়ে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করা হয়েছে এর উপর।

ফ্রীম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার সাবী নদীর উপর ১০৮০ ফুট উত্তরের ব্রীকলিমাউ বৃত্তীয় সেতু নির্মাণ করেন। এই সেতু-নির্মাণকার্যে 'ক্রমেডর ইস্পাত' ব্যবহার করা হয়। এটি তৃতীয় দীর্ঘতম বৃত্তীয় সেতু। এই সেতুগুলি বৃত্তীয় সেতুর ঊর্ধ্ব-মধ্যগামী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং দুই বৃত্তীয় অংশের মধ্য দিয়া ফ্লোরেন্স ও চালবন্ধ স্পর্শকৃত। কিন্তু মিলানের শীর্ষ দিয়ে পথ প্রবাহনের উদাহরণে নিউ ইয়র্ক শহরে 'হেনরি হাডসন' সেতু অন্যতম। ■ উত্তর ৮০০ ফুট ও উচ্চতা ১২০ ফুট। পীটসবার্গ শহরের এলিগেনী নদীর উপর 'ওয়াশিংটন ক্রসিং' সেতুটি ১৯২৪ সনে যাতায়াতের জন্য খোলা হয়। সুস্কুয়া নদীর উপর ১৯২৭ সনে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির শতবার্ষিকী উৎসবের স্মারকচিহ্নস্বরূপ 'শান্তি সেতু' নামকরণ হয়। ১৯০৮ সনে ডঃ ষ্টীলম্যানের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস হিসাবে যে ইস্পাতের বৃত্তীয় সেতুর পরিকল্পনা, স্পার্টেম ডেট্রিক্সে, পাঁচশ বৎসর পরে, সে-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়। নায়েগ্রায় ঝুলন্ত সেতু বরফের আক্রমণে নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় সেখানে আর-একটি সেতু ৯৫০ উত্তরের ১৯৪১ সনে নির্মিত হয়। এটি বৃত্তীয় সেতুর চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে নাগাসাকি শহরে ১০৪২ ফুট উত্তরের একটি দীর্ঘতম ইস্পাতের বৃত্তীয় সেতু নির্মিত হয়েছে। এইটি বর্তমানে বৃত্তীয় চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু রূপায়ে উন্নীত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝারী খালের উপর কয়েকটি কংক্রীটের বৃত্তীয় সেতু বিদ্যমান।

৬। প্রসারণী সেতু

এই সেতু উচ্চ সেতুসমূহ থেকে পৃথক প্রসারিত দৈর্ঘ্য প্রসারণী অংশটি ভূপৃষ্ঠে এমনভাবে নির্মিত যে এর ওপর দিয়ে সমস্রোতে নিম্নে প্রবাহিত অংশের স্থির ও চলমান যানবাহনের ওঠানো নামা কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। এই সেতুগুলির নিকটস্থ অন্য অবস্থায় থাকে। যখন কোনো উচ্চ ভারবহনক্ষম সেতুটি দীর্ঘ প্রসারণী সেতুর দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে অগ্রসরিত হতে থাকে, তখন সেতুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণাংশ সেতুর নিম্নগতিসম্পন্ন এবং কেন্দ্রাতিগ কেন্দ্রাভিমুখ গতি দুটি দুটি বিপরীতের নিয়ন্ত্রণে সমতলের ওপর সমস্ত ও প্রসারণীর কাজটি ১৯২৩ সনে নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়। এটি ১৮০০ ফুট উত্তরের সেতু। এর নির্মাণকর্মে চলে প্রায় পনের বৎসর। ১৯৫৮ সনে সমাপ্ত ১৯৫৩ ফুট প্রসারের দ্বিমুখী অরলিন্স সেতুর পর ৪,৬৩৫ ফুট প্রসারণীর ব্রীজ। ১৯৫৬ সনে ৫৩৫ ফুট ব্রীজ খালচালনের জন্য খোলা হয়। এর দুই তৃতীয় সমতলের মাঝামাঝি অংশের মধ্য ১৩০০ ফুট ব্যাসার্ধে ৬৬৪ ফুট দীর্ঘের ঝুলন্তাংশ দুই ৪৬৮ ফুট সেতুর তৃতীয় অংশের উপর নাস্ত। ১৩১৮+১৬৫+৬৬৮=১৩০০। ইঞ্জিনীয় পুলসহ অংশের ১২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের দুই কম্ব স্তম্ভে স্থির হয়ে এই নদীবক্ষ থেকে ৮৫ ফুট ওপরে গ্রহণ করে সেতুটি গড়িয়ে। তেল চালাইবার কারখানা পরিদর্শন প্রয়োজন হলে। কাঁকরাল দীর্ঘতম সেতু ও দীর্ঘ ভারের সেতুর মধ্যে সানফ্রান্সিসকো-ওকল্যান্ড। যখন বাস দুই দীর্ঘ সেতু অতি-ক্রম করে তখন ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্বে নিজের দৈর্ঘ্যকেই মনে করি। "ওকল্যান্ড বে" সেতুটি দুটো, দৈর্ঘ্যে অরলিন্স অংশ ১০,৪৫০ ফুট প্রসারণী অংশ ১৪০৫ ফুট, এটি ৫০৮ ফুট উচ্চতার পাঁচটি ও ১৭১ ফুট উচ্চতার সেতু।

৫। ঝুলন-সেতু

ঝুলন-সেতুর ঐতিহ্য অনুসন্ধানে চিরকের বাবেলের কাছে যেতে হয়। আবেল চুর্ণিত করের চুক্তি 'ক মধ্যেরী লক্ষের বৃক্ষ ছোট বৃক্ষসমূহে ব্যবহার প্রাকৃতিক নিয়মের আশ্রয় নেয়। ১৮৯৪ সনে যুক্ত-রাষ্ট্রের ইঞ্জিনীয়ার ফেড সর্ব দীর্ঘ ৪৩০৫'

ব্রাকলার ব্রিজ

জায়গের সম্ভাবনার জন্ম রাখেন। ১৯১৩ সালে বিখ্যাত সেতু-ইঞ্জিনীয়ার রাজ্যুক্ত বজ্রলেজী ৭০১০ ফুট পর্যন্ত জায়গের ঝুলন-সেতুর পরিকল্পনা করেন। বর্তমানে ঝুলন-সেতু বলতে গেলে সুবর্ণ-গেটের সেতুর কথাই মনে পড়ে। ঝুলন-সেতুর প্রধান অংশটি হল ইস্পাতের মোটা তার বা চেন যার উপর সমস্ত ভারের টান পড়ে। এই কেবলগুলির তলা দুই অতিলম্বী সেতুস্তম্ভের উপর দিয়ে চলে গিয়ে দুই প্রান্ত ভূমিতে এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে সমস্ত ভারের টান সহ্য [redacted] এর সুবিধা এই যে টানের মাত্রা ইস্পাতের উপর ৫০০০০ থেকে ৬০,০০০ পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দেওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিউইয়র্কের "ব্রুকলীন" সেতু দীর্ঘ বিশ বছরের দীর্ঘতম ঝুলন-সেতুর গৌরব বহন করে। ১৯০৩ সনে ইস্ট নদীর উপর "উইলিয়ামসবার্গ সেতু"টি ৬—১" ব্যাস বিশিষ্ট ১৬০০ ফুট জায়গের নির্মাণ হবার পর প্রথম স্থান অধিকার করে। তারপরে ১৯২৯ সনে "বেয়ন ব্রীজটেন সেতু" ১৬৭২ ফুট জায়গের, ১৯২৬ সনে "ফিলাডেলফিয়া ডেলাওয়ার সেতু" ১৭৫০ ফুট জায়গের ১৯২৯ সনে যুক্ত-রাষ্ট্রের মেট্রো-নগরী ডিট্রয়েট ও কানাডার মেট্রো-নগরী উইণ্ডসরকে সংযুক্ত করার জন্য "গ্রাসব্যাকেডর সেতু" ১৮৫০ ফুট জায়গের নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এই রেকর্ডের দাবার রেকর্ড পূর্ণ করে ১৯৫১ সনে নির্মিত নিউ ইয়র্কের "জর্জ ওয়াশিংটন সেতু"। এটি ৩৫০০ ফুট জায়গের। ১৯৩৭ সনে নির্মিত হয় "সুবর্ণ ফটক সেতু", ৬২০০ ফুট জায়গের। দীর্ঘ সেতুর নির্মাণের উদ্যম বেশ কিছুদিন স্থগিত থাকে। এর মোট উত্তোল ৮৯৮১ ফুট, জল উচ্চতলস্তম্ভ-দ্বয় ৭৪৬ ফুট উর্ধ্বে আকাশ বিদ্ধ করে, প্রতি তারটির ব্যাস ৩৮½ ইঞ্চি ও ২৭,৫৭২টি তারের ৬১টি গুছিতে প্রস্তুত। ২৭শে মে, ১৯৩৭ সনে এটির উদ্বোধন হয়। সিনফ্রান্সের রঙে রঞ্জিত বলে একে আলোক-আকাশে মনে হয় যেন একটি সুবর্ণ উদ্ভাস। ১৯৪০ সনে টেকোমা নেরোসের ২৮০০ ফুট জায়গের সেতু তৃতীয় দীর্ঘ ঝুলন-সেতু, ৪৪ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়। ডঃ ষ্টীনমানের পরিকল্পনায় মেকিনাক প্রণালীর সেতু পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ জায়গের ঝুলন-সেতু। তবে যে পাশের জন্য যোগ করলে এটি দীর্ঘতম ঝুলন-সেতু, যার মোট দৈর্ঘ্য ৮৬১৪ ফুট, মধ্যে তরঙ্গ-স্তম্ভের অন্তর্বর্তী ফাঁক ৩৮০০ ফুট। এটি গত বছর শেষ হয়েছে। এর তরঙ্গ-স্তম্ভের ভিত্তি জলের উপর থেকে ২০৫ ও ২১০ ফিট নিম্নে প্রোথিত। দুই তরঙ্গ-স্তম্ভে ৪,১০,০০০ টন কংক্রীট ও ইস্পাত লাগানো হয়েছে। অন্যান্য সেতুতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৭৬ মাইল বেগে অটিকা-প্রবাহে বিপদের কারণ আছে কিন্তু 'বিশ মাইলের বেশী ৬৩২ থেকে ১৯৬ মাইল বেগের ঝটিকাও এর কোন অঙ্গ বিধ্বস্ত করতে পারবে না—মডেলের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে। ৫৫২ ফুট উচ্চ তরঙ্গস্তম্ভ থেকে ২৩½ ইঞ্চি ব্যাসের তারের কেবল ঝোলানো। ডেভিড ষ্টীনমান বর্তমানে ইটালি ও সিসিলিকে সংযোগ করার জন্য মেসিনা প্রণালীর উপর ৫০০০ ফুট জায়গের একটি সেতুর পরিকল্পনা করেছেন।

৮। প্রলম্বনী ঝুলন বা প্রলম্বনী যুক্তীয় সেতু

উপরিউক্ত দুই প্রকারের সেতু সমন্বয়ে এ ধরনের সেতু গঠিত। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া ব্রীজ প্রলম্বনী ও ঝুলন-সেতুর উদাহরণ। শুদ্ধ প্রলম্বনীর নয়। তেমনি দুই প্রলম্বনী অংশের মধ্যবর্তী স্থান পূরণের জন্য ঝুলনাংশের বদলে যুক্তীয় অংশ সংযুক্ত [redacted] যায়।

সেতুনির্মাণের পরিকল্পনায় জন্য পুঙ্খানু ও জটিল গাণিতিক গণনা, বায়ুসংক্রান্ত কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নির্মাণের সময় অসাধারণতা, অসাধ্যতা ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য অথবা তৈরি মুনিবিশাকে অত্ত ভীষণ বাঁধ দিতে হয়, তার তুলনায় কোন রথ্য উপন্যাস বা রোমাঞ্চ শ্রেণীর গল্পের চেয়ে কোন অংশে কম উত্তেজনাময় নয় বা কম বিস্ময়কর নয়।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত অর্শের মহৌষধ
গ্যারান্টিড্
সুপরিক্ষা ■ অস্ত্রোপচার ব্যতীত ঔষধ সেবনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য ৫,
শ্রীমতী শান্তিলতা সেনী (২) শ্রীধরধাম, ৪১, চাউলপট্টী রোড, কলিকাতা-১০

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)
— হেড অফিস —
২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা
ফোন : ২২-৩১৮৮ ■ ২২-৩১৮১
— ব্রাঞ্চ —
বড়বাজার, শ্যামবাজার,
ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা।
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
শ্রীসুবোধ এন. ব্যানার্জি, এম-এ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

মহাশ্বেতা

[১২৮ পৃষ্ঠার পর]

এঁকে সে? পাথর চাপা বিবর্ণ ছবের মত বিবর্ণ শীর্ণ প্রায় অস্তিত্বলোপ একটি মেয়ে, মুখের দুপাশে হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, পিছনে খোলা ফাঁপা একরাশ বিশৃঙ্খল চুল ওকে আরও রুক্ষ করে তুলেছে, না—রুক্ষ নয়, বীভৎস। শুধু রয়েছে সেই চোখ দুটো। সেই দুটি চোখ দেখে সে চিনতে পারলে—এ-যে নীরা!

জীবনে হাস্য-লাস্যকের এই পরিণতি! পুণ্যফল?

না। জেঠীমার কথা সত্য। নিজের আচারে যে অপমান সে করেছে, এ তার ফল।

অবসন্নের মত সে উঠে চলে গেল খিড়কি বেয়ে ছাদের উপর। সূর্যোদ্ভাসিত পূর্বাকাশ দিকে তাকালে। ওঃ, এই এক বছরে জীবনটা কত বদলে গেছে!

সবটা দিন সে ছাদের উপর ঘুরল। সন্ধ্যাবেলা সে নতুন করে পড়বার জন্য বই নিয়ে বসল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে বললে, জেঠীমা আমার বাক্সের তালা চাবি দেবেন না।

জেঠীমা তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কিছু বললেন না। তাতে খুব অবজ্ঞা—হয়ে গেল।

এই মেয়েটির রক্ত নিষ্ঠুরের সে আজ জীবনে কাউকে দেখেনি। এই নিষ্ঠুরে ঘৃণা আজ তার তোলপাড় যায়নি। শুধু কি তার উপর? এরপর থেকে যেখানেও তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি দেখেন তার জীবন-সংস্কারের এক অন্তরঙ্গ পুরুষপ্রকৃতি শুধু আশা পল্লব-পুষ্পিত পথে বিষাক্ত একটা গাছ, যার তুলনা তিনি আনে না—যার বিষম অন্ধকার, আর অহরহ পত্রপল্লব থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বিচিত্র পুষ্পের বিষবাষ্প। শুধু যেন মানুষটা নিজের জন্য, যে কারণে প্রাণীমাত্রের বাসি হয়, তেমনি একটা কারণে নেমেছে পেন্সিল দেখে একটা ভাল পুষ্পিয়ে তোলে গিয়েছিল, তখনই মধ্য দিয়ে এসে পড়েছিল একটি অপরিচিত সুখালোকের দীপ্তি এবং উত্তাপ। আজকে সেখানে ভাল পল্লবের ফাঁকটা সম্পূর্ণ-রূপে ঢেকে গেছে।

এইবার দ্বিতীয়ের অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

এ দৃশ্যের ভাল অনেক হাঁস হাসানো, তবে ভাল অনেক। বাঁশি বিচিত্র ফার্সিক্যাল ধরা, তবে তাই; যত আঘাত করলে হাসা, তত আঘাত করলে সে। ছন্দ-ভিন্ন ঠিক হয়নি। তবে সে হাসেনি, আঘাতে আহত হয়ে দূরে পড়েছি। কিন্তু সে চিন্তাহীন আঘাত নির্দিষ্টাকে সে ধরে করে অপমানের চিহ্ন। আঘাত বর্তমান এই অবাধ আশ্রমে বৈদিক ইস্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ আজকে বেশ্রে থাকা, এইটেই তার বর্তমান পরিচয়। আর শেষ হবে আজ। তবে নয়, হল।

আজকের কথা থাক।

দ্বিতীয়ের অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা। ৪৫ সালের এপ্রিলে আরম্ভ—৪৯ সালের জুন মাসে সমাপ্ত। চার বৎসরেরও বেশী তবে মায় সে এক খাননি। ছেঠাইও হয়ে-ছেন। থাক; নাটকের নিয়ম পরের পর সাজানো। শুধু নাটকেরই বা কেন, জগতের, এলোমেলো যা কিছু, তাই বিশৃঙ্খল—অনিয়ম।

যবনিকা তোলা। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস; নীরা পড়ছে মুখ গুঁজে, সামনে তার পরীক্ষা। অপরাহ্ণবেলা।

দৃশ্যপটে, সেই প্রচ্ছন্ন অন্ধকার বারান্দার ঘরখানা নয়। তবে ঘর ফুলের ডালের যে ঘরখানায় একদিনের ছেনা আর সে দুজনে শুতো, সেই ঘরখানা। পরে সেই ঘরখানাই নির্দিষ্ট হয়েছিল—ছেনা এবং তার স্বামী এসে তাদের জন্য। এখন ঘরে নতুন দেওয়ালের জোর। সে বিনা কোলাহলে কলকাতে একদিন ওই ঘরখানায় তুষ বই এবং বাক্স দুটো, যা তার মা রেখে গিয়েছিলেন, সব ওই ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। এবং দেখে শুনে তাদের নিজস্ব যে পুরোনো ফার্নিচার পেরেছিল, তাও টুকে এনে ঢুকিয়েছিল। সব হয়ে গেলে জেঠীমাকে বলেছিল, ওঘরটা আমাদের বাসকার জন্য—আপনি আমা-দের ঘরটায় থাকুন আজ থেকে। জন্মমাত্র নীরা প্রার্থনা করেনি, অজ্ঞাতে মানুষ পর-ছেলে আপন অধিকারে প্রবেশ করেছিল। জেঠীমা কিছু বলেননি। তবে দৃষ্টিতে তাঁর একটা অবজ্ঞা ছিল। ঘরখানাকে বদলাবার পরিশ্রমে এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে আরাম আরম্ভ করেছিল ছেলেমানুষী জীবনের নূতন অধ্যায়। সন্ধ্যায় ডাক্তারসাহেবকে বলেছিল, আমায় কয়েকখানা বই লাগবে।

তুমি, তুমকে পরাশব্দে, বলেছিলেন, বই? কি বই? কিসের জন্যে?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব আমি।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে? যেন এর চেয়ে আশ্চর্য বা অসম্ভব কিছু হতে পারে না।

জেঠীমা ঘরে ঢুকে দেখেন চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। ছেনা লিখেছে। আজকের ডাকে এসেছে। তুমি এ ঘর থেকে যাও নীরা।

নীরা চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারসাহেব ডেকে বলে-ছিলেন, কাকীমা বই লাগবে? কত দাম? একটা কথা আমি বলে রাখি তোমায় যা যা রেখে গিয়েছিলেন তার আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই।

মুনের মাথা কাটা—এ-কথা ঠিক, কিন্তু সে তা বলতে পারে নি। বোধহয় এতদিন নীরব সহিষ্ণুতার অন্তরালে খানিকটা সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। নীরব পাঁড়িয়ে রয়ে খুনুছিল।

ডাক্তারসাহেব বলেছিলেন, সে কটা টাকা আছে তার তোমার অবশ্যে বাড়ির একটা দাম ধরলে বিয়েটা অবশ্য গরমখরচে হোল হয়ে পারে।

জেঠীমা বলেছিলেন, পরীক্ষাটা দিতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

এবার নীরা বলেছিল, বিয়ে আমি করতে চাইনে। আমাকে বিয়েই বা করবে কে? পরীক্ষাটা দিয়ে পাস আমি করবই, কোন চাকরী আমি খুঁজে নিয়ে চলে যাব। আমাকে যদি টাকাটাই দিয়ে দেবেন। বলে সে চলে গিয়েছিল। সেই সে পেরেছিল এবং ঘরের পরিশ্রমে সে পড়েছিল।

এগুলো দৃশ্যান্তরের বিষাক্ত ছবেই ঘটে গেছে।

একদা শুরু হয়ন, যখন নাটক এল, সেদিন তখন অপরাহ্ণবেলা—সে পড়ছে; দিন ডাকবে কাজ শুরু করেছে; জেঠীমা এক ঘটকীর লম্বা বক্তৃতেলের বিয়ের কথা বলছেন। এবার বড়ছেলের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছেন; ব্যস্ত কথাটা পর্যাপ্ত নয়, উঠে পড়ে লেগেছেন। ব্যাঙ্কের ফাটকের মত তার বিয়ের বথাটাও আছে।

সে তখনও এঞ্জিনিয়র হয়ে ফিরেছে, আমার বিয়ের কথা কইবেন না জেঠীমা।

জেঠীমা বলেছেন, আচ্ছা। কিন্তু তবুও বলছেন। সে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা বিরোধ করবার তার এই মুহূর্তে সময় নেই বলেই সে আর কিছু করেনি।

হঠাৎ মেজছেলে, ছেনের ঠিক উপরের ভাই সুজিত বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল—মা। মা! কই? মা!

জেঠীমা বিরক্তি ভরেই বলেছিলেন, কি? এইখো রয়েছি। বাইরে থেকে এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

সে উঠোনে ঢুকেই বলেছিল, তোমার বড় ছেলের বিয়ে হয়ে গেল।

—বিয়ে হয়ে গেল? মানে? ছেলে বাবা বুঝি সেই পটের বাজারে ইষ্টার বক্তৃতাকে কথা দিয়ে দিলে? আচ্ছা আমিও দেখব সে বিয়ে কি করে হয়।

সুজিত হেসেই খুন।

—হাসছিস কেন?

—হাসছি কেন? বললাম, বিয়ে হয়ে গেল, না তুমি বলছ—তোর বাবা বুঝি পাকা কথা বলে বিয়ে? না—না। সব পর্ব শেষ বিয়ে দেব।

—তুই কি নেশা করেছিস? বিয়ে হল কখন?

—আজ বিকেলে রেজা। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে। আমি তার একজন সাক্ষী। পাটের দালালের মেয়ে নয়। 'সিকদার স্টোর্স—এগারটী ফোর্স! ওরেব্বা এলা বোস। [illegible] আজ হোটেলে উঠেছে। সেইখানেই রাতে খাওয়াদাওয়া এবং বাসর!

নীরার পড়া সহজে বন্ধ হতে চায় না; সংসারের নানান জটিলতার মধ্যেও পড়ে চলে। অনেক কিছু পড়লে না, সুজিতের মতো বড়জাই অর্জিত চাকরি বা ঠকুরাকে মারতে না, তাই বলে কবে হইার সময়ের অট্টহাস্য হাসলে বা, জাঠামশায় পার্টি থেকে কিরে ফিরস্কার করলেও না। আজ কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটবে—যা সে কল্পনা করতে পারে না, কল্পনাতীত অসাধারণ কিছু; কৌতূহল নয়—আশঙ্কায়, ভয়ে পড়া বন্ধ হয়েছিল।

আশ্চর্য, জেঠীমা তার কিছুই করেন নি। চিৎকার করেন নি, কাঁদা চোখেন নি অজ্ঞান হয়ে যি, কিছু। করেন নি, শুধু, নিঃশব্দে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। ফিরকে ফেরেছিলেন জাঠামশায়।

—আজ্ঞাপত্রে কখন আসি। বাড়ি ঢুকতে দেখে না। সে বহুতর লপথ এবং আস্ফালন। সুজিত খুক্ খুক্ করে হাসছিল। সে সেই মাত্র হোটেলে বউভাতের ডিনার খেয়ে ফিরেছে।

নীরাই তাকে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন সুজিত?

সুজিত ডিনার খেয়ে এসেছে, চোখ তার চিবে রাঙা এবং ঘোলাটে, কথায়-বার্তায় তার অপরিসীম কৌতুকবোধ; সে বলেছিল —হাজাপত্রে কখনে বাবা—ব্যাট হাসছি। আজিত মুখার্জী এক্সপার্ট ছেলে—সে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করে। আজই বাবার সই করা ব্লাঙ্ক চেকে—সেক্স নাম দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ বের করে পকেটে পুরে মেসিলিটরের কাছে গেছে। টাকাটা সে এমা বোসকেও দেয় নি। তারপর তার নামে যা দেনার দেনা আছে, সেসব তার লেটা কোলিওতে। টুডে—দি ওয়ান্ডার—

রাগের মাথায় আপিস এ্যান্ড বাপিস, কাল আপিসে গিয়ে শিচ্‌ওয়ি এ্যান্ড স্টোনহিং। হাসছি সেই জন্যে।

জেঠীমা নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলেন। ধরা দিন। জাঠামশায়ের ক্রুদ্ধ লপথ এবং চিৎকার সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত তিনি—যা খুশী তাই করুক, আমি জেলে যেতার, স্ত্রী পড়ে কাদের জন্যেই আমার কেন মাথা-ব্যথা নেই—বলে-বেশ খানিকটা মহাপ্রস্থান করে গাল দিয়েছিলেন জেঠীমাকে।

অনেকটা রাত্রে সে গিয়ে ডেকেছিল, জেঠীমা—ঠাকুরটা খাবার নিয়ে মাথার হাত দিয়ে বসে আছে।

তিনি কিন্তু ফিরে শুয়েছিলেন। সে মাথায় একটা অসহ্য অনুভব করেছিল। তাই ডাকছিল। হঠাৎ জেঠীমা ডেকেছিলেন সেদিন।

ঘুমে পীড়িতের মতো সে।

—তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেন? এখনে আমার চাকুর আছে।

রূঢ় করে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল নীরা। নিষ্ঠুর উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, তুমি, তোমার জন্যেই আমি ছেলের বিয়ে দিলাম। না-হলে এই কাণ্ড আজ ঘটত না।

নীরা আর থাকতে পারে নি, বলেছিল ঘটত। আমার জন্যে জাঠামশায় এমন করে চল খাচ্ছেন না। খাচ্ছেন টাকা মার্কেটে টাকার জন্যে। এ কাণ্ড আমার জন্যে ঘটেনি ঘটেছে ওই টাকার জন্যে। তবে ভাববেন না। আমি চলে যাব এবার আপনার বাড়ি থেকে। পরীক্ষার ফল বের হলেই আমার কি আছে বুঝিয়ে দেবেন—আমি চলে যাব।

তার পরীক্ষা সেদিন শেষ হল—সেদিন বাড়িতে বই এল। এলা বোস—এখন এলা মুখোপাধ্যায়। অভিজাতকে ডিঙিয়ে না-এলে পি সি মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ জাঠামশায়ের সন্তোষের ছিল না। বাধলো অচল হত। অনেক জমি বাধা নাবে; মোটা টাকার কোম্পানির অধিকারী সে। একটা মিটমাট হল। টাকা-শেয়ার-জমি সিলমোহর নিয়ে কাকীটা অভিজাত ফিরিয়ে দিলে; বাপ বাড়ির অংশ তাকে লিখে দিলেন। ছেতলায় দুখানা ঘর উঠেছে। সেখানে হবে তাদের সুখনীড়। একা মুখোপাধ্যায় লপথ করে বলেছে, সে আর সিমেনার নামবে না। বাস মিটে গেল।

জেঠীমা স্বাভাবিক হবেন। স্বাভাবিকা সব।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। মন তার ভাল ছিল না। তার চেষ্টা উদাম সব ব্যোমবহ ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা তার ভাল হয়নি। অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। একটা সে কষতে পারেনি—তিনটের উত্তর ভুল হয়েছে। সেই যে তার মাথার মধ্যে বার্থতার ক্ষোভ জমাট তার ফলে সারারাতটা সে ঘুমোয়নি। পরের দিন সংস্কৃতের পেপারে সে যা করছে তা একটা ছোট ছেলেতেও করে না। একটা কোশ্চেনেরই হবল উত্তর লিখেছে। প্রথম লেখাটা তার ওই বিভ্রান্তিতেই চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর তার স্নায়ু, ধৈর্য এমনই ছেড়ে গেল যে, শেষের দিকে কত ভুল হয়েছে সে তা জানে না। মনে পড়ছে মধ্যে মধ্যে বসবার নিয়ে ধরিত্রী দেখেছে। ইতিহাসের পেপারে যতীন্দ্রমোহন ভুল হয়েছে। বচনায় হোম-হয়ে লক্ষ পড়ে গেছে। আডিশনালের পেপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হয় নি; ভাত কেপেছে, সে ঘেমেছে কাঁদতে তার এই সিমটমে ইচ্ছে হয়েছিল, বুক থেকে ঠেলে ওঠেছিল কান্না; কান্নাটায় কাঁদতে পারেনি। কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে ফিরেছে: মনে পড়ল ক্লাস নাইনে উঠে অধিকাংশ মেয়ে যখন অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে ডোমেস্টিক সায়েন্স নিয়েছিল—তখন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয় বলে, অঙ্কই নিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে সব পড়াই বোধ হয় অসম্ভবপর হয়েছে—অঙ্ক কোন সম্ভবপর হয় নি। তবুও এতগুলো ভুল হবে এ আশঙ্কা সে করেনি। ছেনের ছোট ভাই রণজিৎ, সেও তার সঙ্গে পরীক্ষা দিলো। সে খুব খুশী। তার ধড়া ডিভিসন কেউ মারতে পারবে না। কিন্তু তার যে শুধু ফার্স্ট ডিভিসনেও তাবার আশঙ্কা।

বাড়িতে যখন এল, তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, হতাশায় প্রায় ছেড়ে পড়ছে ইচ্ছে ছিল বাড়ি এসেই শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাড়িতে তার অবকাশ ছিল না

বাড়িতে তখন সমারোহের কোলাহল উঠছে সিনেমা স্টার বউটাকে নিয়ে দেবরের মনস্তত্ত্বাল ফুলছে। চারিদিকে মাহাত্ম্য থেকে পড়ছে তার ঢেউ। বিয়াল্লিশ সালের সইক্লোনের মধ্যেও সে বিধ্বস্ত বোধ করেনি। কিন্তু এর মধ্যে বিস্ময়ে, ঘৃণা অনুভব। হেতলায় নতুন কার্পেটের উঠছে। সুফেকেস ট্রাঙ্ক উঠছে। বাড়ির দোরে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; একখানা ভাড়াটেগাড়ি। লম্বা-চওড়া চুকেছে। পুরনো হলেও নতুনের মত ঝকঝকে, তার পিছনে ছেনের স্বামীর গাড়ি। ছেনে এসেছে। কথাটা সে শুনে গিয়েছিল, কিন্তু এমন সমারোহ উল্লাস সে ' কল্পনা করতে পারেনি, জেঠীমা বিলামানে। জেঠীমার বয়-খানি ফর্ম। স্তব্ধ হয়ে তিনি ঘরে বসে আছেন। চাকর কি ঠাকুর সব ব্যস্ত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের সামনের বারান্দায়। কিছে দেখেছে, কিন্তু দেবে কে? এক কাপ চা পাওয়ারও কোন আশা নেই।

এর মধ্যে ওর মাথাটা ঘুরপাক হয়ে উঠল প্রায় কোয়ানে।

—নীরা! নীরা! নীরাদি! নীরু! নীরুদি। চিরুদি।

প্রথম ডাকটা অজিতদার। শেষেরটা হেনার।

চকিতে সে ছাদের দিকে। আলসের উপর দিয়ে সারি সারি মুখ। তার মধ্যে একখানি আশ্চর্য অকথ্য মুখ সোনা-রূপোর গহনার মধ্যে একখানি দামী কড়া আতরের মত নানা রঙে ঝলমল করছে।

—উপরে আসুক নীরা। চা তৈরি। বউদির সঙ্গে আলাপ করুক।

এলাকেশী মৃদু মৃদু হাসছে। বিজয়িনী গরবিনীর প্রসন্ন-মধুর হাসি। প্রকাশে সে আকারে প্রকারে মৃদু অর্থাৎ ঈষৎ। কিন্তু ওরই মধ্যে সে আলগা ঢেউ পুরুতেরা: তার আসে যে প্রতিটিতে ঝিকিমিকির মধ্যে যেন দাঁতন কোটুক। সবশেষে তুমি ধন্য হয়েছ, এইটে নাটকের সমাপ্তোক্তির মত অভিপ্রায়।

তবু সে গেল।

হেডলার সিঁড়ির মুখে জেঠীমার ঘর। এ ঘরটা টিনের পার্টাবেন নইলে বউকে দেখতে হবে ছটা-নামার সময়। সেটা পার হয়ে সে উঠে গেল। অজিতদা বললে, ইনিই শ্রীমতী নীরা যার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। আর এই হচ্ছে বউদি, মেজদা এলাকেশী।

অকস্মাৎ এলাকেশী সকলকে সচকিত নিয়ে বলে উঠল, আরে, একেই তুমি বলতে ভালো কুত্তী! কি চমৎকার চিমসে। আর রঙ দেখ এই সবে ঘটছে, উপরি মারছে।

কথাটা অবশ্য বলল ছেলে উঠে। কিন্তু এ এলাকেশী লোক। ও ওর মুখ চাইলে। মুখ ফেরে উঠল রবীন্দ্র; সে ভাবলে এ এলাকেশীর একটা মহান্‌লা বাংলা, রস রসিকতা, সাটায়ার।

কান খাঁ খাঁ করে উঠল নীরার। সে নীরা! সে বলে উঠল, ঠাট্টা করছেন? তা অবশ্য—

বাধা দিয়ে এলাকেশী বললে, না। তোমাকে দামার দিব্যি করে বলতে পারি, না। দেখ, তোমার ছাদার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়। ফিল্মে কাজ করেছি, রূপ আমি চিনি, গায়ের রঙে রূপ নয়, রূপ সব কিছু নিয়ে। গায়ের রঙ তো ফেরানো যায়। মুখে সরটুনেসের স্ত্রী তো আনা যায়। আমি নিজে করেছি। কিন্তু তোমার গড়নে-পেটনে রূপ উছলিয়ে পড়িয়ে আছে। জানোনি। জানাছে। কিন্তু মনে করো না তুমি এক-দিন তোমাকে দেখা সুন্দরী, এইবার ফটছে, কিছুদিনেই বুঝতে পারবে,—একটা দলা ঘোল নয়— কাঁচকলা দলা ঘোল ভল ভল

চারিদিকে। তখন চড় মারতে হবে, দলাকুক্ষা হয়ে যাবে। প্রস্তুত কিশোর তোমার। টল, গ্রেসফুল।

লজ্জায় বিস্ময়ে নীরা কেমন হয়ে গেল। এলাকেশী তাকে মনে মনে প্রশংসা করছে অকাল বিশ্ব —... কি সর্বনাশ! সে ডান হাত ছেলে নিয়ে গেল, এস টেস্ট দেখাই। ঘাড় নিচু করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে তক্তে বসেছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সেই সুপ্রচুর চুলগুলি নিয়ে কি করতে সাধু করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন আদু শুরু হল। মিউজিক উইক নীরা। এ কি? এ কে? এ কে? সে একটা আশ্চর্য ডিভ উপলব্ধি! তুমি গেল সে তার পরিষ্কার কথা। বিস্ময়, এক অনির্বচনীয় তোমন আনন্দ, ভয়—সব একসঙ্গে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল।

- বস, বস!

- না। ছাড়ুন।

- বস না।

- না। তার কণ্ঠে সে বহ্নি ফিরে পেয়েছে তখন।

ছেড়ে দিল এলাকেশী তাকে। হাসতে লাগল। বললে, এই হয়?

দরিদ্রের অনাথার জয়ই তো আত্ম-রক্ষার আশ্রয়।

—শরীর আমার মরুভূমি তোমার ঘুচাতে সত্যকথা? ঠিক অনেক পারে, নাথ—? হাসতে হাসতে বললে, নাথ চাইলে অনেক জুটবে। না-চাও, অন্যদের নাথ একটা ভিজিটিং কার্ডের মতো রেখো, একটা আদ্রেসোগ্রাফ পুয়ো। বলো, নামিয়ে কি দিলে। এমন ফিগার এমন উচ্চারণ পুরুষের! কালকের-মাইকের গলা তুমি উকবে এ আমি বিনা পয়সাতেই বলতে পারি। মানবে?

তার সেই বিচিত্র বিশ্লেষক দৃষ্টিতে নীরা এলাকেশীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এলা সকৌতুকে বললে, কি?

নীরা বললে, না।

—না নয়। বলবে দেখো।

—না। ও আমি পারব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না।

- অভিনয় তুমি খুব পারবে। অদ্ভুত পারবে। দু দিনে রূপ ভেঙে যাবে।

—অভিনয় আমার ভাল লাগে না। এবং চাই না করতে। করবেন আমাকে।

বলেই সে ফিরল এবং বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে সে পালায় না, ধীরপদক্ষেপেই নেমে এল। দেখা তার পথ বন্ধ করেছিল, দেখি দেখি। তাই তো চুলটা ফেরানোতে—।

—পথ ছাড়। হলে হাতেও ধরিয়ে মেরে এসেছিল।

নিজে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে স্নান হয়ে তার মনের পুরনো আয়নায় তার প্রতি-

জাপানী প্রথায় ধান চাষ করুন !

জাপানী প্রথা মানে বৈজ্ঞানিক প্রথা। তবেই জানেন এই প্রথায় ধান চাষ করা মানেই বিঘা-প্রতি কতগুণ বেশি ফসল পাওয়া।

জাপানী প্রথায় চাষ করতে হলে দুটি যন্ত্রপাতি যন্ত্র হচ্ছে আমাদের 'সীড ড্রিল' বা সারি বীজ বোনার যন্ত্র এবং 'জাপানী পাওয়ার উইডার' বা আগাছা নিড়োনো যন্ত্র। এই নিড়োনো দিলে ফসল যেমন বাড়ে, খরচও কমে তেমনি।

যে-কোন রকমের আধুনিক কৃষিযন্ত্রের জন্যে

কার্লওমস এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

২৮, এজারিয়ন, স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন। ২৩—৬১২৭

বিস্ময়ের দিকে চেয়ে বসে সে নিজের চোখে আবিষ্কার করেছিল [illegible] মেলা করে নিয়েছিল।

হঠাৎ সেই [illegible] সম্পর্কে সে কথাটা আলোচনা করেছে [illegible] বিবাহসম্পর্ক [illegible] আছে। এর মানে কি, তখনই সে ওর মানে [illegible] করেছে [illegible] ছিল [illegible] ঠকতে সরলের [illegible] সে অসম্মত করেনি, [illegible] বসিয়ে দুপ [illegible] করেনি। [illegible] হয়ে গেছে। শুধু [illegible] ফিরেছে মুহূর্তের, [illegible] কাজ [illegible] জলঅন্ধকার করে দিয়ে।

১৯৬৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফার্স্ট ডিভিসনের পাস করেনি, করেছিল থার্ড ডিভিসনে। সব [illegible] হয়েছিল বললেই হলো [illegible] সে মাপে [illegible] বিশেষ মিলছিল। বাড়িতে টিট্-কিরির সীমা ছিল না। বলছিলও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে [illegible] ছেলের মধ্যে থেকে [illegible] ফেলটামির কথাও শোনা গিয়েছিল, [illegible] হলে [illegible] আটমোনে দুর্যোধন [illegible] একবার [illegible] নিয়ে নিয়ে এসে [illegible] ফেলেছে। [illegible]

মনে [illegible] সে বলেছিল, না।

তারপর [illegible] বাড়িয়ে [illegible] বাড়ির অবস্থার দাম, আর যদি [illegible] সে টাকার [illegible] পাওনা যাবে, এমনকি [illegible] আমাকে [illegible] পথ [illegible]

—অমন [illegible] ভালো পথ নয়, তোমার [illegible]

—এর [illegible] ওদের ভালোর পথে [illegible] আমি যে [illegible]

[illegible] পাছে [illegible] এমনের [illegible] হবে।

[illegible] ভালো সে করেনি সে বলেছিল, আমার [illegible] সে [illegible] ফেলে [illegible] [illegible] পায় [illegible]

—হুঁ, ভালো। চাকরী পাও। দেব বা পাবে তুমি।

কিন্তু [illegible] এল এক ভীষণ [illegible] সেটা ভারতবর্ষ জুড়ে। শুধু [illegible] কলকাতায় ১৬ই আগস্ট, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা তার কিছুদিন আগেই থেকে আরম্ভ হিংস্র কলকাতা তখন বারুদ-স্তূপ। তার মধ্যে [illegible] হয়ে গিয়েছিল। [illegible] থেকে সে দেখেছে। কিন্তু [illegible] এই [illegible] চেয়ে সে [illegible]। ১৬।১৭।১৮ই আগস্টে সে কি [illegible] ১৯শে এই [illegible] তখন [illegible] বেরিয়ে [illegible] এবং [illegible] কলকাতার [illegible] পাড়ে [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] তাদের [illegible] তাই [illegible] একটা [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] একটা [illegible] একটা [illegible] ছাড়া [illegible] [illegible] সারারাত সে [illegible] ছুটে [illegible] [illegible] এসে [illegible]

সামান্য একটু * টিনোপাল ব্যবহার করলে

সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে —বেশী সাদা— হয়ে ওঠে।

* টিনোপাল এস এক্সট্রা কনক · এ ধরণের এস-এ ব্যবহার করুন

প্রস্তুতকারক : ফুলার পাবলী ভারতের লিমিটেড, পাবলী নগর, [illegible] পরিবেশক : ফুলার পাবলী ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, পোঃ বক্স [illegible], বোম্বাই

স্টকিস্ট : [illegible] হিন্দুস্থান ভারতের লিঃ, ৮৩ ১২, সিট [illegible] ষ্ট্রীট এক্সটেনশন রোড, কলিকাতা—১।

ছিল। অজিত শুধু মাথার হাত দিয়ে চুপ [redacted] বসেছিল একখানা চেয়ারে। জেঠীমা তার ঠাকুরের সামনে কপ করেছিলেন। জ্যাঠামশায় হয়ে গিয়েছিলেন একতাল মাংস-স্তূপ। আর চেহারা দেখেছিল এনার। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রিঙলবারটা হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাববশে খানিকটা আস্ফালন দেখিয়েছিল, কটিক বেরটা [redacted] পরে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যই তার সাহসের অভাব ছিল না। সে প্রতিশ্রুতি হয়ে ছাদের আলসেতে কনুই রেখে, শূন্য-দৃষ্টিতে ঘাটির আকাশের দিকে [redacted] থাকত। কোন ভাবনাই তার ছিল না।

স্নানের পর সে জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, যা হয় করে দিন জ্যাঠামশায়, আমার পথ হো আমাকে [redacted] হবে।

—এই দুঃসময়ে?

—দুঃসময় বলি না কাটে!

—না,—কাটে, আমুষের ভালো যা হবে তোমার ভালোও তাই হবে। আমি হো এ সময়ে তুমি ছেড়ে চলে গেলেও যেতে দেব না।

এই একবার, এই একটি কথা জ্যাঠা-মশায়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির একটি ফাঁকে একটি নীলাভ [redacted] মত জেগে আছে তার স্মৃতিতে। নইলে তার জীবনে এতবড় দুর্যো-গের আর কেউ হয়নি।

জেঠীমা কথাটা শুনে বলেছিলেন, ওর হো পাছনার ভয়ও নেই, পালের ভয়ও নেই। তার মায়া? ও পাথর।

জ্যাঠামশাই সেদিন বলেছিলেন ও'র [redacted] তুমি ধরো না মা, ওকে হো জানি।

অমানা সে করতে পারেনি। বলজিতের আই-এর [redacted] নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিল। এরই মধ্যে জীবনে তার মর্মান্তিক বজ্রিক ওই এলক্সীর আবির্ভাব [redacted] রূপসী। মনে মনে অজিত তাকে দেখে, তার সেই বিচিত্র অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। আশ্চর্য বোধ হত। মনের মধ্যে একটি কোন সূক্ষ্ম তারে একটি নতুন সুর বাজত। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে নিজের অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখত। কৈশোরে একদিন যা কুণ্ডির মত ছিল তা স্থলপদ্মের মত ফুটছে। আশ্চর্য। জীবন কেন অকস্মাৎ মহাসমারোহের আয়োজন করছে তার দেহ জুড়ে। দেহ পূর্ণ হয়ে উঠছে। যেমন তিন বছর আগে যেমন হয়েছিল। মুখের যেন চেহারা পালটাচ্ছে। তার বর্ণ পালটাচ্ছে। আশ্চর্য! মনের পর্দা ভেদ করে ভাসছে মাথায়। অল্প যেয়ে পড়ত, সে দেখত। হাসত। চুলের রাশি মুখে বুকে পিঠে মেপে মেপে দেখত। আয়না আগের চেয়ে অনেক বেশী দেখতে ভালবাসত। এবার সে ঘর বন্ধ করে চুল আঁচড়ে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে তুলনা করে দেখত। তারপর দু হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বাইরে বেরুত। রূপ তার নিজের জন্য। সে যেন বাইরে কাউকে দেখা না দেয়।

৪৭ সালে স্বাধীনতা তখন আসছে। ওখা-শাহো স্বাধীনতা হয়েছে। এক মস্ত এক পুনরই আগস্ট দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীন হবে সে নিশ্বাস ফেলেছিল। এইবার সে যেন হবে এ বাড়ি ছেড়ে। হঠাৎ মুক্তির মত লেগে। সে মেতেছিল ওই মহাআয়োজনে। যে ঘরে যেমন মানাতে গিয়ে বেমা ঘরে পালটাত। কখন যে কিভাবে কড়ি মাঝারি মনে নেই। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ইনভিটেশন কার্ডস ছাপা হয়ে বাড়িতে। বিশেষ জেঠীমা, তিনি যেন পাগল। আশ্চর্য বস। এলাহী হয়েছিল, কিন্তু জেঠীমা তাকে ঠিক দিলেন।—না। তুমি এখানে যাও। তারপর নীরব দৃষ্টি চেয়ে বলেছিলেন, তুই একটু বসবি? আমি আসব পুজোটা সেরে আসি!

সে বসেছিল।

এরই মধ্যে কেটে গেল সাতচল্লিশ সাল। অজিত বহুমূল্য মানিক হয়ে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন বিস্তার খুলেছে। শরিফগড়ের কারখানাটি রাইস মিল কিনেছে। শুধু তাই [redacted] ফ্লোরিডক্সিদের সেবা করে, তাদের [redacted] নামও কিনেছে। আগামী ইলেক-শনে সে দাঁড়াবে। টিকিট চাই তার মধ্যে [redacted] দিন যায়, সঙ্গে এলক্সী। নতুন ব্যবসায়ে বড় ব্যবসাদার শরিক জুটেছে। প্রবীণ হাউসিয়ার মানুষ। দুই ব্যবসার মধ্য থেকে মেয়ে অজিতের বুদ্ধি অসহায় পরাগ-বাহকে শক্তির পথে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায়। তাঁরা ছেলেরা বলজিৎ প্রতিজিৎ তাদেরও সময় নেই। [redacted] এই জেঠী-মাকে ওই রোগীর পাশে একা রেখে আসতে সে পারেনি। কিন্তু তার যে দিন চলে যায়। দরখাস্ত কয়েকটা করেছিল, কিন্তু কোনটাতেই সাড়া মেলেনি। একে শুধু ম্যাট্রিক, তার উপর সর্বত্র সরকারী নিয়মের রেকিটাল অস্ত্রাবিকার জীবনের মুক্তি পথকে সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর করে দিয়েছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ মনস্থির করে সে, ফার্স্ট-এ পরীক্ষা দেবে। পাস সে করবে। যে ডিভি-সনে হোক। বলজিতের বই পড়েই ছিল; সে পড়া ছেড়েছে, সাড়ে পাবে বিজনেসে ঢুকেছে। সেই বই নিয়ে বসল। এবং এক-দিন অজিতকে গিয়ে বললে, সে পরীক্ষা দেবে। ফিয়ের টাকা চাই। কিছু বই চাই।

অজিত বললে, পরীক্ষা? পড়বে কোথায়?

—পড়েছি। পড়েছি বলজিতের বই নিয়ে।

অনেক দিন পর এলক্সীর সঙ্গে দেখা। কেমন ইলুলোক। সে মস্কোর রাশিয়া,

মডার্ণ ডেকোরেটর্স

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮৲ টাকা

[redacted] সকাল ৬টা থেকে ১২-৩০ ■ বৈকাল ৫টা থেকে ৭টা

শারদীয়ার প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন

গিনি ভবন

সুরুচিসম্পন্ন স্বর্ণালঙ্কার নির্মাতা

৬২ ১০২, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৫-৩৯০২

শাখা : ২৭৭, বিবেকানন্দ রোড (জেনা কটনের পুরাতন সদরাঙ্গন) কলিকাতা-৬

শরতের আবির্ভাবে উৎসবের
ঘণ্টা বেজে উঠেছে

লাক্সা

এজেন্ট : সি. মহোদয় এণ্ড কোং, বম্বে—২

ক্যালকাটার এজেন্টস :—মেসার্স ম্যাকাস এণ্ড কোং,
১২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেখা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে দেখায় শুধু তাকানো, দেখা ঠিক হয় না। সে হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, তোমার কপালে শনির দৃষ্টি। নয় হলে, তোমার আর খায় কে?

অজিত বলেছিল, থাক না ও কথা।

—থাক। তবে তুমি নামছ ওই বিজনেসে, খুব ভাল হিরোইন হত।

সে কঠিন ভাবে বলেছিল, সকল আম সকলের জন্য নয় বউদি। কারও জন্যে গোবিন্দভোগ, কারুর জন্য খুদে। আমার খুদের ভাগ্য। আমাকে আপনি আর এই কথাটা বলবেন না।

এলাকেশী রাগ করেনি। হেসে বলেছিল, চমৎকার কথা বল তুমি। আচ্ছা আর বলব না। এখন টাকাটা দিয়ে দাও বাপু।

ওই পরীক্ষা দেওয়া তার ভুল হয়। অথবা ভুল নয়, ওইটেই তার মুক্তির পথ করে দিয়েছে।

সে ফেল হয়ে গেল। পড়তে সে ঠিক পারে নি। জ্যাঠামশাই মরতে মরতে মরলেন না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও মুখ ফেরাচ্ছিল না। ডান হাত ডান অঙ্গ অবশ। কথা বলতে পারেন না। গোঙান, প্রলাপের রোগীর মত চিৎকার করেন। আর যা হাতে ডান হাতের চেয়েও জোরে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেঠীমাকে মারেন, তাঁর চুল ধরে টানেন। ছুটে গিয়ে ছাড়াতে হত তাঁকে। মসমসে বিছানায়; গায়ে লাগে। মুখ করেন জেঠীমা; সে অবশ্য কু চরলিন। তাঁর আগেচর ছাড়া তিনি তাকে নাড়তে দেননি। শেষে বলেছিলেন, ও তুমি ভরতে যেয়ো না, ও আমি কাউকে করতে দেব না। আমি পুজোয় বসি, বাথরুমে যাই, থাকবেন কিছুক্ষণ ওই অবস্থায়! ওঁর অনুশো ওই করেছে! আমি বারণ করলাম।

ছেনা আসত মধ্যে মধ্যে, নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকত।

পরীক্ষার ফল বেরুল, সে ফেল হয়েছে।

এর দিন দশেক পর জ্যাঠামশাই মারা গেলেন। জেঠীমা আবার ঘরে ঢুকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, এবার আমার বিধবাদ জীবন নীরা। সেবা আমি কারুরই চাইনে। তুমি আমার কিছু ভেবো না। এরপরই চলে গেলেন কাশী।

সেই দিনই সে চলে যেত। কিন্তু অজিতদা ছিল না বাড়ি। গিয়েছিল বগেয়। তার টাকার ছবি মুক্তি। তার কি সব অনুষ্ঠান জন্য বন্ধে গেছে এলাকেশীকে নিয়ে।

ফিরে এসে সে বলেছিল বলল, আমার ছবিটা রিলিজ হোক। টাকা আটকে গেছে। তার কাছে তো পাঠাচ্ছিলেন। তোর জন্যেও উপায় নেই, পারব না।

ছবি রিলিজ হল। দু সপ্তাহেই ছবি শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বসল অজিতদা। একদিন পর এলাকেশীকে নিয়ে গাড়িতে কোথায় চলে গেল। বলেছিল বাড়িতে বসে রইল, আপিস গেল না।

দিন কয়েক পর একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। বলেছিল চাকরকে বলল, ডেকে দিয়ে বাবুরা সব বাইরে গেছেন। কিন্তু চাকরকে ঠেলে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। অবশ্য তার আগেই বলেছিল বিড়বিড় করে কিছু বেরিয়ে গেছে।

—অজিতবাবু! অজিতবাবু! বলেছিল কে রয়েছে?

এবার বাধা হয়ে বেরিয়ে এল নীরা।

এঁরা তো কেউ বাড়ি নেই।

এক বৃদ্ধ; সম্ভ্রান্ত বাড়ির নিশ্চয়। তিনি বললেন, কোথায় গেছেন?

নীরা বললে, তার আগে আমার কথার জবাব দিন। আপনি এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কেন? আপনি কোন এতদ্র সম্ভ্রান্ত লোক।

বৃদ্ধ নীরার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে হেসে বললেন, চমৎকার বলেছ, বলবার কেউ বাড়ি নেই। অজিত স্ত্রী ছাড়া কোথাও যায় না, আর মা কাশীতে—

বাধা দিয়ে নিজের বাক্তিত্বকে প্রারোপ করে নীরা হেসেই বললে, আরও কেউ থাকতে পারেন, দেখতেই পাচ্ছেন আমি রয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। অজিতের কারবারে আমি অংশীদার। আমার প্রয়োজন জরুরী। আমার মনে হচ্ছে, এরা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করছে না। তাই ঠিক হিসেবটা হয়নি। তোমার কথা মনে হয়নি আমার। তুমি তো অজিতের খুড়তুতো বোন। কিন্তু—। কথাটা কিন্তুতেই চাপা রেখে বললেন, চমৎকার মেয়ে তো তুমি!

চুপ করে ছিল নীরা।

বৃদ্ধ বসেছিলেন ,আচ্ছা আসি মা। আমি বৃদ্ধ, কোন অপরাধ নিয়ো না আমার।

পরদিন আপিসের একজন কর্মচারী এসে রণজিতের সঙ্গে দেখা করতে। রণজিৎ বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। ফিরে এল হাসি-মুখে। পরদিন বথারীতি আপিস গেল। পরদিন সেই বৃদ্ধ এলেন। এবার রণজিৎ সমাদর করে তাঁকে ড্রইংরুমে বসাল। তারপর তাকে ডাকলে, উনি একবার ডাকছেন। কি হয়েছে সে জিজ্ঞাসা করল। হাসতে লাগল। আসতেই দেখে, নতুন জিনি আলাপ করেন। বলছেন, আমার ঠিক কথা চাওয়া হয়নি। এসেছেন ওই জন্যে। ভাল লেগেছিল নীরার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের ওই বিনয়। সে গিয়েছিল ড্রইংরুমে একটু কুণ্ঠিত ভাবে। সে কি বলে কিছু বলেছিল। ঘরে ঢুকেই কিন্তু একটু

PLAYING CARDS
ARATI : LEELA
KAMALA ▮ MAYA etc.
WANTED WHOLESALE DEALERS
NEW POPULAR PRESS
Post Box No. 11405, Calcutta-6

বি,এম,সি,লিঃ'র
মসকুইটো ক্রস স্টিচার্স
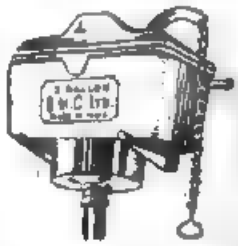
ব্যবহারে বিশেষ উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত
(কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত)
দি কেমেল বেঙ্গলী কর্পোরেশন
(প্রাইভেট) লিমিটেড
১৫, লিণ্ডে স্ট্রীট রোড, কলিঃ-২৩
ফোন নং ঃ ২৪-২৫৪৮

অপ্রস্তুত হয়েছিল। একটি রূপবতী যুবতীও বসে আছে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, এটি প্রমার ছেলে মা। জাল ছেলে, এম-এ পাশ আসল বুদ্ধু ছেলে। একে নিয়ে এই পক্ষে দাঁড়ানোর মানে হল সোসিয়ের দুটি সদস্যের ভোট হারানো। তাই নেমে পড়লাম।

নীরা মুক্তোগুলো নেড়েচেড়ে বারবার দেখছিল। তার পর বলেছিল না। এতে হয়তো অসম্মান হয়েছিল। অপমান নয়। কিন্তু, আর কিছু না।

হঠাৎ কী ভেবে বৃদ্ধ বলেছিলেন, তুমি আশ্চর্যমানা মা। দুঃখ পাওয়ার কথা। তোমার। অন্তত বলার একটা কারণ ছিল। তাই আমি ভিনারে ডেকেছিলাম। যে ভিতিকরে আমাকে অপমান করেছিল। কারণ, এই এম-এ পড়া ছেলে আমার সামনে কথা বলতে পারে না।

ছেলেটি হঠাৎ ফোঁস করে উঠেছিল।

তারপর ঘটনা দ্রুত মোড় ঘুরে। আন্তর্জাতিক-এপক্ষ ফিরে এল। পুরোনো পর তখন। [redacted] ডেকে বললে, নীরা, একটা কথা আছে। সোমেশবাবু তোকে পুত্রবধূ করতে চান। তিনি তোকে দেখে গেছেন। ছেলেও দেখেছে, তুইও দেখেছিস। তোর ভালো লাগে।

এপক্ষী বলেছিল, বহু লক্ষের ভূমিকা।

হয়ে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তবু, সে বলেছিল, ভেবে বলব। সারারাত রাত্রি—সে তার নিদ্রাহীন রাত্রি। ঘরে আলো জ্বলেছিল। সেই আলোর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত রূপসী? তুমি এত ভাগ্যবতী? অকস্মিকতার ঢাকা অতীতের সব দুঃখ, জন্মের শেষ সম্বন্ধকে বারবার কালো মেঘের [redacted] কোথায় যেন তলিয়ে গিয়ে পরপ্রকাশ করে উঠেছিল। জীবনে তোর কোন কবি এই একবার।

বৃদ্ধ সত্যই সম্ভ্রান্ত, সত্যই অভিজাত। রূপসীর যুবতীটি সত্যই শুনল।

সকালবেলা আবার এসে ডেকেছিল, নীরা।

নীরা তখন দেবকান্তে ঘুমিয়ে তখনও ঘুমুচ্ছে। সে জেগে উঠে বলেছিল, ইমা, বলে আমার মত আছে। তবে আমার বাবার যে টাকা কটি আছে তাই সব। তা নাকি নেবে হবে না। তার বেশী নিলেও হবে না।

তাই হয়েছিল। সোমেশবাবু নিজে এসে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন, তুমি যাত্রা চালাতে পার মা। দিন স্থির হয়েছিল অগ্রহায়ণে। জেঠীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। সে লিখেছিল নিজে এবং মাসিমাকে বলেছিল তাঁকে আসতে হবে। তিনি না-হলে হবে না।

সেদিন রাতে সাজিয়েছিল এপক্ষী। সাতের মধ্যের রূপসীকে পূর্ণ গৌরবে রানীর মত মহিমাময় প্রকাশিত দেখে নিজের প্রেমে সে নিজেই পড়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বলা, মধ্য-ফাল্গুনের শ্যামলতার মত উচ্ছ্বসগামী, আয়ত নয়ন, ঘন কালো একরাশি চুলের পৃষ্ঠপটে সে যেন কোন রাজেন্দ্র নায়িকা। নায়কের জন্য প্রতীক্ষমানা। অবনতমুখী। জেঠীমা সম্প্রদান

শিশুদের

সুস্থ ও সবল করে তোলার পক্ষে

আদর্শ টনিক

ডোঙ্গরে বালামৃত

কে, টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৮২ মেডোজ্ স্ট্রীট ফোর্ট বোম্বাই—১।

শাখা:—বিরহানা রোড, কানপুর

অন্যায়ের। বিবাহের পরই জানা হলে যাবে [redacted] সে এক স্বপ্ন।

অকস্মাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। মেয়েরা ঘন ঘন শঙ্খ করে একরাশ বাসন ভেঙে পড়ে তেজীনরূপে আর্তনাদ করে।

প্রথম সন্ধ্যারতিই লগ্ন।

পার এসেছে। সানাই বাজছে। চারিদিকে ব্যস্ততার কোলাহল। ফুলের মালায়, ফুলের সজ্জায়, পুষ্পসারের সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে। এরই মধ্যে একটি মারাত্মক মহূর্তে আর্ত-চিৎকার করে উঠল—আমি কি অপরাধ করলাম? বল—বল—বল। কি [redacted] অপরাধ! চোরের সন্তান যে আমার গর্ভে!

উচ্চ লপিত কোলাহলে তার আর্তকণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেল।

•

ওঃ, সে কি নিষ্ঠুর বাস্তবের নিষ্ঠুরে মুহূর্ত! মহাকাব্যের লগ্নমায় মহা আলো দেখেনি, পুষ্পসজ্জা নিষ্পন্ন হয়নি; সৌরভের ঘনি ওঠেনি; তবে হ্যাঁ, সানাই থেমে গিয়েছিল। ও যে মাঙ্গল্যের বাজনা। মেয়েরা ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল হৈহৈরবে ভর দিয়ে কি হল? তাদের সঙ্গে সেও। থর থর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ে উঠেছিল যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। মিনিটে যদি হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা সীমার বাঁধা থাকে তবে সে তখন এক মিনিটে বহু মিনিট অতিক্রম করছিল। হৃৎপিণ্ড সমস্ত পরমায়ুর স্পন্দনসংখ্যা শেষ করে মুটিয়ে পড়তে চেয়েছিল। অথবা এই ঘটনার সময়টা সংকুচিত করে দিতে চেয়েছিল।

একটি সুন্দরী মেয়ে। মা হবে অল্প দিন। দু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বর পাথর, নরপিশাচ। যার মধ্যে তার স্বীকৃতি সম্পূর্ণ। সঙ্গে [redacted] বন্ধুরা, আর অনেকজন অপরিচয়ী ছেলে।

বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সোমেশবাবুর কাছে এই মুহূর্তে এ কি মূর্তি? হাতের মুঠো-বাঁধানো ছড়িটা ঠুকছেন আর বলছেন, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি জোচ্চোর। ঠগ তোমরা! বেরিয়ে যাও! এ যেন দণ্ডমুণ্ডের কোন শাসনকর্তা—যিনি মুহূর্তে দণ্ড দিয়ে মুণ্ডটা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন।

অজিতদা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ও ব্ল্যাকমেলারস!

মেয়েটির সংপোক্ত বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলছে, না—না—ঈশ্বরের শপথ করে বলছি এ সত্য। আপনার ছেলে আমার অন্তরঙ্গের বহুপাঠী ছিল। আমি গরিব, আমি সাধারণ, কিন্তু সে লেখাপড়ায় অসাধারণ ছিল। সেই সূত্রে আপনার ছেলে আমার বাড়ি আসত। আমার ওই মেয়ে হতভাগিনী, বিবেচনা করেনি, বিচার করেনি সম্ভব অসম্ভব, হাত বাড়িয়েছিল আপনার সুখের দিকে। আমার ছেলের মৃত্যুর পর সেদিকে মধ্য দিকে ঘটেছে এই। দোষ আপনার ছেলেকে জানি দেব না। ছেলে, জাতিসম্পর্ক সিদ্ধান্ত মেয়েকে কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল না। সর্বনাশ তখন ঘটে গেছে। দয়া করুন—

—প্রমাণ কি? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

—এই দেখুন ওদের বিবাহের সার্টিফিকেট ছবি, জিজ্ঞাসা করুন আপনার ছেলেকে।

—কিসের বিবাহ? কই সার্টিফিকেট ভাই?

—রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয়নি। [redacted] ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বরকে ভগবান সাক্ষী রেখে।

—ভগবান সাক্ষী? আমরা গ্রাহ্য আপনি করেন, কিন্তু মতে ভগবান এ বিবাহ স্বীকার করেন? করেন না। চলে [redacted]। আপনি চলে যান।

বাঁচার ধীরে এসে ঘরে ঢুকে নীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কি হল? কি করবে সে? পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা [redacted] বইছে শুধু। হাহাকার ক্রোধ মিলে প্রচণ্ড একটা কিছু। কানে এল পাশের ঘরে এলাকা বলছে, ওরা খবর পেলে কি করে? ছি-ছি-ছি!

অজিতদা বললে, কি করে জানব? আমি কি করে জানব। আমি বরযাত্রী সোমেশ-বাবুকে এ রস উৎসবটুকুসব করতে যাকে করেছিলাম। উনি যে নিজেকে বড় পাত্রপক্ষের মনে করেন। হুঁ:—ওরা আবার কিছু করতে পারে!

এলাকা বলেছিল, তারপর? বিয়ে যদি ভেঙে যায়? টাকা ফেরত সোমেশবাবু, ছাড়বেন না! আমি কি করব বলার মালোটা ভেবেছ?

সকল আবরণ ছিঁড়ে গেল। নগ্ন সত্য তার সামনে এসে বাঙ্গ হেসে দাঁড়াল। না, সত্য ব্যঙ্গ হাসি হাসে না; সে ভাবলেশ-হীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, বল, এবার কি করবে? স্থির কর তোমার পথ।

সেই তার পথের দিকে অপলকে নির্নিমেষ করে দিয়েছিল, ওই পথ।

এ বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে পথ চলে গেছে। সে পথে বারবার চলতে চেয়েও কিন্তু চলেও পারেনি। আজ যেন হবে। এই রাত্রেই, এই মুহূর্তে।

কিন্তু সে করেনি। মালা ছিঁড়ে ফেলে-ছিল, গহনা খুলে ফেলেছিল, শাঁখা ভেঙে ফেলেছিল, কনে-চন্দন মুছে ফেলে, মুখের প্রসাধন মুছে বেনারসী শাড়ি ব্লাউস বদলে সাধারণ শাড়ি ব্লাউস পরে বেরিয়ে পড়বার মুখে দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

ঘরখানা মৃদু সুজিতের ঘর। তার জন্য এখন থেকে সাজানো থাকবার কথা। সুজিতের ছবির খুঁজে সে বের করে নিয়েছিল তার একখানা ছোট্ট সেপিয়া ফোটোগ্রাফ। ছোট, কিন্তু মনোরম সেটি। আর তুলে নিয়েছিল সাজানো দশ নম্বরীয় ঘরো রাখা একটি ছোট্ট ফ্লেমফ্রেমের খালি। তাতে ছিল নয়ন একেলা এক টাকা। বাস্তুর টাকা।

বিবাহ-সভায় সকলের সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠিতা অসমসাহসে সে তখন দাঁড়িয়েছিল মহা সংকল্পে; কুণ্ঠিত মনকলহিতা সে তখন। ফোটোগ্রাফারকে বলেছিল, আপনার পরে আর পরোধকে নিয়ে ফিরে যান দয়া করে। আমি বিবাহ করব না।

চমকে উঠেছিল সমস্ত সভাটা।

অজিত ছুটে এসেছিল।—নীরা।

সে ফোটোগ্রাফটা কেড়ে করে বলেছিল, এসো না আমার কাছে। তা হলে যদি আমাকেও ফিরে যেতে হয়।

হতভাগিনী সেই মেয়েটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। নীরা তাকে বলেছিল, জোর করে তোমার স্বামীকে ওখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাও। সে তোমার দাস। আমি চলে যাচ্ছি।

—নীরা। অজিত আর একবার চিৎকার করেছিল।

কারো সব কথা শুনেছিল। সে তারই মতো চিন্তাহীন মনে শংকাহীন চিত্তে নির্দিষ্ট অবলম্বনে বেরিয়ে গিয়েছিল সদর দরজা দিয়েই। সেখানে ড্রেকেটোরদের সাজানো ফটকের ওপরে রোশনটৌকীর জোকমাল সুরে ছিল অপেক্ষা করে।

—নীরা। আবার চিৎকার করেছিল অজিত।

—না। আজ, মনে হোসের উচ্ছৃঙ্খল কন্যার প্রয়োজন নেই। ফ্রেমফ্রেমসাদের গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা ঘোষণা করেছিল সে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল সে ফিরে আবার ফিরে আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল সে।

ছোরাটাই হাতে রেখে রাত্রির পরিক্রমার পথে এগিয়েছিল নিস্তব্ধে, কলাসেক্সারে এলো খোঁপাটা কখন এলিয়ে গেছে। কাজলসজ্জাটা তবু আটকে ছিল চুলে। পিঠে বিস্তৃত ছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পথে।

তার সৃষ্টি। প্রথম সংক্ষ ওখানেই শেষ হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

দ্বিতীয় অংকের শেষ হল আজ। ৪৯ সালের নভেম্বর থেকে আজ ৫৬ সনের জুলাই; ছ বৎসর আট মাস। হাঁ, ছ বছর আট মাস। দ্বিতীয় অংকের শুরু থেকে আজকের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত জীবন প্রথম অংকের ঠিক বিপরীত। একটানা সাধনার জীবন। বহুক্ষণ জীবন বহুক্ষণ সংগ্রাম। পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু তাঁর খাতার টেবিলে লিখেছিলেন, 'পথই জীবন।' নীরা ফেলেছে সে-গতি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবী নাকি যেদিন উল্কাক্ষিপ্ত হয়ে

উৎসবের দিনে...

পরম্পরের উৎসবের দিনগুলি আবার সমাগত... শুভেচ্ছা ও প্রীতিতে চারিদিক ভরপুর, প্রতি মুহূর্ত আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে... সেরা পাঁচ প্রস্তুতকারক ম্যাকডোনেল ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড তাঁদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধবদের এই আনন্দের দিনে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ম্যাকডোনেল ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড অফিস ঃ ১৫৬, নরিমান পয়েন্ট, বোম্বাই ৪০০ ০২১। পাওয়া ও লিফট সেলস সার্ভিস এজেন্টস ঃ ইন্ডিয়া এলেক্ট্রিক ওয়ার্কস্ লিঃ

বোম্বাই — কলিকাতা — দিল্লী — মাদ্রাজ — কানপুর
আহমেদাবাদ — আসানসোল — ইন্দোর — ওয়ার্ধা — পোরবন্দর

ছুটেছিল আপন বেগে, মাতৃহারা শিশুটির মতো, যেদিন তার যে পরিচয় সংগ্রাম, তার সঙ্গে—যেদিন সে সুদেষ্ণার একরত্তে বাঁধা পড়ে তাকে কেন্দ্র করে যোগাযোগের বাক্য ও কায়-স্তর ক্রৈব সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে ঘুরেছে, সে ছোট ছোটা নিশ্চয়ই কিন্তু সে পরিক্রমণ। সে-পরিক্রমণে পৃথিবী আলোকে-অন্ধকারে ছলে মিটিয়ে ফুলে ফলে ফসলে সবুজে, সলিলে, সাগরকন্যার অপরূপে হয়ে উঠেছে। সাথী শিবরীর অন্তর্যামী তাই। তাদের—থাক সব কথা কেন আজ। সাত্যকির কথা থাক কি করে এমন হল। যে সাত্যকি তারুণ্যের যে পরিবর্তন মধ্য পরিক্রমণ করেছিল শান্ত-সমাহিত মাধুর্যময়ী হয়ে উঠেছিল, প্রসন্নতায় যে ঋদ্ধকেশী হয়ে উঠেছে কি করে?

সেদিন ঘরে আগুন ধরানোর সে ফুল করেনি। প্রথমটায় লক্ষ্য ঠিক করেনি। সে যখন দেখিয়ে আসে, তখন সন্তবতঃ সাহেবটা কারকাছে বেরিয়ে এসে সঙ্গে থাকার সে বক্স ধরেছিল। পরিধানী বৈচিত্র-ময়ী সাদোয় ঢাকা ছাদের কথকারে বিচিত্রিত। কারা চলে, সাদো ঘারা চলে। অন্ধকারের মধ্যে আকাশে ফুটছে নক্ষত্রের আলো, চাঁদের আলো মাটির উপর ফুটছে মণি-মাণিক্যের দীপ্তি, জীবনের সৃষ্টি। এ পৃথিবীতে সে আছে, তেমনি আছে, এবং আছে, এই বাঙালীর সমাজে বিশ্বকর্মী হয়ে বাঁচা চায়, লড়তে চায়, করবার সাধনা আছেন; এই যে তারই পরিচিতে বিশ্বের অপরিচিতা, সিংহাসন মেয়ে সমিতা তাকে, প্রাইভেট টিউ-শনি করে বলতে হবে হবে, পড়ছে, মনের সমস্যার বাড়ির বাড়ছে, ঘরের এক-যেয়ে। আবার মনে হোমের সঙ্গে ঘরে রাত কলকাতার পথে বেড়ায়, হোটেলে যায়, নাচতে হোমে যায়, ঘুরাও আছে। তারই বেশী করে চোখে পড়ে। সেদিন সমস্যের শুধু বাঙালি ঘরকির মনে হোম এই মেয়েদের ছেলে বিশ্বেরেই নাই, আমরা বড় বিশ্বদারাই নাই, বহুজনের মধ্যে বিশ্বে হয়েছে নাঁচতার মত তার মত মত ঘরের বাঙালী ঘরের ছেলেমেয়ে। সেদিন ঘরে উঠবার আগে পথের উপর দৃষ্টি এমনি অপরিচিত ভঙ্গীতে তাকে নমস্কার করেছিল—

সে প্রতিনমস্কার না-জানাই শুধু অন্যে বলেছিল, কি চান আপনারা?

—আগেই বলি, আপনি হোম—আমরা ভাই। আমরা আপনাদের বাড়ির ওখান থেকেই ঘরাঘর সঙ্গে সঙ্গে আসছি। আমরা তোমাকে খুঁজেই বিরেছিলাম। ঘরে ঘরেও খুঁজেই বিরেছিলাম। আপনি কিন্তুই ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দি। মনে হচ্ছে এমনটা হবে ছুটেছিল। শ্রমিকবাবু তাকে টেনে নিয়ে বুক ফুলিয়ে রাখছিল। কারকে এতক্ষণ যেন পেয়েছে আপনি। বলুন, কোথায় যাবেন।

এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে সে বলেছিল, কোন থানায় আমাকে পৌঁছে দিন।

—থানায়? বিস্মিত হয়েছিল তারা।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া নিরাপদ আর কোথাও হতে পারে বলুন। যেখানকার নয়, কল-কাতার কোন থানায়।

তারা ভাই পুলিসের ইনফরমারকে বলেছিল, আমি সমাজ থেকে উঠে এসেছি। আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন কেউ নেই। ছাত্রজীবনে ভাইদের ষড়যন্ত্র করে এক বড়লোকের পাবন্ড ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। আমার বয়স টিনের পর্দা হয়ে কুড়ি চলছে। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম—। আমি আশ্রয়ের জন্যে এসেছি।

ইনফরমারের বাধা দিয়ে চট করে প্রশ্ন করে ছিলেন, কাকে বিয়ে করতে চাও? মানে যে ছেলেকে বিয়ে করে ■ বিপদে রক্ষা করতে পারে বলে? থানা না হয় একটিনের আশ্রয়—।

সে বলেছিল, না। কাউকে না। হেমেন কাউকে আমি একদিনও চিনিনে। কেউ বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ে আমি করব না।

—করবে না?

—না। সে যে পাবন্ড বলবার নয় তা কি করে জানব?

—হুঁ। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর বলেছিলেন, বিয়ের ভয়ে তো আসোনি খাওনি কিছু। উপবাস করে আছ। কিছু খাও, তেমন। ঘর আমার কোয়ার্টারে—আমার স্ত্রী আছেন, ছেলেমে-য়ে আছে, সেখানে চল।

আপত্তি করেনি সাঁতা। সেখানে সব শুনেছিলেন ইনস্পেক্টর। শুনে বলেছিলেন, তাই ত মা, তুমি তো কঠিন মেয়ে। চল একবার থানায় চল, একটা ডেস লিখে দি। সোরেন চাটুজ্যেকে আমি জানি। অফিস মুখোজের একটা এজেন্সও জানি। তোমাকে বাঁচাতে আমার মামাটা বাঁচিয়ে বাঁধি।

ডায়েরী লিখতে লিখতে হঠাৎ বলেছিলেন, তুমি গয়নাগুলো খুলে দিয়ে এলে কেন? সেগুলো কি হোম করবে? সে তোমার বাপের টাকার।

—না, ইচ্ছে হল না। সমস্ত হোমেন যেন ঘিন ঘিন করছিল।

—ঘিন ঘিন করছিল? যাঃ।

পরের দিন তিনি আমাদের এলাকায় থানায় ফোন করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। হেমেন বলেছিলেন, সোরেন-বাবুর ছেলের বিয়ে অনুষ্ঠানে হয়ে গেছে। ছেলেটাই হোম অস্বীকার করেছে, বলেছে, সে বিয়ে করেনি। পাত্রী ওই হোমমেয়ের পক্ষপাতী নয়। অভিভাবকরাই সেধে ভর্তিয়েছেন। ইচ্ছা হোমের ফোরেনও নয়, বাঁধও পড়ে না। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন ঘুরে ঘুরে। কোথায় যাবে বল?

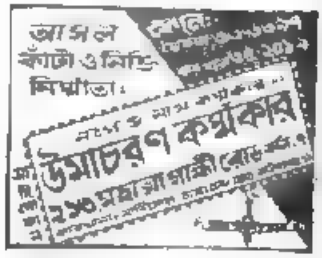

[redacted] শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার সোনার মালতী-সেফালীর বিকীর্ণ সুরভি, মরালের রঞ্জিত ডানার আর অবারিত নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-লক্ষ্মীর বীণার। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্তটিকে আমরা স্মরণীয় [redacted] রাখতে চাই আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর সুরেরই স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার কাছে আরো বিমূর্ত-রূপে উঠবে।

ঝংকার

রেডিও

অপূর্ব ক্যাবিনেট-সজ্জা

পূর্বাঞ্চলে একমাত্র পরিবেশক—
রেডিও সাপ্লাই ট্রেডিং প্রাইভেট লিঃ
৯ রাজেন্দ্রনী রোড, কলিকাতা—২

মীরা চোখে অন্ধকার দেখেছিল, তুই হো, মুক্তি [illegible] নিশ্চিন্তেপনা নয়। কোথায় যাবে সে? কলকাতার পথ উত্তর-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সচক্র শাখায় ছড়িয়েছে। ধর্মতলে ট্রামলগ্ন, ডালহৌসি ছোট্ট চৌরঙ্গীর স্কেয়ার, আপিস -ভাঙার চেতনা ঢেকেছে। আরও উত্তরে এসে ভিক্টর ইস্টি হোলে চিৎপুর পথ শতরকমাপাশী মারকীনিকের নরক। পূর্ব দিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ইউনিভার্সিটি, পথে পথে কলেজ ছাত্রী কলাপলের রঙ ছড়াচ্ছে। যাওয়া চলে এদের মধ্যে। সামে যে ইউনিভার্সিটির দিকে জলীলা সে রকম থেকে দুটো ইটাই একবার ছাড়া অন্যান্য ওই দিকটায় মন হোলার সাধ্যই ছাড়া। কিন্তু যাবার?

আজ মা-বাপকে মনে পড়ছে। কিন্তু সে জাঁতুলি। অসীম সন্তার সাথে আর আকাশ মাথার নিয়ে সে সেই নিশ্চলক নিশ্চিন্ত থেকে ছেড়েছিল, মাপুর? কারও সাহায্য পর সন্ধিছিল পুরোছি অনাথ আশ্রমের জন্য। একটা সম্মিলনীর ভাল ছোট্ট ঘর, আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিল।

—সেখানে যাবো? ভাই হো! ছোট্ট ঘর আছে, কিন্তু সে তো ঠিক ছোট্টকে ওই অনাথের জন্য নয়। তারা—তারা সবাই, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমার মত একজনের সঙ্গে—তোমার ফ্যান্ডাটা কি বলছো? জান না তুমি?

—আমার কোন ফ্যান্ডাই নেই আমার ফ্যান্ডা আমার নিজের।

—গুড্। এস আমার সঙ্গে। দেখি তোমাকে জন্যে আর আমার পুরা। এস।

গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে এলেন একটা বাড়িতে। ডাকলেন, সবা আছেন? আসা?

—কে? বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক শীর্ণ বৃদ্ধ। —আরে মোকল ভাই? কি ব্যাপার? ওয়ারেণ্ট আছে না কি? এসব কার কাছে বলছো? না ঘোর সরকারের নামে?

পিছনে একটি [illegible] বাচ্চা-ঝিহিনী। তের চৌদ্দ হাতে [illegible] চাকরের সর্দার।

—এদের আজ সব ছাটাকে নিয়ে যাব।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। ছোট্ট চারটির বড়টি ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করলে, ভাড়াই লাড়াই। ভদ্র ভদ্র!

মোকল এবার বললে, সাদা, এই খুকীটিকে নিয়ে এসেছি। শুনুন বিবরণ। এ ছেলে ভর্তির রয়েছে, তাপনার হাতে ছেড়ে অনেক বাচ্চা, খুলে ডাকবাংলোর মত। ছোটগুলিকে পড়াবার ভার থাকবে। তাপনার প্রতিভা নিয়ে আমি নিজের কাজে অনায়াসেই মনতে পারি, এমন মোকেটাকে সাত্য ভদ্র ভদ্রলোক নিয়ে পারলাম। শুনুন বিবরণ।

বিবরণ শুনে তিনি বলেছিলেন, বড়ো ভাল। বড়দের কথা ভাবা চলে। ছোটদের পাবার খুশিতে পরিণত হয়। হবে তুমি এখানে এই ছেলে কিনা ভিনদেশের পড়ুয়া পড়াতে চলে। তুমি মনে মনে কতকটা ভেবেছ হয়ে যাবে। নিয়ে ভর। এই সময়ে কলিকে কলকে বেশ ছোট একটি ভেবেছিল প্রাকৃতির মেয়ে ঘুরিয়ে দাঁড়ে বার্ক মন যায় আসে। সে এই ছোট্ট শুদ্ধ পড়ুয়ে। ছোটদের ভেবে যাবে

ছোকল বলছেন ইনি কে জান? বিশ্বাত আর্টিস্ট বিমলাক্ষ মজুমদার।

—সে-কি! আপনি কিছু, জানেন না। তাঁর ছবি আমরা পাঠ্যে দিইনে। ছোটদের দিই। আমি তাই সাক্ষাৎ বিধাতাকে পেয়ে। এই সব ছবির জন্যে এরই জন্য নয়, আরও আছে। আমি, যত কথা বলছি, তার অর্ধেক

সন্তোষ বিস্কুট কোঃ(প্রাঃ)লিঃ কলিকাতা-১১

উৎসবের আনন্দ
পরিপূর্ণ করে তুলবে
নূতন ডিজাইনের গহনা

চাষ, তিন কন্যা, এক পুত্র। এক পুত্র বসেছে জানীগঞ্জে, তার তিন। জমিদার এক। ওদের বন্ধু—তারা বলে শিতেমশ। তাদের পুরুষ ব্যাপার, তাদের ছেলেপুলে ছেলে সম্বন্ধে-তারা পুত্রে পুত্রে পুত্রে ফলাবে একেবারে পাকাপাকি আমার সাজানো এই পুরী, এরা হবে তার ভাবী ভূমি। এরা সব নাতি নাতনি, এরা সব নাতি নাতনি। কর্তাদের দুই সম্বন্ধে ছোটো এই ছেলে। তাদের ছেলে তাদের ছেলে এক ছেলে বিয়ের আগেই ছেলেরা সবাইকে সব ভাগে ভাগে ভাগে ভাগে। তাদের ছেলে। তাদের ছেলে ছেলে ছেলে

ভাঁড়ারের চাল নিয়ে ভিতরে যায়। গোটা রেলনের চালে কল ঢেলে দেয়। তার পরেরটা দিনদুপুরে হুতোয় লন্ঠন চেঁচায়; হাতে লেকের স্কু-ড্রাইভার ছুরি কাটারি নিড়েন, একটা কিছু, চাই-ই। বছর চারের বড়ল. ওর মধ্যে মায়ের ট্রেসিং টেবিলটা পেরেক ঠুকে ভেঙেছে। ডাক্তার আসছেই আসছেই। ওষুধ, পা কেটেছে, ওর টেনসিল। নাড়ুর অসংখ্য লেখাপড়া আছে। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, তিনি মাতৃভাষায় ভীত। তবে শারীর অসুস্থ তাতে সন্দেহ নেই। বড় ভাই-পো চাকরে, কিন্তু ভাগোবিভোয়। মেজ ভাইপো ব্রাহ্মণ ভাঙে, কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি, আপন মেজাজে আছে, তার পরোয়াটা বড় কারুকে পড়ে, একটু খোঁচার. কিন্তু বেশ লোক। বড় কমপ্লিটি আশ্চর্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট ভাসাই ডাক্তার। ও ছেলে ভাল চাকরি করেন। সুখের এসার। সুখ ওই মানুষটাকে ঝেপে ধরে। হবু কলহ বন্ধে। বড় ছেলের সঙ্গে যায়ে, সে উপাদান তার নূতন কিছু আঁকুল। বলে, আপনি জানেন না কত বড় বিপদী আপনি। ইনি চটে। হয়ে মধ্যে ফোপ যান। মধ্য মা এবং ক্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। কারণ তিনি সংসার চালান এবং সেটা ক্রাহির করেন। কলকাতা ক্রীর সঙ্গে বাসে মধ্যে মাসে, সে ভাঁজি করে, তিনি পাকে নিয়েই থাকেন। তার তাঁর ধারণা, তবু তাঁকে ঠিক তাঁর উপযুক্ত চলোকা করে করেন না, নড়ুর অধিকাংশ লেখাপড়ার মূলে তাঁর আছে। তারা মাঝির ভালবাসাতে মাতৃভাষাতে। তবু, স্ত্রী বলেন, কি খারাপ কাজে তাঁদের তুমি অসম্মান করো বিয়েছ। সুখের বিরোধ। বড় পুত্রবধূ, ঝগড়া কে করে না, তবে গলা মূলে না থেকে, মুখে করে। স্বাস্থ্যবান মানুষ, কলকাতা মনে হয় এ বাড়িতেই একে তে ধনা চলাফে কখনও ওপরে ও বাড়িতে পড়ে তার কোন সাড়ই ছিটকে না বড় প্রায় পাশে থাকে। বড় জনাই তাকে আশ্চর্য পাড়তে। সুস্থ সবল মন। সরল গৃহকর্মে নিজে তৃপ্তি করে, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, হাসিমুখে। স্বাস্থ্য সন্ধ্যায় বাপ-মাকে দেখতে আসে। ছোট কামাই গাড়ায়, কৃতী ছেলে, সেও সুখের চাঁদ নয়, সেও সোনার। ছোট মেয়ে বাপের সর্বাপ্রিয় সন্তান, চোখকের মেয়ে, কিন্তু তাহারও পোকা, সবসুই ভয়ে অস্বস্তি তার ঠিক ঠিক ছোট ছেলে বাইরে থাকে, খুব কৃতী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বাস্তবিকারী সুবাসিনী। ছোট বউটি মানুষ হিসাবে বড় ভাল। তাদের দুই সন্তান—একটি ছেলে, তার একটি ওই সুগন্ধিমলের গান. অন্যটি বাচ্চা, একটু বেশি ছেলে প্রেমুসানই তার একমাত্র বন্ধু। কলকাতা কলকাতা, কলহ, দুর্গা-কাহিনি ও এক গ্রাহক মুকুন্দার মধ্যে মূল একটি সুর বাজে আছেনই শুধু মাত্র, সে সুর তাদের সে সুর সুখের। সে ওই মানুষটির জোড় করে। এই বেড় বয়সের সেও ওই সুরে কাঁদবার সুর বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক সময় দেখে খুশি হয়ে উঠেছে, কাল এইবার সে সুখী হতে পারবে। কিন্তু অবশ্যই, প্রবের কিছুক্ষণ না করোকদিন পরেই দেখেছে, ঠিক সুরে সুর

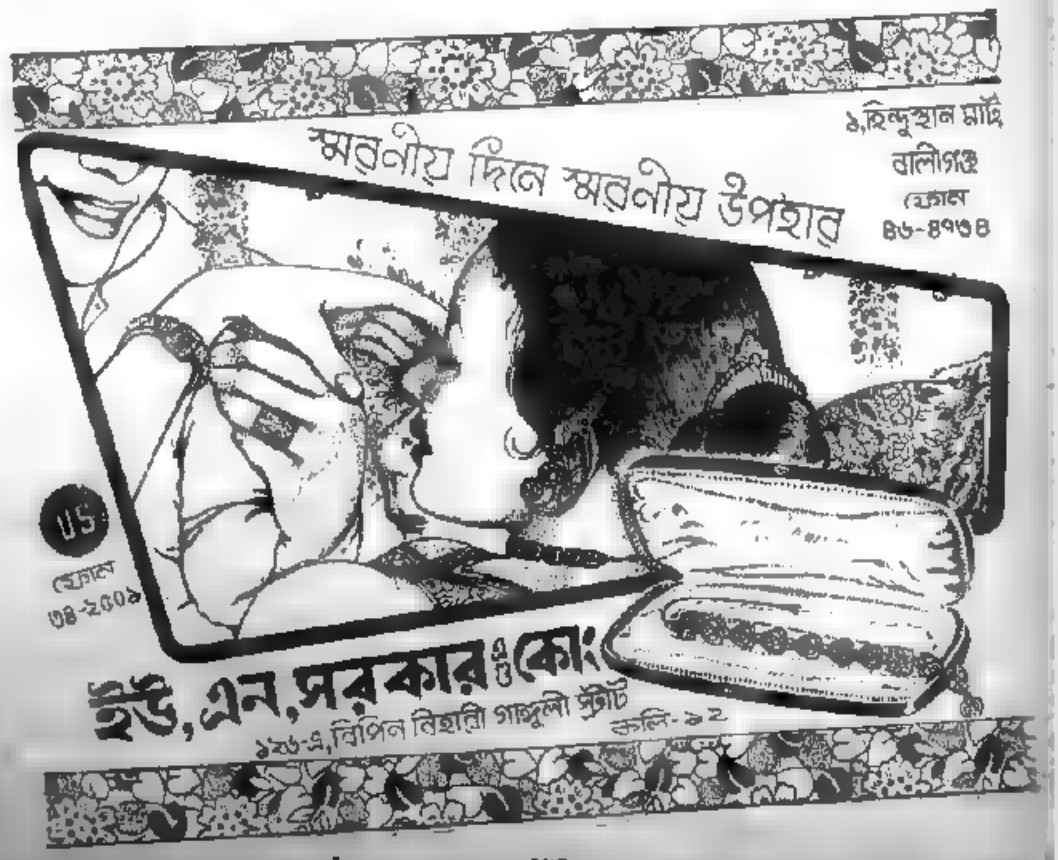

পূর্বপুরুষদের [illegible]

[illegible] ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল ফলাতে শুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। [illegible] প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন [illegible] তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী [illegible] স্কান্ডিনেভের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ [illegible] আগে সম্রাট সেনহুত এর চাষ শুরু করেছিলেন চীনে।

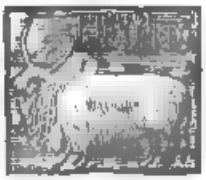

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যেও যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদারোয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের গবেষণা জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো জানা যায় যে এর চাষের অন্তত আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য।

আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণাগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আচার ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হয়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ করে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পায়েস দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি শস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং পাকস্থলীর ক্রিয়ার সহায়ক বলে [illegible] অসুখে [illegible] বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'সিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিটেড (ইস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উচ্চফলনের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'সিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পায়।

অ্যাসোসিটেড (ইস্ট) লিঃ (ইংল্যান্ড প্রবাসিত)

FEY 2004

ছিলাম না। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিল, বিভিন্ন বেদনাহত অন্তরে ওই বৃদ্ধকে দেখে। মেন কষ্ট হচ্ছিল, কত উদাসীনতা! অন্যে মনে চোখে জলও পড়তে দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছে, ঠিক তাই মত বন্ধুর মনের মূল কথাটি এসব সময়ে পাওয়া। স্টুডিয়োয় ঢুকেছেই এই বিষণ্ণতা হারানোটা আত্মপ্রকাশ করত। উনার দৃষ্টি মেঝেয় আঙুল, চোখে জল পড়ে। ও ঘরে সে ঢুকত না। স্যাহস হত না হয়ে। ভাবত, অন্তরিকতা চুরি। সে নিজের অধিকারের পাশ্চা কখন ফেরত করবে? উনি স্টুডিয়োতে ঢুকলে বাড়ীটার প্রত্যেকেই প্রহরগুলি মন্ত্রিসভার মত গুরুত্বপূর্ণ উনার করে শাসন করে, চুপ। ছবি আঁকতে বসেছেন। চুপ। ও ঘরে যবে না ছেলেরা। মিস্ত্রিরাও কথা বলে না। উনি তেরিয়ে এসে চুপি চুপি দিয়ে দেখে আসে, কি ছবি আঁকা শুরু করেছেন কিন্তু ইজেল ছেড়ে ফিরে আসে, দেখেন পড়ে রয়েছে। ক্যানভাসটা পড়েই আছে। অবশ্য তুলিগুলি ধরাছে কিন্তু আঁকেন, ঐঁকা ছৈ ছৈ করে, উনি বিষণ্ণ হয়েন।

একটা মজা সে আইন-এ পাস করবার কথা ভিতিতেন। প্রথমত ফিল্মের মধ্যেও আর কিছু, যা ছোক সে পড়াশুনোর সুবিধেটা পেয়েছিল। তা পেয়েছিল। অসুবিধে ছিল, তবু আনন্দের মধ্যেই সহ্য হয়ে গেছে। এঁদের বাড়ি যাওয়া আসা ছাড়া আর কিছু পেত না, তবে পরেরো কাপড় জামা দিয়ে-ছিলেন, আর পরীক্ষার ফিজটা দিয়েছিলেন। মনে এই বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে দশ টাকা পেত, তা থেকেই চালিয়ে কলেজের মাইনে। সম্বল একশো এক টাকার নোটটাই খরচ হয়ে গিয়েছিল তিরিশ টাকা।

পরীক্ষার ফলে সে খুশি হল। ফার্স্ট ডিভিসন, অখুশি হবার নয়। সে সন্ধ্যাবেলা ছুটে গেল সন্তুকে প্রণাম করতে। আজ অধিকার অন্তরিকতা বিশ্লেষণ করতে যা, গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে। উনি চুপ করে বসেছিলেন। সামনে ইজেল ঢেকে আছে কাপড়, তুলিটা নামানো, উনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটু, চঞ্চল পায়েই সে ঢুকেছিল, তবুও তার চলনটা তবল হয়নি। ভয়ে ভয়ে একটু কেশে সে বলেছিল, মাদু।

—কে? ও। কি খবর? কিন্তু লোভানো মিলছে, তুমি তো কখনও এখনে আসো না!

—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছি মাদু!

—ও। বসতে আজ্ঞা।

নীরা এবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, কিন্তু এইবার যে বড় ভাবনা হল মাদু। এবার?

—পড়। পড়ে যাও।

—পড়া ঠিক এই রকম করে হয় না মাদু! তা ছাড়া—ওহে মাদু।

—কেন ভাবছ আমি তোমার ইচ্ছেতে তুমি আমার উপর চেপে বসতে চাও? না, তা ভাবব না। তোমাকে চিনি।

চুপ করে একটু বসে থেকে সে প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই বলল, বই, প্রটোকলি টো কিছু? একটা দাগও পড়েনি।

—না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাদু?

—কর। বল।

—বাড়িতে প্রায়ই শুনি আর-আপনি তাগিদ দিয়ে করতে ছাড়া তাঁর ছবিতে মন হয়ে নিজের তাগিদে। কেন?

মুখের দিকে চেয়ে কথা খুঁজিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরা সহজ করে বলল, মাদু।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কখনো করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অরূপ অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত সূর্যোদয়, প্রতিদিন পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, বন্ধু বান্ধব ফুল ফল যা প্রিয় পাখি পাখি বিদেশ, শিশু বৃদ্ধ নগ্ন, অনগ্ন বিচিত্রা প্রেমিক মধুর ভয়ংকরাই, ছন্দ সমাপ্তিসুখ দেখেছি আর আঁকিয়েছি। ঝড় এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি, আলোর এঁকেছি, বাসনা এঁকেছি, ক্রন্দন-নাথ এঁকেছি, সুভদ্রাচন্দ্র এঁকেছি। আনন্দ পাই, অনেক বন্ধু, তার সংখ্যা আরও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম? অথবা এ সবের ভিতরে মিশি ব. ক একটা কিছু তাকে ছুই আঁকলাম? পাচ্ছি না যে তাকে। যা যা যিনির মনো এ সব আছে সেই বিশ্ব-টিপ! তিনেই শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। ভিতে—আমার সব মিথ্যে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।

বলে আকাশের দিকেই চাইলেন আবার। নীরা সন্তর্পণে পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। তিনি আবার ফিরেও তাকালেন না।

এই দ্বিতীয় অন্তরের প্রথম দৃশ্য। মধ্যে শুধু ছায়ার রেখা আছে। তা থাক। বেরোবার রাস্তাতে, পাখিদের কিচিরমিচির মত সহজ আনন্দে প্রসন্ন।

আনন্দ হল মেন রাতির পর দিন।

•

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত মেন দ্বিপ্রহরের পায়ে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক পড়ছে চারদিক থেকে, ঘণ্টা পড়ছে ইস্কুলে। আপিসে

নবপ্রকাশিত 'পাল' পুস্তকাবলী

PB-15 আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষ :

লেখক—ডেভিড ই. লেলিয়েন্থাল; অনুবাদিকা—সুধাময়ী বসু। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি কী করিতে পারে। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা।

PB-16, রক্তপলাশ :

লেখিকা—ভবানীদেবী। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শিউলি গল্পগুচ্ছ। বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পের সংকলন। মূল্য—৭৫ নয়া পয়সা।

PB-17, আকাশ রাখিপায় :

লেখক—শ্রী হিরণ্ময়, অনুবাদক—অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন চৌধুরী। বিশ্বখ্যাত লেখকের রচিত্রায় সংকলিত সমগ্র। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-18, মুক্তধারা :

লেখিকা—হেলেন কেলার; অনুবাদক—অমিয়কুমার সেনগুপ্ত। অন্ধ, বধির ও মূক মহীয়সীর আত্মকথা বাংলা। মূল্য—৭৫ নয়া পয়সা।

PB-21, আকাশের পরমাণুকৌস্তুভ ভবিষ্যৎ :

লেখক—এডওর্ড টেলার ও এলেন্থার এল. নোরিস; অনুবাদক—বীরেশ্বর ভট্টাচার্য-পাধ্যায়। ডি ভিল, বেসারন বিভাগ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক। সচিত্র। মূল্য—৫৬ টাকা।

PB-22, এব্রাহাম লিঙ্কন :

লেখক—লর্ড চার্নউড, অনুবাদক—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য। সেই মহাপুরুষ যোগিতাপেরই ছোট জীবনকথা। ৪৩৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—৫৬ টাকা।

পাল পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১

একমাত্র পরিবেশক। ইণ্ডিয়া বুক হাউস
২০-এ, সিনেমা স্ট্রীট
ধর্মতলা স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩

আপিসে লোক ছুটেছে। প্রভু খুশেছে। সে চিন্তায় পড়েছিল। এখান থেকে কি করবে সে? এখানে এসে কাজ কিছু নেই। ছেলেরা ঠিক তার কাছে পড়ে না। নামমাত্র বলে। তারপর উঠে যায় ওদের কাছে শিবনাথ-বাবুর বড় ছাত্রদের কাছে।

হঠাৎ সর্বাঙ্গ কে চমকে উঠল। বাদু চিৎকার করছে, বিনো-দা! আরে আপদ। বিনো দা কি স্লেট। ভূত ভগবান, সর্বশক্তিমান তুমি ভরসা। অভিমানের বদলে আজ নেশ প্রেমের ভাষা! হে বিনো-দা!

হা-হা হাসিতে গোটা বাড়িটা ভরিয়ে বিরে কে হেসে উঠল। এবং সে এক ভরাট কণ্ঠ-স্বরে বিভঙ্গভাবে বললেন, আরে-আরে ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে। বাদু! ইউ আর লাভলি, ইউ আর গড-লি! আই আম মাডলি ইন লাভ উইথ ইউ।

—চুপ, খবরদার বিনো-দা, তোমায় ছুঁয়ো খাবো। বিশ্বাস কর, মুখে গন্ধ নেই, পুরোনো দাঁত একটাও নেই, ক্রোম জমা নেই। তুমি আজ দু বছর আসো নি। কিন্তু টুপিটা কেন? ওটা তো আগে পরতে না।

অবাক হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, টাকার জন্যে বন্ধু, টাকার জন্য। দেখুন না।

—হে ভগবান! এ যে প্রায় মনুষ্যত্বের পাদদেশ করে ফেলেছ। প্রনবরঞ্জ মিটিং বুঝি? কিন্তু দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। না ইয়ে অক্সফার্ম জুটো হ্যাপ্পুডের দলে জুটে মিটিং বাড়িয়ে তুলেছে? কিন্তু তাকে তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড হতে। সরকার বন্ধ করবে নাকি!

—হামোচ্ছর। ও সব বন্ধ হিয়েছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু টাকা পড়ার কারণটা বুঝলাম না। তবে তো নেই, আমাদের হয়ে গেল। তা থাকলে এখন আপনার কণ্ঠের মজাকে ডাকুন, কিংবা বিলাতি মিস্টেস আছে, অর্থাৎ টিক লাগেনি। আকাশ করা যাক, আসিয়ে নেওয়া যাক।

—এ যে অনেক গো, বিনো-দা! এত?

—সেখানে যে আমার ছেলেরা আছে। সে তো কম নয়। আপনি তো জানতেন, নাত আটটি। এখন সব পঁচিশটি। ওরে-বাবা পাতালপুরী পঞ্চাশ হিয়ে তাঁবুর উপর পাকাবাড়ি, ইস্কুল, কোর্টঘর। বুঝলেন না। সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি পরেছিলেন, দেখে এসে চটি ডিরেক্টরকে এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছেন, বিশ বাইশটি ছেলে, তা বিনো সেন খুব ভাল ম্যানেজ করছে; ডাক্তারের দল হবে না, ওঁকে টাকা দেওয়া উচিত। তা টাকা দিয়েছেন।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা ঠিক না নীরব। কে এই মহাপুরুষ? এতগুলি ছেলে! পাঁচশটি! ঠিক যেন ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। বাদুর জ্ঞান বন্ধু সবচেয়ে নেই, হয় তো দাদা। তা হলে বোধ হয় নাতি। আট নয় সন্তানের পিতা, আট নয় সন্তানের গড়ে দু বছর অন্তর সন্তান হলে, দু বছরে ষোলটি আঠারোটি, এর সঙ্গে আরও সাতটি যোগ করলে অবশ্যই পঁচিশটিই হতে পারে আরও বেশী প্রমাণ এই অসম্ভব। ওদিকে বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, বাদুর বড় পুত্র দুই নাতি উঁকি মেরে দেখে সোর-গোল তুলেছে, বিনো-দা, দিদি দিদি বিনো-দা এসেছেন, মা পিসীমা বিনো-দা!

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল। বাচ্চা-গুলো এরই মধ্যে সাইস করে ঢুকেছে। সেই কণ্ঠ-

দুর্গোৎসব

সৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে ধ্বনি। সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অথবা আধুনিকতম রাগ-সঙ্গীত—যাহাই চর্চা আমরা করিনা কেন, শব্দব্রহ্মের সত্যতা আমাদের এক নিগূঢ় শক্তির আস্বাদ দান করে। দেবদেবীর আরাধনা ও মন্ত্রের সুগম্ভীর ধ্বনিও মুহূর্তেই আমাদের এক অকল্পনীয় ভাবলোকে নিয়ে যায়। সেখানে চরিত্র, ধৈর্য, মহত্ত্ব ও শান্তি। আগমনী গানের সুরসৃষ্টিতে দেবী দুর্গার আবাহনে সেই ভাবলোকের নিরন্তর শান্তি আজ বাঙ্গালীর জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রসোমালাই

কলিকাতা

স্বর শুনলে নীরা। —এস বন্ধুগণ গ্রহণ কর, টফি এবং লজেন্স! এস এস। এস এস, বাঁশী এস, হুইস্‌ল এস।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিনি। —আ বিলো-দা, পথ ভুলে নাকি? বাপ! জানি তারজন্য স্পেশতরে গিয়ে, ফনে বিলেত টিলেত গিয়ে, প্রত্যেকবার তারা স্বাধীনতার পর খুব সুবিধে দিয়েছেন দেখবার, কারুর প্রেমে পড়েছেন এতকাল পরে।

হেসে সারা বিলো-দা। —বলেছেন ভাল হো। কিন্তু ওটা ঠিক মনে হয়নি মিনি, সঙ্কল্প চেষ্টা করা যেত। কিন্তু প্রোডা বড়াই আমার। সেই জন্যেই পড়ে আছি, অন্তত ইস্কুল নামক বন্ধনে! নিন, হুইস্‌ল লজেন্স খান।

—হাসিক খুব। আমি লজেন্স খাব? আপনি খান।

—আমি তারা রাস্তা খাচ্ছি। খাই। বেরুবে বাসুদেও দিয়েছি।

—তু খান উনি, আমি খাব না।

—তবে এই নিন। ঠাকুরকে দেখুন তালের গুড়। চমৎকার জিনিস।

—নীরা, নীরা। এবার হুইস্‌ল চেটিয়ে উঠলেন দাদু। আরে নীরা নেই?

বড় নাতি ছুটে এসে তাকে ধরে টেনেছে, দাদু, ডাকছে। জলদি। বিলো-দা এসেছে। এস, এস।

চোখে সব সোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ কথা শুনে বা কল্পনা করেছে, তার কিছুর সঙ্গে মেলে না। শুধু, তাই নয়। সে প্রায় অভিভূত হয়ে গেল! ছ ফিটের উপর লম্বা, সবল স্বাস্থ্যবান। তামাটে রঙের সাঁমান্যতে উপনীত, রক্তাভ গৌরবর্ণ, এ যে ইতিহাসের তলের কোন মানুষ। টিকলো নাক, ঘনের মত, চোখ দুটি ছোট, কিন্তু কি দৃষ্টি তাতে! তবে মত প্রসন্নতা তত কৌতুক সেখানে অবরই। দীঘির তরঙ্গিত জলের মত আলোর ঝিলমিলি তুলে রয়েছে; হঠাৎ নড়ত হয়ে গেলে তাতে জলে সেই আশ্চর্য দৃষ্টি, একটি সুবর্ণর প্রতিচ্ছটা চোখেও তাহার জলতে ওঠে। তাকে দেখেই সেই দৃষ্টি তার চোখে ফুটে উঠল। জলজল, যাঃ!

দাদু বললেন, হুঁ, শুধু বয় নয়, বয় বহুত আচ্ছা ছেলে নীরা। ওর যা ইতিহাস সে শুনলে—

—শুনব পরে। কিন্তু এমন ফিগার এমন, মুখ, এর ছবি আঁকেন নি?

—ছবি? না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দাদু!

—নাও, তুমি টফি লজেন্স নাও। কি নাম? নীরা। বাঃ নীরা। বসো, বস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প
দাম—৬·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রেমের গল্প
দাম—৬·০০

সুবোধ ঘোষ
ভারত প্রেমকথা
দাম—৪·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রূপসী রাত্রি
দাম—৫·০০

সুবোধ ঘোষ
শতকিয়া
দাম—৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন শূন্য
দাম—৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
গ্রন্থদশটি
দাম—৩·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মনের মানুষ
(যন্ত্রস্থ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেক্স
চিন্ময় বঙ্গ
দাম—৪·০০

সন্তোষকুমার অধিকারী
বিবেকানন্দ চরিত
দাম—৪·০০

নরেন্দ্রনাথ সরকার
গল্প সংগ্রহ
দাম—৬·০০

সতীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে
দাম—৩·৫০

সন্তোষকুমার অধিকারী
ছেলেদের বিবেকানন্দ
দাম—১·২৫

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প
(যন্ত্রস্থ)

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫৮ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

আমার কাছে লজ্জা করতে নেই দেখছি, আমি বিনো-দা। ইউনিভার্সেলাস।

মিসি বললেন, এই খানে খাবেন, ইজিপ হাণ্ড আমাই।

—আমাদ।

—এখনও নিয়ে-থেসে খান না-কি? ছিট্টীয়িন?

আমরা হাসি। সেই হবেভরা হাসি। হারে-পর বললেন, না। তা আর হইবে। তবে খাপাটা সত্যিই ভাল ছিল।

—আর ভাল ছিল।

—ভাল ছিল না? রঙটা দেখাচ্ছেন তো? এ ওই লিম থেকে।

—আমার আর রঙ পরিষ্কারের বয়স নেই, ওই আপনার কৃষ্ণকলি বাদুকে বলুন। তারপর হঠাৎ বললেন, নীরা তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার রঙ কালো নয়, কিন্তু একটু মাটো।

বিনো-দা বললেন, না না না। স্বর্ণ-লতার আর শ্যাম-লতায় তফাৎ আছে বৈকি। ওই সাহেবিয়ানাতেই ও অপরূপা। জিজ্ঞেস করুন মানুষে। কি মানু?

মানু বললেন, কি বলব বল, 'তুলসীশ্যামা লিখন্তিস্তনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি' মধ্যে আমে চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' এ তো পড়োনি। আর আমাদের এই শিল্পীর চোখ তো নয় ওর। খুনের জন্য সর্বনোশ হয়ে গেছে। নইলে বিনো-দা তুমিই বল, আমার ভুলে আসো কথা কালোরূপে থাকবে কেমনে চোরবালি মুখ হয়।

বউ ঠুকে আসাল সঙ্গে সঙ্গে ফেন ফিরল। মিসি হয় তো ঝগড়া করতেন, কিন্তু ফেনটার জন্যে হুলস্থুল বাধা হয়েছে, বললেন, বলব কি বলুন। বউ মেয়ের সামনে, [illegible] এখন চা খাবার পরিস্থিতি। নীরার ঘর থেকে হারমোনিয়মের পরিচিত গান ভেসে এল।

—কে আবার করছেন। কিছু বলবেন, পাঠানো হয় ছাড়ে।

আমরা একসঙ্গে হেসে উঠি। এ কি কণ্ঠস্বর! কোন রবীন্দ্রসংগীতের। কিন্তু যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি গান গেয়ে গাওয়া। ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। জানালার লোহার গরাদেতে হাত দিলে ঢেউ পাওয়া যায় কম্পন উঠছে। লাইব্রেরিয়ান—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি?
হায়, বুঝি তার খবর কেহ রাখে না।
পরিমলের মধুর গন্ধ পাও—কি—
হায়, বুঝি তার সন্ধান কেহ পায় না।

রোমাঞ্চিত-কায় ৬ষ্ঠ সংস্করণের জীবন হেসে, লোহে কম্পমান, সব স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে। গলুনো চা তো এমনই তার উজান বইত। কিন্তু ভগবান থাকে কেন, তাকে কি এমনি করে দু হাত ভরে বিয়েও আসতে হয়, পরিপূর্ণ করে উপচে মাটিতে ঝরে পড়ে? এ গলা তো গান গাওয়ার মত গলা নয়।

মিসি বললেন, কি বলি। সুধা আপনার প্রেমে আছে আর কেউ তোলে না।

আমার সেই হাসি।

মিসি বললেন, একখানা তাঁর রসের দেখা। রবীন্দ্রনাথই।

—উঁহু। এগুলো এই প্রেমের গান, সদ্য শিখেছি এখন। সেগুলো পুরনো মনে হচ্ছে।

একটি আদর্শ সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান

দি কমনওয়েল্‌থ এসিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :—পুণা
স্থাপিত—১৯২৮
প্রধান কার্যালয় :—৮২, মেকলেজ ষ্ট্রীট ফোর্ট, বোম্বাই—১

দৃঢ়তম আর্থিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত "কমনওয়েল থ" সন্তোষজনক সেবা দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আপনার সাধারণ বীমা বিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

কলিকাতা শাখা : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

টেলিগ্রাম—কমনওয়েল্‌থ : টেলিফোন—২২-১৯৪১

—ভবে স্বদেশী।

—মহারাজাকে যৌবন দুভা করেছে, সেই দিন থেকে বন্দুকটাই তুলে দেখি। কাইন্ডই, ওই জঙ্গল আশ্রয়টা করেছি, তাই করি, ছবি আঁকি, ও সব সময়মতো ভাসিয়ে দিয়েছি।

এখন গান শুনুন—বলেই ধরে দিলেন,

কারা হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা—

তারই মধ্যে চিরন্তনীর সইল গগনের জ্বালা।
এই কি তোমার খুশি,
আমায় তাই পরালে মালা
সুরের পথ চলা।

গানের পর গান, বেলা বেড়েই চলেছে। তাকিয়ায় মাথা রাখলাম। সে রাত্রিটাও রইলাম তিনি। ছেলেদের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কি করে! বিকেলবেলা দাদু ডাকে ডাকলেন, বললেন, নীরা, বিনো-দা তোমায় কবিতা শুনে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, তুমি-কবি ওর অনেক-কাজের মাঝে, কাজ করে, তবে উনি তোমার কাজ দেখেন। বি-এ পড়ারও খুব সুবিধে করে দেবেন। অবশ্য স্কটিশচর্চে।

বিনো-দা বললেন, আমার এক মাস্টার-মশাই আছেন। খুব্বেদ্ধ। পণ্ডিত লোক। সংস্কৃতে কলেজেই পড়াতেন। রিটায়ার করে বৃন্দাবনে, তোমার কবিতাগুলি, মহর্ষিদেবকে সেই ভৈরবের ধারে। সেশনটার সময় আসতে দিয়ে দিয়ে এসেছেন, খুটো লাগি এসেছে, আর কিসলা ফুল, নাকী সুর বাজছে। সর্বনাশের! আমি তাকে ওখানে নিয়ে গেছি। মা কালি সেবা করি, উনি এটা ওটা করেন। তুমি পড়লে সাদেকে পড়বেন। মাইনে দেবে চারশো টাকা, আর খেতে পাবে, মা বোন মেজদি-ফিজদি। আরও দুটি মেয়ে-মাস্টার আছেন, একটি মহিলা আছেন ছেলে বাচ্চা-দের দেখেন, এঁরা সবাই কিচেনের খাবার খান, তার ওপর নিজের যে যা পারে করে নেয়। এই আর কি! তোমার মত একটা মেয়ে যদিলাদেশে জন্মায় শুনেই তো আমার লাফাতে ইচ্ছে করে। বই-কাগজে এ মেয়েরা দুঃখে দুর্দশায় কেবল অশ্রুপাত করছে, মিথ্যে বলছে, নিজেদের দেখছে, চোখে ভাসছে আর কান্না পড়ছে, ঠোঁট চট চাপছে, এই তো শুনি। এমন হয়েছে যে মেয়ে দেখলেই সন্দেহ হয়, তুমি যে কাদু, কি এই কবিতা। যে তোমাকে কথা শুনে ভাবী ভক্ত হয়েছে। তোমার মত মেয়ের উৎসাহই আমি করছি না শুধু, মনে করবা হচ্ছে, আমারই পড়ে তুলতে পারব।

সেও এক ভক্ত বিনো-দার কবিতা শুনে-ছিল।

বিনো-দা—যিনি সেই, আমি স্কুলে পড়তে পড়তে সংস্কৃতজ্ঞের চেষ্টায় প্রথমবার বই

পড়ে ভেতরে ঢুকেছিল। ইতিমধ্যে তার অনেক ছাত্রছাত্রী তখন তার তিন বছর বয়স, ১৯৩১ সালে।

তিন বছর ফেল- সমর কারাদণ্ড হয়েছে ডিটেনশনে। তারপর বাইরে এসে গণ-সংযোগ। ছবি আঁকা তখনও বন্ধ হয়নি। জেলে প্রথম কাটেরালা। তারপর বাকিরা ৪৪৫ ডিটেনিউ। ডিটেনশনের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল, ইচ্ছে হলে বিদেশে যাওয়া হয়। ডিটেনশনের আর একটা সুবিধে ছাত্র-ছিল খুলনা জিলা সোলপুরের কাছে মহান বিপ্লবী নকশালদের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ওখানকার জেল বিপ্লবীদের সঙ্গে ভাব জমে গেছিল। বেরিয়ে এসে গণসংগঠন করবার ইচ্ছে হলেও এসে আর সক্রিয়রূপে আর ইন্দুরে পড়ে আবার এলেন ৭১, মেসে হয়ে, ফেরারিকার একটি-বিনোদ সেনের বাড়িতে থেকে এই বছর খানি বিপ্লবী ছাত্র কলকাতার কাটিয়ে-ছিলেন। সেই সময়েই দাদুর সঙ্গে আলাপ। কিছুদিন বিজয়ও করেছিলেন। সেই সময় বিনয় সেনের সুবাদে এসে ওকে বিনো-দা। এরপর আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত কলকাতার ফিরলে। বেশী সময়টাও সঙ্গে লাগল বিনো-দা। তারপর বিয়ে ও হঠাৎ আবার উধাও এবং এতদিন মহাত্মাজীর আশ্রমে। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ থেকে গিয়ে এসে একবার গল্পসংগ্রহ। সেই সময়ই এই অঞ্চলে বিয়েছিলেন। সঙ্গে আড়ুই পরে-বিয়েছিল সাল। ফের বিনো-দ জেলে। বেরুবার পরিবর্তিত সালে। তখনই এই অঞ্চলের অবস্থা। বিপ্লবীদের এই জায়গাকে ছড়িয়েছিলেন গান্ধীজীর পরে বিয়ে সমস্ত বেশনের পেলেন, তখন ৪,৮০ দিকে মন্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে। তিন গুণি তিনজন পরিশ্রমিত কলকাতার ছেলে, একটি সুত্রে তার গুণি চরকে ছেলে। কাজ শুরু করেছিলেন কাজের নিয়ে সাত-ব্রীজের বেশ আগেই। এখন, জেলে তিনি পেলেন একটি বড় বিপ্লবীর সন্ধান। সেই বছরই তিনি পেলেন ছন্দন। আশ্রমের তার নিয়ে গেলেন এক অনুশাসনী নারীকে। যিনি এলেন কর্মবীরীর হিতৈষীত্বের পত্র। অবশ্যি মাস কয়েক হয়েছেই। বললেন, কি চায় আর ছবি এঁকে! চরকারী তিনি বু ছিলেন পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু তার কোনটা নিলেন না, এসে বললেন এই মহাশাচুম, সেই পুরুষটিরে। গড়ে তুলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, তখন "ঘর ঘরই আসতেন, বাদুর বাড়ি আসতেন, দু বেলা খেয়ে ওর খুশিয়ে তবে বেরোন। মাঝে মাঝে বিরক্ত যেতে হয়। একদা মহাত্মার ছেলে গেপ্তারিলেন, তখন যাঁরা ছাপ্পান্ন তখনও দাঁড়া এই মেয়েরা প্রো-গ্রামিন বিপ্লবী কর্মীকে ছেলেন, তার মানও

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড

(স্থাপিত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সাল)

অনুমোদিত বিক্রয়কৃত এবং
বিক্রীত মূলধন—৫,৫০,০০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—
৩,০০,০০,০০০, টাকা
সংরক্ষিত তহবিল—
৩,১০,০০,০০০, টাকা

হেড অফিস :
মহারাজা লাজপত রোড, বোম্বাই, বোম্বাই।

শাখাসমূহ—
কলিকাতা—২ ডি, ডেভিড রোড, ৯ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৫বি, রাসবিহারী এভিনিউ। আহমেদাবাদ—রায়। বেনারস ব্যাঙ্কিং, এলাহাবাদ ট্রিক, লাজপত রোড, মেরেঠ ট্রল, বরেলী-পুরের, বোম্বাই—আলেকজী, বান্দ্রা, বি,বিলেস এরপোর্ট ফার্ট স্ট্রীট, কেলাবা, ফার্ট, মলবারহেল, মালাবার হিল, সায়ন। আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, বরোদা, ভুজ। ভাঁড়া, কটকিকা, কোয়েম্বাটোর, বিল্লী গাজীবাদ। কাঁচ, ঢাকাদরাবাদ। ডেভরাল। ওয়ালটেয়ার, ভূনেশ্বর, ধানবাদ, মাদ্রাজ, মেরোরাপেট, নাগপুর, নাসিকপুর সিটি সিউনিস্ট্রী পালামপুর, পুনা, পুনা সিটি, রেঙ্গুন্দাবাদ, রোজাপুর, সুরাট, সেকেন্দ্রাবাদ, ত্রিচিনাপল্লী।

বৈদেশিক শাখা সমূহ—লন্ডন—৯৫, ব্রডওয়ে, ফ্লাক্স, ই সি ২। এডেন, ক্লাক-এর সাথায় কিন্তু, আইপাতা, করাচী, ফ্রেঞ্চকলা এইরোলী, ওমারা, সিঙ্গাপুর, মাস্কট।

পৃথিবীর সকল প্রধান দেশে এজেন্টস ও করেসপণ্ডেন্ট রহিয়াছে।

পরিচালক বর্গ—ডাক্তার আলোকচন্দ্র কলকাতার, ব্যারেনেট, কি সি-ই, কে-সি-আই-ই ডেপুটেশন, মিঃ এ সি ব্রক, ডাইরেক্টর চেয়ারম্যান, মিঃ মণিলাল সম্পা-ভাই, মিঃ ডগলিয়স ব্রাডম্যাকেন, মিঃ কুলদানাথ কে গোয়েঙ্কা, মিঃ কলভার এম. ডি ব্যাঙ্কারস্ট্রে, মিঃ মনমোহন ঘনশ্যামদাস, মিঃ এম. ডব্লু কৌসারো, মিঃ জাহাঙ্গীর-ভুলাল ফেরোকা, মিঃ কর্নেলিয় বিজলাল।

জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ টি. এম. মলবারওয়ালা।

অডিটরেরা অফিসি—মিঃ এস. বি. ইলিবাম।

ডিপোজিট মূলে বিনিময়ের জন্য সকল হত এবং তদুপরিবর্তিত সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের অন্য ব্রেঞ্চিং সেওয়া হয়।

লাভের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কারের আলো-চনা করা।

এস, কে, চৌধুরী, এজেন্ট,
২৩বি, চৌরঙ্গী সুরের রোড, কলি-১

নব

অগ্রদূত

সংবাদ !!

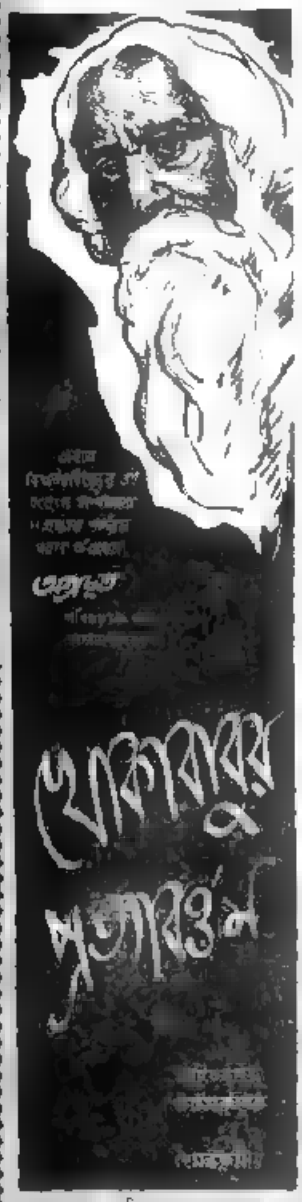

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ঃ
দীপ্তি রায় ॥ অনিলবরণ
শোভা সেন ॥ জহর গাঙ্গুলী
শিশির বটব্যাল ॥ সীতা
মুখার্জি ॥ তিলক
বা বু দা ... ও
পূর্ণচন্দ্রিমা লাহিড়ী

— পরিচালনা-পরিচালক বিভিন্ন —

শুনেছেন। তাঁকে ডাকতেন শিক্ষাদপ্তর; সমাজকল্যাণ দপ্তর। তিনি যেতেন। পরে কারুর বাড়ি ইলিশ রান্না না খেয়ে আর গান না শুনিয়ে যেতেন না। প্রায়শ্চিত্তের এই দু বছর একেবারে আসেননি। দু বছর পর এসেছেন বাড়ি মেতে উঠেছে। উপরন্তু বাড়ি উজ্জ্বল হয়েছে। এই সব'জনটি বিনো-দা, বিনো-দির স্নেহাস্পদের মিলন চান। তিনি বললেন, যাবে আশ্রমে সবাই ?

নীরা বললে, যাব।

এতো তার জবাব। একজন আন্তর্জাতিক লেখক কেমন করে আটপৌরেদের খবরাখবর লিখে নিয়েছেন—

শিশুর চোখে পড়ে থাকে নগণ্যের কণা

ঝরনাধারার তরে ঝরনা তাঁরই লিখে আনা—

তার লিখে ? চরাচরে প্রকৃতির সমুদয়ে

বস্তুদিনের সঞ্চয়ের নিমন্ত্রণ চেয়েছেন।

এতো ধ্রুবতারার আলো।

চল উত্তর মুখে। ওই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

॥ ছয় ॥

এসেছিল বিনো-বাবু সঙ্গে অনাথ আশ্রমে। এই তৃতীয় সন্ধ্যা, এই দ্বিতীয় জনের সঙ্গে দেখা। দু সপ্তাহ ধরে একটি সন্ধ্যা। শেষ হয়ে যায়। আকাশের নক্ষত্রও খসে পড়ে অন্য দেখা। মানিক নয় ? প্রাক্ সে কথা। আনন্দে বিস্ময়ে এবং আশা নিয়ে এসেছিল। এখানে দেখা-শোনার দিনের কথা মনে পড়ছে। বিনো-দার আশা সে এসে নামল। চারিদিকে নূতন সাড়ির পত্তন হয়েছে, রাজমিস্ত্রী মজুর খাটছে। একপাশে কতকগুলি মাটির বাড়ি। সবই দো-চালা ঘর। সামনে বারান্দাটুকু বেরোনো। আঁকা-বাঁকা কাঁচা শাল কোটে লাগানো হয়েছে—যথাসম্ভব কম খরচের জন্য বোধহয়। ওদিকে ঘর পত্তন হয়েছে চল্লি জন ভূমিহীন রাজমিস্ত্রীর আয়োজন। লাল শ্যামলোজ্জ্বল শিশু আদেখলেপনি ছড়ায় তন গেরুয়া রঙের মাটিতে প্রান্তর, তার মধ্যেও ছোট্ট ছোট শাল-চারা জন্মেছে অজস্র। পথে পরমানন্দ-ভাজি কর্পোরেশনের দুর্গাপুরের বারোজের জাজ খুলছে আয়োজন দেখে এসেছে। তারা যেতেই গোটা আশ্রমে সোরগোল উঠেছিল।

বিনো-দা এসেছে। বিনো-দা, বিনো-দা, বিনো-দা। ছোটো আশ্রমের ছেলে মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীরা তিনজন। বিনো-দার চালা [redacted] দেখতে কয়েকজন গ্রামের লোকও এসেছিল। গ্রামে আবার লোকজন বসতে শুরু করেছে। গরমেরও করেছে। এক দুপুর এসেন। তিনটে বাকী রইল না—ইনিই সেই মাস্টার মশাই। কিন্তু উচ্ছ্বাসটা যেন না ছেলে। সকলের চোখে মুখে একটি প্রশ্ন লেগেছে—সুলেখা এ কে ? অর্থাৎ নীরা। নীরা মুখ নত করতে বাধ্য হল। শিক্ষয়িত্রীদের ঘরে গোপনে ইশারা শুরু হয়েছে, একজন একজনের আঙুল উঠছেন। কিন্তু চোখে তারই উপর। একজন স্থূলাঙ্গী—একটু, বয়স হয়েছে। অপরজন ক্ষীণাঙ্গী, বয়স ধরা যায় না, তবে বয়স অপরজনের কাছাকাছিই হবে। তাদের পাশে আর একজন, বিধবার সজ্জা—মেয়েটি সুশ্রী—তার থেকে কিছু বয়স বেশী, দেহের বহিশ চৌত্রিশ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। অপরূপ বিস্ময় এবং প্রশ্ন তাঁর চোখে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, একটি কথা বিনো ?

বিনো-দা বললেন, ও নীরা, এক ভৈরবী মেয়ে এখানে কাজ করবে। ওই সুলেখা-দের শান্তিলতা করবে। আর আপনার ছাত্রীও বটে, আপনার কাছে পড়বে। আই এ পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। যি এ-র আর আপনার মাস্টার মশাই। আরে আমা ধরে টানিস কেন ? কোনটা রে ?

শিক্ষয়িত্রীরা তিন চারটে বাক্স ও'র কাছা ধরে টানছিল।

স্থূলাঙ্গী মেয়েটি হেসে বললে—ওদের পাওনার জন্যে ওরা যে সব চুলা-বুরুল করছে।

বিনো-দা বললেন, সকলে সাবধান, এদের চুলবুলুনির শিকারদের ওস্তাদনি আছে। আমি তো পলিটিকাল লীডার ছিলাম, আমি তো জানি, র‍্যাঙ্কের হুকুম না এলে মাইনরদের আক্রমণ শুরু [redacted] না। এবং আমি আরও জানি যে, ওদের ঝিমি-মানিমা ও মা-মণি ওদের চেয়েও [redacted] ঠিক খেতে ভালবাসেন।

একেবারে হোসে কেউও পড়লেন স্থূলাঙ্গী, তিনি ওই ক্ষীণাঙ্গীর কাঁধে হাত দিয়ে হাসছিলেন, ক্ষীণাঙ্গীও হাসছিল। বিনো-দা বললেন, একটু সমাদে সুলিয়াদি, বেচারী কমলা কাঠির মত মানুষ আপনার ভারে [redacted] হয়ে না ভেঙে যায়।

সমবেত [redacted] হেসে উঠল। এমন প্রসন্ন উচ্ছিকতার সন সেন [redacted] উঠেছে। অনিমাদি তো হেসেই খুন। ক্ষীণাঙ্গী কমলাও খিলখিল করে হাসছে। নীরাও হাসছে। কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়ল খিলখাটি দূর করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিনো-দা এগিয়ে গিয়ে টফি এবং লজেন্সের ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, যাও বন্টন করো। কিন্তু তুমি হাসছ না কেন প্রতিমা ?

—হাসছি তো !

—না! যাও ছেলেদের মা-মণির কাজ করো।

কতকগুলো হাতে নিয়ে বাকীটা ঠোঙা-সুদ্ধ তার হাতে দিয়ে বললেন, দিদিমণিরা আমার কাছে। এখানে উনিটা চুপ, রাগে, বড় থেকে ছোট। ফার্স্ট অনিমাদি। রাগ। যাও কমলাদি। যাও শ্রীমতী নীরা—এস-এস। আচ্ছা। এইবার মাস্টার মশাই। এবার আমি। নিজের মুখে লজেন্স পুরতে পুরতে

বললেন, সিঁড়ি থেকে কেবার পড়ে বেলাকে নেবেছিলাম সাত। গোপীনাথ কবিরাজ ঘনশ্যামের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এ প্রশ্ন কার? তোমার হতে পারে না। বললাম—কেন বলুন তো? বললেন, এ প্রশ্ন যারা করবে তাদের মুখের চেহারা আলাদা হয়। আর সে বয়সও নয় তোমার। বুঝলে!

—হাঁ-হাঁ। কি বললেন?

—বললেন—একটু নির্জনে চলুন, বাচ্চারা ঘিরে ধরেছে।

নীরাকে ট্রেনে নিয়ে তখন অনিমাদি আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য চেহারা ভাই তোমার। দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, আবার ভয়ও হয়। বলেই জড়িয়ে ধরে আলাপ শুরু।

—কিন্তু ভবিষ্যতে যদি মেন্ট হও, তবে আর সুখের সীমা থাকবে না। এই লক্ষণ তোমার, আমার তখন জোটা হয়ে যাবে। বলেই হাসতে শুরু করে দিলেন।

কমলাদি বললেন, আমাদিও তোমার বেশ ভাই। নীরা।

নীরা এবার বললে, প্রতিমাদি কি এখানে? আপনারা বিনিমাদি উনি না-হাঁ-ন কেন?

হাসি শুনে, কম্পার্টমেন্ট অনিমাদি কিন্তু কমলা একটু হেসে বললেন, অপিমাদি ওকে! সে থেকে গেল।

তরুণী একজন, উনি ছোট বাচ্চাদের দেখেন। তাই মা-মাসি।

ট্রেনটা আবার বললেন, দেখ, আমরা ঠিক করেছি, ছুটে যাব হয় জীবনে সবকিছু হারিয়েছেন, বিনো-কে তো দেখছ, উনি এখান এত আনন্দ ছেলের মা করে দিয়েছেন। তবুও প্রতিমাদি আমাদের প্রাণে এসেছেন। দেখ এর উনি বিনো-কর আগেছিল, তা না-হয় তো আগের চেনে ফেলে। বিনো-কে একটু দেখা কেহও আছে প্রতিমাদির সন্তানও একটু, বেশী আসে আমরা হ পারি না। এই জন্য কি! প্রতিমাদির অফিসে সুযোগ আছে। সুযোগ না। উনি ওইরকম।

নীরার সৃষ্টি এবেই মধ্যে আবেগ হয়েছিল বন্ধু নিষ্কলঙ্ক এবং নিঃস্বার্থ নিজে। পড়াশুনা আলোচনার মধ্য সুযোগ। এ বিনো নেলকে সে এই কলিজের ছাত্রী দেখেনি। এ এক নতুন মানুষ। গোপীনাথ কবিরাজের কথা এই কিছুদিনে আগে আনন্দবাজারে পড়ছে। বিরাট মনীষী। যে মানুষ তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করছে সে যেন ঘরে পড়ছে পুণ্যলাভের হওয়াতে নয়, সে যেন এই জুড়ুরে একটি পথারের বা ধাতুর তৈরী পদার্থের মত হয়ে গেছে। শুধু শিল্প সুন্দরই শুধু নির্মাণ হয়ে ওই পদার্থের ভিতর লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ গোলমাল উঠল। অনিমাদি বলে উঠলেন, গেল, গেল, স্যুটকেস একটা গেল।

নীরা ফিরে দেখল, প্রতিমার বেড়ুয়া টীকা কামরা নিয়ে সুটি বড় ছোলেটে প্রচণ্ড মারামারি বাধিয়েছে। প্রতিমা একটা বাচ্চাকে বুকিয়ে নিয়ে ওদের পিটিয়ে নিরস্ত করবে। তবু ওরা ছাড়ছে না।

—আমি ও পারব নিয়ে ছুটতে পারব না, তুমি ধরে রাখো ভাই।

আমি পারব এই ইতিহাসের সংখ্যা? তাহ ইংরেজ পুলিসদের ধাক্কায় যা করেন, জানো তো। ট্রেনে বিনো-কে ওরে।

নীরা বলল, আমি যাচ্ছি। সে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। সাহায্য দরকার না। এবং দুই হাতে দুজনকে

বিভিন্ন পরিকল্পনার
সুষ্ঠু রূপায়ন

তাম্রলিপ্তহারবার সেতু — ২৪ পরগণা

চ্যাটার্জী ব্রাদার্স

বিল্ডার্স এণ্ড আর্কিটেক্টস্
১৪এ প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা ২৬

গ্রাম : "স্ক্যাফোল্ড"

ফোন :
৪৬-০৮১৯
৫৮-১০০৭

ধরে কঠিন কণ্ঠে বলল, ছাড়! ছাড়!

অপরিচিত একটি মুখ এবং সে মুখে যেন একটু কিছু ছিল যা তারা মা-দশি বা দিদিমাদিদের মধ্যে দেখে নি। দেখে তারা ছেড়ে দিল; কিন্তু মুহূর্তে পরেই একটি ছেলে ক্ষুব্ধ হয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। দুজনে মুহূর্তের মধ্যে সে তাকে ধুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে—তোমাকে আমরা শিক্ষা দিতাম আজি, কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম।

প্রতিমা সেই বিস্মিত চিত্ত পুতুলটি তুলিয়ে আছে তার দিকে। নীরা বললে, আপনাকে আটচ করতে দেব কি ডেকে।

—না। সাঙ্কিপ্ত উত্তর দিয়েই সে ফিরল। এবং ট্রাফিক কনস্টেবলের চোখটা এড়িয়ে কিন্তু অপিসারকে বললে—ওকে বলো, এ আমি ভাবি পারছি না। লোকও এসেছে, লোকেরও অভাব হবে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। বলেই সে দ্রুত পায়ে চলে ছেড়ে ওস্টিকের ফুটপাতের দিকে।

অপিসারি এবার হাসলে না—বললে, মরুন তোমার!

কমলাদি একটু হাসলে। নীরা বললে, কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার? ব্যাপার আবার কি? তার এপর তুমি এসেছ। আর কিছু আছে?

কমলাদি বললেন, থাকতে থাকতে সবই বুঝবে ভাই খাম কিছু দিন।

অপিসারি বললেন, বুঝবে আর ছাই। ওই সাহেব মত লোকটাকে আমার করে দিলে না।

কমলাদি বললেন, তোর ভিতে দিল ভাই। মন যে বড় অবুঝ!

অবুঝ মেয়েটিকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, ওই ও প্রান্তে মাটির ভরণ্ডীর এলাকার মধ্যে ঢুকেছে। তখন ক্লান্ত গাড়িতে।

নীরার আর সহ্যহেলনার সীমা রইল না। সে বুঝেছে—এই সুন্দরী মেয়েটি ভিক্ষা-পাত্রে ভালবেসেছে। ভিক্ষা-দাও তা জানেন। হয় তো বা জানও বলেন। তবে? তবে, কোন ভাবে এ সুখ দিয়েছেন? কিসের জন্য? এত মানুষের এত আয়োজন? একটু মাত্র লাগল তার। কিন্তু হঠাৎ এমন আহ্বান করলেন কেন? হঠাৎ নিজের মনেই প্রশ্ন করলে, তাকে দেখে? সে হাসতে গেল কিন্তু পারলে না। ছি!

পরের দিন থেকে শুরু হল অভ্যর্থনা। ভিক্ষা-দাই এসে তাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি নীরা-দি, বুঝলে। ইনি তোমাদের অঙ্ক কষাবেন, ইতিহাস পড়াবেন। আর তোমাদের খেলার মাঠে তোমাদের ভলিবলে চমৎকার খেলবেন।

কাল মুই ঘণ্টাকে যা শিক্ষেছে করেছেন পুরোদমি আমি। ছেলেরা কটমট লক্ষ্য—তেমন হাসছে। তিনি হাতখানা টেনে তুলে নেওয়ালেন। আজার চোখমি সুন্দর ছিপিছি চেহারা এবং মন। তোমাদের কলড়া-ক্যাঁটার বিচারও উনি করবেন। তোমাদের ঘা-ঘাণিকে তোমারা বড় ঘিরছ কর উনি লাজলিনট মানুষ; এই সব পুরোহতপনা ওইসব পারবেন না। তাঁর প্রয়োজন হল, উনি আপনি পুরুষের আর ওই ছেলে বাচ্চাদের দেখবেন, যাতে ফোটফাট নইই দেখবেন। অপিসার হয়ে থাকবেন। বুঝেছ?

প্রতিমা ভিক্ষা-দার কথাগুই এসে চোখে-ছিলেন ক্লাসে। প্রথম দেখাই একটিভাবে কাছ হল ভরণী ভাল লাগল। সাজটে দিন আগেকার মতো কিন্তু মিনট দু মোল-মিনে খোল দল বুঝতেই পেরে পারলে না। সব সময় চুলে ঘুরে রয়; মাঝে পাতাটকে ওরই মধ্যে একজন চার্ম মাস্টার আছেন, তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে খেলেন খাটান। ইথন অনেক বাজার হয়েছে, চোলো হাজ। অপিসারি পুলিসে ঢুকতে শুরু, কাজন, তখন যোগাযোগ করলে একেবারে রেগে খুন হন।

দুহাতে দেখলেন। কমলাদি বিকেলের দিকে চলে হয়ে যান, পুরোজ আমুখ। নীরার ডিউটি আছে খেলার মাঠে, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি। অপিসার-ঘরে বইটইগুলি রাখতে এসে প্রতিমার সঙ্গে আলাপও হল। স্বল্পভাষী মেয়েটি। দেহে মনে খুব সবল মন বলে দেখলি, তার উপর সাজ-সাজের-ছেড়ে স্যোহ। বললেন, তোমার কথা সব শুনেছি ওর কাছে। আমি তোমাদের বিপোর্টের কাছে। এ খুব শক্ত মেয়ে, বন্ধুদের চেয়ে তুমি।

নীরা বললে, জলে ফেলে দিলে সবাই দেখে যায়। শুধুমাত্রই বললুম আর অমনটই বললুম আমাকে যে জলে ফেলে দিয়েছিল। কি বলব, হাঁটু পা ছড়তে ছড়তে কূল পেয়ে গেলাম।

প্রতিমা হাত বাড়িয়ে দেন—না। কি বেরোতে চাইলেন তিনিই জানেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, শিবনাথ বাদুর বাড়িতে কাকে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

—এই তো এবারই। একটিমা।

শুভ কার্ত্তিক বন্ধুরা
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

চশমার ও দাঁত বাঁধাইয়ের কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ডাক্তার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা ও সর্ব্ব-রোগের চিকিৎসা হয়। আধুনিক ফ্রেমের কলিকাতায় বৃহত্তম ষ্টকিষ্ট। চশমা না করিয়া দেখিয়া গেলেও আপনার উপযুক্ত ফ্রেম সম্পর্কে ধারণা করিতে পারিবেন

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল অপটিক্যাল এণ্ড ডেণ্টাল করপোরেশন
২৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট (লালবাজারের নিকট), কলিকাতা-১২। ফোন : ২২-৪০৬২

আনন্দোৎসবে অপরিহার্য
"কাকাতুয়া" মার্কা ময়দা
"হ্যারিকেন" মার্কা ময়দা
"গোলাপ" মার্কা আটা
"ঘোড়া" মার্কা আটা
প্রস্তুতকারক
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
মার্কেটিং এজেন্টস
শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ
নিবেদক : চৌধুরী এণ্ড কোং
৪/৫, বাজলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

—সে কি? কবেরাই তো উনি দেখেছেন কলকাতা! শিশির পথে।

—তা জানিনে। আমি তো সেদ্ধ বছরের মধ্যে দেখিনি।

—ও হাঁ। উনি যে এ-কবার আসান-সোলে উঠেছিলেন, আসানসোলে নেমেছিলেন। তারপর হঠাৎ উঠে এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল আমার কথা বলা হয়নি। ছেলে বুঝে এমন করলে! একটু হাসলেন, হেসে বললেন, কিন্তু মনে করনি তো?

—না—না। সত্যিই আপনার যা নরম-স্বভাব আর ডেলিকেট শরীর তাতে ও সামলানো সম্ভবপর হত না। বোঝহয় ফেলে দিত আপনাকে। তবে, বড় সুন্দর আপনি—ওদের তাদেরই বশ মানা উচিত।

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন খোলা বারান্দার দিকে—তারপর বললেন মৃদু। কিন্তু হাসি ফুটে উঠল মুখে। না। সেই দুর্বোধ্য —না!

খেলার মাঠে সে ফোরে বেরে পাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল না, যে বখন পড়ল তাকে নিয়ে তুলল। ধুলো ঝেড়ে বললে, যাও যাও, খেলা যাও।

বিনো সেন একটু চুমুট মুখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। খেলার শেষে বললেন, ওয়ণ্ডারফুল। ভেরি ওয়াণ্ডারফুল মেসন।

সন্ধ্যেবেলা অধিমাদি স্কুলেকার দেহ নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বললেন, কেমন লাগল?

—খুব ভাল।

কমলাদি একটা ওয়ানকাত তৈরী ডেক চেয়ারে শুয়ে কপাল টিপছিলেন—হেসে বললেন, স্বাস্থ্য ভাল তাই। ভাল লাগল। বাপ, খেলার মাঠে যা ছুটি তোমার!

সীতা বললে, ব্রাণ্ড কিন্তু প্রতিযোগিতাকে ভাল লাগল। অনেক হল। বেশ মানুষ!

অধিমাদি বললেন, কাল যে মেকফার্সন-কাঁহাকে হয়েছে। সেদ্ধ ঘণ্টা!

—মানে বিনো-দা?

—হ্যাঁ সে। মোজ একটি করে মেকফার্সন অবশ্য এই এলেন বলে। সকলের ঘরে এসে খোঁজ করবেন, হাসবেন, হাসাবেন। মেকফার্সন সাহেব শিখ, বুঝেছ! তারপর ঐর ঘরে গিয়ে কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন এক ঘণ্টা। অধিমাদি, পড়ান—ধর্মশাস্ত্র সীতা জানুক। কিন্তু কে শোনে? ওই হাই চশমা দিয়ে বাল, ও শনিনিবাস ফেলে উড়িয়ে দেয়। কিছুতেই বুঝবে না বিনো সেনের মত মানুষ কাউকে ভালবাসে না, বাসতে পারে না!

সীতা বললে, কেন বলুন তো? উনি কি এমন, যে কাউকে ভালবাসেন না, বাসতে পারেন না?

কমলাদি বললেন, না। ঠিক তা নয়। উনি যে মানুষ ওতে বিয়ে আর করতে পারেন না। তাছাড়া উনি প্রতিমাকে ভালবাসেন, কিন্তু ওঁর ভালবাসা সেন্টিমেন্টাল। আর প্রতিমাদি তার ধার ধারেন না।

—কমলাদি! অলিমাদি! বাইরে থেকে কেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। বিনো সেন।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন অলিমাদি।

—আসুন!

—এসেছি। আরে বাপরে, মীরাদি সুদ্ধ? ব্যাপার?

অলিমাদি বললেন, হ্যাঁ। তিনকনে খেড়ী। এক কলো রবীন মাড়ুজ এক কলো খাল—এক কলো রলে করে বাপের বাড়ী যান।

—তা হলে শিবঠাকুর খুঁজি আমি। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—মীরা কলো বা কলো—তাতে ও কতটানও দুবে না—হুড়ো শিবও মেরে না। দেখেছেন তো খেলার মাঠে: ওঃ, চুলগুলো যা উড়ছিল, একগাল কালো চুল। ওয়াণ্ডারফুল।

মীরা বললে, এসব বললে আমি কিন্তু খেলার মাঠের ভার নিতে পারব না।

—আচ্ছা আচ্ছা বলব না। আমি একটা পরীক্ষা করলাম। ছেলেরা তোমাকে দেখে খুশি হবে ভেবেছিলাম। তা হয়েছে। এখন চল, মাস্টারমশায়ের কাছে—পড়তে। বসে আছেন তিনি।

অলিমাদি বললেন, প্রতিমাদির বাড়ি [redacted] না?

—গেছে এসেছি।

মৃদু হরিশ্চন্দ্র যদু মধুসূদন হেমন্তমুহূর্ত হাসছে। বললেন, মেয়ের আর কিছু নেই না। মন পেয়ে, সেব কার জন্যে? নিজের জন্যে কি? সবই বাজুলা মনে হয়। তবে মেটুকু আছে, যতক্ষণ পারি দিয়ে যাই। তুমি হলে সুবিধে হয়ে আসবে। পড়াতে গেলে সব ভুলে থাকি। তুমি আমায় বাঁচালে।

পড়া শেষ করে যখন বিনোদ যখন প্রায় সন্ধ্যে। বাইরে বিনো-রায় সাম গোলা যাচ্ছে; একটু এগোই দেখলে আসল বাড়ানোর পাঁচিলে তিনি গান গাইছেন, 'কামাহারির দোল দোলানো দেবে আগুনের পালা।' তেমনি একটি চিমনী অন্ধকারে টোকিদের উপর। একখানা বই ও নামানো। তিনি কারিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছেন। তিনি তার পায়ের শব্দে ফিরলেন মোমবাতি। একটা মাটির দেয়া তার পায়ের নিলপাতের চলে মড়মড় শব্দে ভেঙে গেল। —কে? মীরা?

—হ্যাঁ।

—পড়া শেষ করে বিদায় নিচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আলো নেই ছেন? এখানে সাপ আছে।

—এইটুকু তো পথ।

—না। দাঁড়াও। একটু আগে একটা বড় সাপ বেরিয়েছিল মাঠে। টর্চটা নিয়ে পথে নামাচ্ছেন। চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, কেমন পড়লে?

—খুব ভাল।

—হ্যাঁ খুব ভাল পড়ছ তুমি। কাল সন্ধ্যেবেলা উজাড় করে দিয়ে ছেলেও সবাই তা পারছে না। সেইজন্যেই ছাত্রদের চোখে হয়ে সব ছেলে বড় টাস্কমাস্টার। যারা পারে তারাই মহত্তম মানুষ। তুমি তাই। পড়ে ওঁর মনে হাল করে।

হঠাৎ হঠাৎ বললেন, চেহ, প্রতিমাকে একটু সহ্য করে চলো। বড়ুলা করে। ও বড় দুঃখী। ওঃ—যাকে ভালবাসে তেমনকে পাওয়া উচিত, ও ঠিক তেমনকে পায়নি। প্রশ্ন করো না বস্তু।

ঘরে এসে বসে পড়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে-ছিল সে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল।

—কেন? পছন্দ করেনি? তিনি কি ভাবেন—সে বিনো-রায়ের ভালবাসে? না। সে পড়তে পড়াতে এসেছে: 'জীবনে সে কথা করে দেবে

নক্ষত্রের আলো ডাকে আঁধার সমুদ্র বক্ষে

নূতন সিদ্ধান্তে হয়ে পূরবী ভাসালো।

ছিল তেল তখনও গাইছেন—এই কি তুমি ঠাকুর—আমায় তাই পরালে ভালো

সুরের গন্ধ টানা।

N. BANDURI [redacted]

(Estd. 1892)

Pioneer Manufacturers [redacted]

Bolts, Nuts, Rivets, Dogspikes etc.

Government & Railway Suppliers.

Works & Office : 33, Mahendra Bhattacherjee Road.
(Old—122, Circular Rd.)

P.O. Santragachi, Howrah Phone : [redacted]

City Office : 71 A, Netaji Subhas Road, Calcutta—1
ROOM N. B|23 PHONE : 22-7377

Telegram : "STUDBOLTS" HOWRAH

বিদ্যোদয়ের পূজা-প্রকাশন

গল্প সাহিত্য

চিত্রদর্শন

ব্রজলাই সামন্ত

প্রবীণ চিত্র-সমালোচকের লেখা বিশ্বের পরিচয় ও পরিচয়ের ফল এই সংকলন মুখ-খানি। এমনলীলাময় ভাষার এর তুলনা দুর্লভ। আধিকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি চিত্রকলার ইতিহাস, বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প ও বিদেশী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সমাবেশ এবং বিশ্লেষণায় নন্দলাল বসু, কবি ও অন্যান্য অনন্যসাধারণ পুরুষদের সুন্দর আর্ট কাগজে ছাপা ১২খানি রঙিন, বর্ণের ও ১২খানি একরঙের চিত্রে সজ্জিত। মূল্য : ১৫.০০

মানববিকাশের ধারা

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

এই সংসারে গ্রন্থে লেখক জীবনের লীলা-ভূমি এই পৃথিবীর পত্তনের পর থেকে শুরু করে জীবনের উদ্ভব এবং প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে মানবের উদ্ভব ও তার বিভিন্ন ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারা-বাহিক পরিচয় বিবৃতিতে প্রাঞ্জল ভাষায়। সুন্দরখানি আর্ট পেপারে সুমুদ্রিত ৬০খানি চিত্রে সমৃদ্ধ। মূল্য : ১২.০০

পরিব্রাজকের ডায়েরী

নির্মলকুমার বসু

কবি-মা বিচিত্র জ্ঞানসন্ধানীর সংস্কৃতি-ভূমি হিমালয়ের এই ছেলে। বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের কীর্তিকীর্তি ও সংস্কৃতি। পরিব্রাজকের ডায়েরীতে তুলিয়া মুক্তকুমার নির্মলকুমার বসু এদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন। পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য : ৮.৫০

উপন্যাস

মধুমিতা

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমারের এই নূতন উপন্যাসখানিতে কলিকাতা সহরবিলাসীর চাঁর সমস্যা আলোর উজ্জ্বলতায় এবং উঠেছে সমাজ-চিত্রশালার এক নূতন চিত্রপট। মূল্য : ৬.০০

মাগিনী যুদ্ধা

অমরেন্দ্র ঘোষ

বিলাসবাবুর ছেলেমেয়ে লোকে এক বাড়ীর বাড়ীওয়ালা ভাড়াটে নিয়ে। বিলাস। ভুটেছিল প্রতিবার পিছনে এবং পাড়ই পর্যন্তে বোঝা হয় তাদের ছেলেমেয়ে বিলাসের ঘর এই ঘরা চলেছিল ঘরে। কাহিনী ঘর ফাটাতে বসে। মূল্য : ৩.৫০

কিশোর-সাহিত্য

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের কাছে সুপরিচিত স্বপনবুড়ো তাদের জন্য পরিকল্পনা করেছেন। তাঁরই নতুন এই বইয়ে ছোটদের মনোরঞ্জন স্বপন-বুড়োর কৌতুক কাহিনী। মূল্য : ৩.০০

গাতোরপুরীর কাহিনী

অগ্নেন্দ্রনাথ মিত্র

তিন পুরী নিয়েই আলাদের জগৎ — স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। প্রতিটি কিশোর-সাহিত্যিকের এই কল্পনার বিচিত্র রসে ভরপুর। লিখেছেন অগ্নেন্দ্রনাথ মিত্র। মূল্য : ৩.০০

পরিব্রাজক ভোম—সুধেন্দ্রনাথ রায়	১০.০০
বিজ্ঞানী ভাঁর জগদীশচন্দ্র	৬.০০
মহাভারত—	
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২.০০
আধুনিক শিশু-সাহিত্য—	
অগ্নেন্দ্রনাথ মিত্র	৭.০০
সাধারণ সাহিত্যের রূপরেখা—	
ডাঃ বিমানবিহারী ভট্টাচার্য	৬.৫০
অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৫.০০
বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা—	
সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য	৫.০০
জগদীশ জীবন—নলিনী পুরকায়স্থ	৫.০০
স্বাধীনতা যুদ্ধ—আলা বক্সের খাঁ	৩.২৫
উপন্যাস	
মহুয়াবনী—সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৬.০০
মুক্তকেশকেশী—	
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৬.৫০
সুধাংশু—সুশীল জানা	৩.৭৫
জাগরণী—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী	৩.৫০
পথে-প্রান্তরে (২য় খণ্ড)—বেদুইন	৪.০০
নূতন নগরী—আলা বক্সের খাঁ	৪.৫০
কিশোর-সাহিত্য	
আমার আমুকে বিবাহ—	
শিবরাম চক্রবর্তী	২.৫০
পাতালপুরীর রাজকন্যা—সুশীল জানা	৩.০০
জন যাদব কমকরা—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর	২.২৫
আমি ভূতের ছেলে—	
সুখলতা রাও	২.০০
বাঘ আর গরু—হেমেন্দ্র মিত্র	২.০০
রোমাঞ্চ কমল—পাঞ্চজন্যকর	২.০০
চাঁদের উপকথা—অমলকুমার অমৃতসিত	২.০০
সাইবেরিয়ার দেশ রাজপুত্র—	
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২.০০
বাঘমুনির বাঘা—অনীল দত্ত	১.২৫

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড ঃ কলিকাতা ৯

তিন বছর পর ১৯৫৪ সালে যি এ পরীক্ষা দিয়ে সে ডিস্টিংশনের সঙ্গে পাস করলে। বলল পাঠিয়েছিলেন কাকু। টেলিগ্রাম করেছিলেন। মিনেস্ত। টেলিগ্রাম হাতে এসে বারান্দায়ে, টেলিগ্রাফ ফিফ-টিন—বলা বাহুল্য, সেলাম করে দাঁড়িয়েছিলেন।

সুকান্ত পেয়েছিল সে। টিপ করে একটা প্রণাম করে সে বলেছিল, মিস্টিকে বকবিকে তো মিস্ত ধারা।

—নাও। শুধু, পাস নয়, ডিস্টিংশনে। ভুক আমি ভেবে দেব স্কুলের ছুটি। ছুটি তোমাদের, সব ছুটি আজ। নীরা ডিস্টিংশন খুব ভাল করে কি এ পাস করেছে। মাত্র সাত মাসে মিস্টি

নীরা ছুটে গিয়েছিল হরিচরণবাবুকে প্রণাম করতে। হরিচরণবাবু আশীর্ব হাতে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বিশাল মুখে কাঁচা চতুর্দশীর শেষ রাত্রির আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত ক্ষীণ রেখায় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে মুক্তকে বেদনার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু। হিমি মনে মনে বলছিল, এই পৌষ ছুটির বড় ভাই অর্থাৎ বড় পৌষের কথা। চুলি-চুলি ছেলে ছিল। সে থাকলে সেও এবার কি এ দিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে চাইছিল, সেটাকে চেপেই সে বেরিয়ে এল। তারও মনে পড়ছে মাকে। বেরিয়ে এসে সে ফিরেই যাচ্ছিল ইস্কুলে। ওই ডাক্তারদের সঙ্গে মালিকটা ঠৈ ঠৈ করতে হবে। ওরা তাদের বড় ডাক্তারকে। ও সেই একদিনই সেই ছেলে পুটুকে মেরেছিল। তারপর আর যায়নি। সে তো জানে এই সকল ডাক্তারদের—হোক সরকারী কর্মীর জীবনের কি ক্ষোভ; সে অভিজ্ঞতা! মূল্য আছে তাই মূল্য ক্ষোভ। পরশাছা অভিজ্ঞতা যদি ক্ষোভে, তাতে আর একটি গাছকে জীবনের সজীব রস দিয়ে পরিপুষ্ট করতে; মুক্তে কত কষ্টে চক্ষু দিয়ে সাজন করার মত।

তাই সে ফিরে চায়। প্রত্যেক ক্ষোভের ক্ষেত্রে, নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, মিলিয়ে দেখে বিচার করে সে। আজ সে তার বাল্যকালের অভাবকেও সে দেখতে পায়। আজ সে ওদের সঙ্গে হাসাকে দেখবে পাস করবে।

আমার স্কুলের মাকে সুধা আছে, তাও কি—হায়, মুক্তি তার খবর পেলে না।

ছেলেদের মিষ্টে সে সাজটা শুরু করছে। শোনায় এবং বলে সমাজকে, সমাজকে। আজ সে মিষ্টে বলবে। অন্যাইকে বলবে। জীবনে কিছু কিছু, সঞ্চিত সুধা-মিষ্টিদের সুন্দর সুন্দর কথা হয়েছে। আপন মনেই সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল আনমনস্কভাবে—

আমি দুর্লিব করুনা ধারা,
আমি ভাঙির পরাণ কারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়ব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—
প্রাণ হয়ে আছে ভোরা॥

হঠাৎ সব ছন্দ তাল কেটে গেল। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে। সঙ্গে বিনো-দা। পিছনে দাঁড়িয়ে অণিমাদি আর কমলাদি।

কে আবার? বুঝতে বাকী রইল না। প্রতিমাদি। নইলে প্রতিমাদি কই? এই নিয়েই মাসছয়ে যে। এইদিকেই তো তাদের কোয়ার্টার। এর মধ্যে তাদের কোয়ার্টারগুলি নতুন হয়েছে।

পথে দেখা হল। প্রতিমাদিই বটেন। বিনো-দা একটু হেসে বললেন, প্রতিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি যাও—অপিসে। কাগজপত্র দেখে সামলে রাখো। এরপর হেডমাস্টার। ছোট ইস্কুলের ভার পড়বে হেডমের উপর। স্ট্রেচারের মধ্যে প্রতিমাদি প্রায় সোজা হয়ে শুয়ে আছেন।

অণিমাদি কমলাদির সঙ্গে দেখা হয়েই তারা বললেন, এ কি কাণ্ড!

—কি হল বল তো?

—কি আবার? বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হয়ে গেল। তোকে নিয়ে ঝগড়া।

—আমায়?

—হ্যাঁ তুই।

কমলাদি বললেন, অপিসে এস, এখানে —ছেলেদের সামনে নয়।

অপিসে সে শুনল—কমলাদি আর অণিমাদি ক্লাসেই ছিলেন, ছুটি পেয়ে ছেলেরা নাচছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখে অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ। প্রতিমা প্রায় আর্তনাদ করছে, কই আমায় জানো তো কর নি। আমিও তো পড়তে পারতাম। পাস করতে পারতাম। তবুও তো করেছি বলে—তুমি—। বিনো-দা বলছিলেন, তার আগেও তুমি কলকাতায় একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে। এখানে নতুন ছেলের পর আমি বুঝেছিলাম, তুমি পড় না। পড়তে চাও না। আমি নিজে তোমাকে পড়িয়েছি। তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তুমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তুমি কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারতে না। ছেলেদের কারুর সম্পর্ক—তাও—তুমি—

অণিমাদি বললেন—এই না ছুটি, সে কি চিৎকার। ওই—ওই—ওই সব বিছিয়ে দিলে—টানছে—। বাস উনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রতিমা। তারপর ধড়াস্। পতন ও মূর্ছা।

কমলাদি হাসলেন একটু। সেও একটু, সুরু থেকে শীতনিবাস ছেলে বলেছিল, প্রতিমাদি আবার টানেন কেন?

—উনি জানেন, বিনো-দা তোমার প্রেমে পড়েছেন!

—অণিমাদি।

—ছোট ধমকে আমি কম পাইনে। অণিম সুমের আগে হলে অণিমাই হেসে প্রেমে পড়তাম। তবে পিছু পিছু ঘুরতাম।

—আমি ছেলে বয়সে একজনকে এক চড় মেরেছিলাম।

—সেটা হাসা। আমি এই গালে চড় খেয়ে আর একগাল পেতে দিতাম। চড় মার, ঘাঁটি মার—তবুও পদপল্লবমূলরূপ।

এবার সে না হেসে পারে নি। কিছুক্ষণ পর সে বিনো-দার কাছে গিয়েছিল—ক্ষমা করতে আর সাহস। প্রতিমাদির ঘরে। তিনি বলেছিলেন না। ঘেন্না ধরে অসুখ সেরে যায়। তাই সে মুখ দেখে প্রতিমাদির সাহস হয়। অনেক ভিতরে এসে সে হাত ছোঁয়াইল, কিছু, কি সাড়াই করেছে সে আপনি মনে-মনে। না ভিতরে কত কিছু সেই সকালে ছুটে ছেলেদের ঘরে নিজেরা কে কেমন আছে। এরপর ইস্কুল। বিকেলে খেলা দেখা। সন্ধ্যেয় একবার করে বিনো-দা সবার কাছে আসেন হয়ে কাছেও আসেন। খবর নিয়ে যান। তারপর সে যায় হাউসমাস্টার-বাবুর কাছে পড়তে। কোন কোন দিন অবশ্য বিনো-দা সঙ্গে যান। রাত্রে ফেরার সময় তিনি বারকয়েক কোনদিন গান করেন, কোনদিন ছুটি প্রতিভা হেডমাস্টার বাড়ি ফেরেন—তাকে দেখলেই নেমে সঙ্গে তার বাড়ির দোর অবধি আসেন, এই পর্যন্ত। কই কখনও তো এমন কোন কথা বলেন নি যার মধ্যে এতটুকু অনুরাগের কথা আছে। শুধু একটি কথা, তুমি ওয়াণ্ডারফুল। কখনও মেয়ে। মধ্যে ছেলেদের নিয়ে পিকনিক হয়েছে, তাতে হেঁটে হয়েছে, দুজনেই করেছে, বিনো-দা সব থেকে বেশী। একদিন ছেলেদের সঙ্গে রেস দিয়েছিলেন, তাতে তিনি হেরেও টেনেছিলেন। হ্যাঁ সে জোর দিয়েছিল। অণিমাদি মোটা, কমলাদি রোগা, প্রতিমাদি মাঝারি পুতুল। তার দাঁত আছে উৎসাহ আছে—সে রেস দিয়েছিল। বিনো-দা জিতেছিলেন, সে সেকেণ্ড হয়েছিল, ছেলেরা মন রাখতে পারে নি। তার মধ্যে প্রেম কোথায়? মধ্যে মধ্যে বিনো-দা মিটিং করেছেন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, মাঝে হয়ে সে শুনেছে। নিশ্চয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সে মুগ্ধতার ভাব। তাই বা প্রেম হবে কেন?

সে এমনই অন্ধ হয়েছিল—যে সে হঠাৎ উঠে কোন দিকেতে না-করেই গিয়েছিল প্রতিমার কোয়ার্টারে। কেন—কেন তিনি এমন সন্দেহ করবেন!

তিনি বিছানায় পড়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। দেখে তার মায়া হয়েছিল। হাতের কাছে মনে হল টেবিলের উপর পড়েছিল বিনো-দার দুই ছোট চিঠিখানা।

আইডিয়েল ওয়েলফেয়ার
কেন্দ্র
অপিসার্স ও সার্ভিসেস
২৩০এ, কলাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সচিত্র ও মনোজ্ঞ কাটলগের জন্য ১৫ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্প সহ লিখুন।

EASTERN STEEL TRADING
Co. (Private) Ltd.
Iron & Hardware Merchants * Government & Railway contractors * Manufacturers of culverts ■ Municipal parts etcetras
18, Maharshi Debendra Road.
Calcutta-7. Phone : 33-6418.

ম্যাকনী ফ্যান

মাসিক কিস্তিতেও পাওয়া যায়
ম্যাকনা ইলেকট্রিক
কর্পোঃ (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯। ফোন : ৩৫-৩০৪৮

সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠি-খানা তুলে নিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে তুলেছিল প্রতিজ্ঞা। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ফুটে বেরিয়েছিল, তুমি যাও। তুমি যাও। আমাকে কি মরতেও দেবে না লাঞ্ছিতে? কাঁদতেও দেবে না?

সে বলেছিল, আমি আসতাম না প্রতিমা দি। কিন্তু আপনি যে আমাকে চিঠিতে ভড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। কেন আপনি এ রকম ভাবেন?

—ও তোমাকে ভালবাসে না?

—না। আমি আন্তরিক মনে করি না কেউ করেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার বেশী আপনি যা ভাবেন তার কোনমাত্র নেই।

—কোনমাত্র নেই! বাঙ্গ ভরে সে বলেছিল। চোখ খুলে ভেবে দেখ!

তারপরই কেঁদে উঠেছিল হু হু করে। সে চলে এসেছিল নিরুপায় হয়ে। একে সে কি বলবে? ঘৃণা হয়েছিল, করুণাও হয়েছিল। বাসায় এসে খোলা হয়েছিল চিঠি-খানা। তার মাঠের মধ্যেই ঘরে গেছে। ঘৃ-কুঞ্চিত করে সে ভাবতে বসেছিল, বিনো-দার বুদ্ধি তার কি—? বিনো-দার কথা বিনো-দা জানেন। না, সে ও জানে, ও মানুষ ভাল কাউকে বাসে না। জগৎ ওদের কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। তার প্রতিমাদি, তুমি যদি জানতে যে এ মানুষের কাছে নারীত্বও দাম নেই। আর সে? না। সে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয় নি। কোনদিন না। এই মুহূর্তে চোখ বুজলে হয় তো তার মুখ দেখবে সে তোমার কথায় সায় দিয়ে বলে 'কিন্তু তা বলে তাই সত্য নয়। সে মনে করে দেখছে। ভাল করে খতিয়ে দেখছে। ছিসেব সে তোমাকে দেবে।

হঠাৎ সে চাবুক খেয়ে চমকে উঠল যেন। মনকে সংযম করে দেখতে চেয়েছে, বিনো-দা। বিনো-দা। বলে যেন। হ্যাঁ। এ ছাড়া তো প্রকাশ সে করে নি, তার ধর্ম তার থাকে, কিন্তু কত নিদ্রাহীন রাতে তন্দ্রার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের পূর্ণিমার পূর্ণিমায় যত উলাস-ঝড় বিবাধাটি গেছে, তার মধ্যে তো ওই একটা লোকই ভেসেছে চোখের উপর।

ঠিক এই সময় পড়ল কিরণ বাড়ী।

—নীরি। নীরি। আয় ঘরে কিরে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তোর পাশের ঘরে তুই কি করছিস? ঘরে ঢুকেছিল প্রথমটি—খালি ধান ভানছিস কাকে?

—কারও নয় চল। জীবনটা খতাচ্ছিলাম। মাপ করে দেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সে জানলায় এসে ভাবতে বসেছিল। ঘরে গরম বোধ হচ্ছিল। বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ার টেনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিল। ভাবতে ভাবতে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল। কিছুং চমকাচ্ছিল। তারই মধ্যে মনটা খুশী হয়ে বাজিল কেন। কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ একটা চড়া বিদ্যুতের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। তৎক্ষণাৎ কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক। চমকে উঠেছিল সে। কাপড়চোপড় শরীর সব ভিজে ভিজে হয়ে গেছে বৃষ্টির ছাটে। বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আঃ কিসের মেঘের মুখে। চেয়ারটা কাটোটা টেনে নেয়েছে। চৌকাঠে মাথাটা রেখেছে। কিন্তু উঠতে যে সে আর পারছে না। সে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

পরের দিন সে যখন উঠল উঠল শরীরটা

বাড়ীর নানারকম আসবাবপত্র
কিস্তিবন্দীতে কিনতে হলে
যোগাযোগ করুন :
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী
(কিস্তিবন্দীতে বিক্রয়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান)
১৬৫, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-১৪৫৮

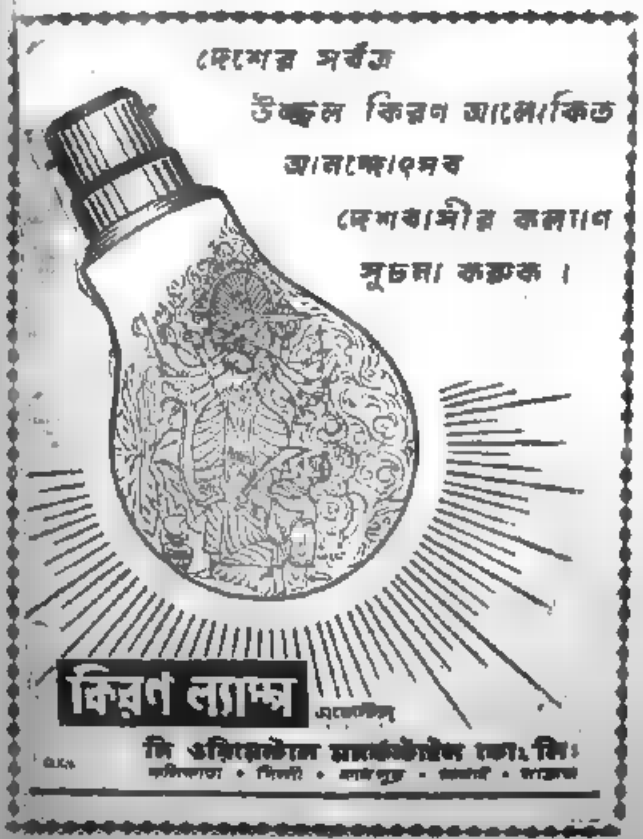

ভাল, মাথার যন্ত্রণা, দিয়ে বলল। নরীর মন সব ক্ষেত্রে কিন্তু কিন্তু করছে। কি হল তার? ডাকলে—অণিমাদি।

পাশের ঘরেই থাকে অণিমাদি। সাড়া দিলেন—কি?

—এস না ভাই একবার। দেখ না আমার কি হল? বড্ড খারাপ করছে নরীর।

—এযে বেশ জ্বর রে। কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন অণিমাদি।

সেই জ্বর বাইশ দিন। সুস্থ যখন হল তখন চাহিল দিন। সে দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এ রকের চিকিৎসা—উপবাসের চিকিৎসা নয়। কঙ্কালসার হয়ে নি, তবে রোগা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি।

—কি দেখছিস? কত সুন্দর হয়েছিস?

—সুন্দর হয়েছি? তোমার কি সব তাতেই ঠাট্টা?

—উঁহু। বিনো-দা বলেছে। তোর ছবি তুলে নিয়ে গেছে।

—মানে?

—বাইশ দিনে তোর জ্বর ছাড়ল। তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস, তাই হয়ে শুয়ে আছিস, মুখটা একটু শিছনের দিকে হেলে গেছে। হাত দুখানা প্রায় ছেড়াছাতের মত; চুলের ঢেউ পাকা, সে খোলা, মাথার উপর দিকে ছড়িয়ে আছে। বিনো-দা কলকাতা গিয়েছিলেন ফিরে এসেই সরাসরি এলেন তোকে দেখতে। আমি পাশে বসে বললাম, সকাল বেলা জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি একদৃষ্টে তোকে দেখছিলেন, আমাকে বললেন, জানালাগুলো খুলে দিন তো। বললাম, রোদ্দুর আসবে। বললেন, সে তো পরে বন্ধ করলেই হবে। বলে নিজেই জানালা খুলে দিয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আসুন। এইবার দেখুন। বললাম, কি দেখব?—নরীরকে কি সুন্দর লাগছে! ওয়াণ্ডারফুল। ক্লোজ থেকে দেখুন! ঠিক যেন সতী সাধ্বী দেহ-ত্যাগ করেছেন। ওয়াণ্ডারফুল। বলেই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে ক্লিক্ ক্লিক্ করে দিলেন। তারপরই আবার ওদিকে সেই ক্যামেরা! দেখবি যেন হর সতীর দেহত্যাগ ছবি হবে।"

কোথায় যেন লেগেছিল। সারা চিত্তটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। শক্তি থাকলে সে তখনই যেত। কিন্তু পেরে পারে নি। বিকেল বেলা বিনো-দা এসে বলেছিল, ওরাহে আমার ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলেন কেন?

বিনো-দা বলেছিলেন, সেটা খুলেই মুহূর্তে ছবিটা নিয়ে রেখেছিলাম। ভাবলে তোমার অনুমতি না নিয়ে তোলা উচিত নয়। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পারলাম না। মনে হল তোমাকে ঠকে মেরে ফেলছি। অন্তত মৃত কামনা করছি।

বড় ভাল লেগেছিল কথাটা। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরা গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, আমি একবার চলে যেতে চাই বিনো-দা; আমি এখানে—

—হ্যাঁ। শান্তি পাচ্ছ না। সহ্য করে থাকতে পার না?

—না।

হাসলেন বিনো-দা। তারপর বললেন, ছেলেই বা কোথায় আমার? যাবে। তবে সে ব্যবস্থা আমিই করব, অন্তত সেটুকু ভার আমাকে দিয়ো। একখানা চিঠিও লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিয়ো। একটা বিদেশী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনো করে এস। তোমার আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চাই।

সে উঠে তাকে প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে পাশের চেয়ার টেনিয়ে তার চুলের রাশির খানিকটা মুঠোয় পুরে বলেছিলেন, শোন—একটা কথা বলব।

—বলুন।

—বিচলিত হবে না যেন।

বুক তার টিপ টিপ করে উঠেছিল। নীরবে প্রতীক্ষা করেছিল সে।

—নাদু নেই।

—আঁ!

—না। না। চঞ্চল হতে নেই। কাঁদতে নেই তার জন্যে। তিনি বারণ করে গেছেন সকলকে।

উঠে গেলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন, আমার শ্রাদ্ধাতেও কেঁদো না। যেখানেই থাক। আমিও তাই বলে যাব সকলকে।

কি নিষ্ঠুর মানুষ! সে ভাবে নি। আকাশ পানে চেয়ে বলেছিল।

*

তারপর ৫ কটা মাস সে সেই বরষাত্রের উত্তরের অপেক্ষা করেই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে প্রতিমার মনের অসুখ দেহকে গ্রাসে ধরেছে। সে বড় ক্লান্ত বড় ক্লিষ্ট। বিনো-দা তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। "বিশ্রাম করো। প্রতিমা ঘুরে বেড়ায় উৎসাহের মত। মায়া হয়।

হঠাৎ আজ—বিনো সেনের জন্মদিন। জন্মদিন প্রতিবারই প্রতিপালিত হয়। উদ্যোগ করেন অণিমাদি। এবার সে তার নিয়েছিল। সে চলে যাবে, আসছে জন্মদিনে থাকবে না। তাই তার মনের মত করে মত করেছিল। নিজে মালা গেঁথেছিল; নিজে আলিম্পন রচনা করেছিল। লিখেছিল, তোমার জীবনবেদের আজ একটি অমৃত-বিন্দু—সে বিন্দু আজ সিন্ধুর মত করুণা-তরঙ্গে উদ্বেলিত। তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মদাত্রী তোমার কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। যৌবন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না, তবে সকলকে তুমি বাঁধো এক অদেখা গভীর বন্ধনে। মন তোমার রামধনুর সপ্তবর্ণের ভাণ্ডার; তোমার তুলিতে তুমি সৃষ্টি কর অপরূপের। রূপ তোমার পায়ে এসে নিজেকে অঞ্জলি দেয়।"

কথাটা সে প্রতিমাকে স্মরণ করেই লিখে-ছিল। কিন্তু বিনো সেন—। বিনো সেন তখন

ডাঃ দাসের
আর্নিকা হেয়ার অয়েল
নিশ্চয়ই মাথা ঠাণ্ডা রাখে, অনিদ্রা দূর করে ও চুলের শ্রীবৃদ্ধি করে।
মূল্য ২৲ টাকা।
হেলথের কিমিকাল
কিমি ও ফার্মেসির উপসর্গ ঘরে কাজিয়ে অবধি। ডাকব খাচ্চে—২৲ টাকা।
সুন্দর হোমিও সদন
(হ্যানিম্যান হোমিও কোম্পানি)
২১৩, বেহালা সুকিয়া রোড, কলিকাতা-১

লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

হয়েছেন, আমনা জেগেছে। তিনি ভাবলেন, নীরা বুঝি নিজের কথাই লিখেছে। বিনো সেন যেন কোন চঞ্চল হয়ে উঠে গেলেন সজায় ঘেরে। ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমায় যেন কেউ না ডাকে! সারাটা দিনের পর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নীরার বারান্দায়।

—নীরা!

—আসুন। আপনি এমন করে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম শরীর খারাপ। আবার [redacted], হয় তো আমার কিছু লিখেছি। বলেছি।

বিনো সেন বিচিত্র দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—না।

তবে?

এটা ধর আগে। তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, তোমার সেই সফলতাশিশের জন্য। এইখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সে কি বলবে ভেবে পেলে না। কিন্তু একটা খেলনা যেন সে অনুভব করলে। চলে যাবে সে এখান থেকে।

—তারপর— চুপ করে গেলেন বিনো সেন।

—বলুন।

একটু চুপ করে থেকে [redacted], ওই চিঠিখানা—

—কার চিঠি?

—পড়ে দেখো। ধর। বলেই তিনি উঠে পড়লেন।—প্রতিমা আজ একটু বেশী অসুস্থ, আমি যাই দেখে আসি।

চিঠি হাতে করেই নীরা তাঁর দিকে তাকালে—প্রতিমা! প্রতিমা! প্রতিমা! চোখে কি ঝলক থাকেই!

"নীরা

বহু শ্রম করে শেষে নিজেকে নিঃসংশয়ে যাচাই করে তোমাকে পত্রখানা লিখছি। আমাকে অভিজ্ঞতলব জানিয়ে তুমি বললে, তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী! কোন কথনে তুমি বাঁধা পড় না অথচ সকলকে বাঁধো অদৃশ্য গভীর বন্ধনে।" বুকটা আমার হাহাকারে ভরে উঠল। এ হাহাকার চিরদিন আছে নীরা। ইদানীং অনুভব করছি আমার কেউ নেই। কেউ আমার নয়। আপনার, একান্ত আপনার কাউকে যে আমি চাই। আমার আত্মা ব্যাকুল। তোমাকে আমি চেয়েছি। অনেকদিন থেকে চেয়েছি। কিন্তু—আজ যখন চিঠি এল, ফিরেলে যাবে তুমি, সব সম্পর্ক কেটে যাবে, তখন আর যে আমার নিবেদন না-জানালে নয়। আমার আত্মা অন্তরাত্মা বিস্তার করে তোমাকে চায় তার বাহুবেষ্টনের মধ্যে, হৃদয়ে চায় মনে চায়। প্রতি মুহূর্ত লাগি কাঁদে প্রতি অণু মোর।

তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। প্রতিমা কোন বাধা নয়—।"

আর নীরা পড়েনি। চিঠিখানা ঘরে করে একেবারে যেন জলতে জলতে বেরিয়ে গেল।—লম্পট। ভণ্ড। প্রতিমার জীবনটা নষ্ট করে আবার—।

দুই হাতে পরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে দাঁড়াল বিনো সেনের সামনে।

পর মুহূর্তেই শোনা গেল, বিনো সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, আমি পাপ করছি, আমার অসহ্য হয়েছে আমাকে ক্ষমা কর।

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল নীরা—আপনি লম্পট আপনি ভণ্ড, আপনি মৃত্যুযোগ্য।

হাতির স্নায়ুগুলি বিকল করে সে চিৎকার ছড়াচ্ছিল। গোটা অট্টালিকাটা চকিত হয়ে উঠল। কি হল।

বিনো সেন আর্তনাদ করছেন, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা! এই নাও—। এই চিঠি।

প্রবল হাতে ছেলেন বিনয় সেন অপমানে কুণ্ঠিতকায় কাগজ নিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তুমি ভণ্ড তুমি লম্পট। নীরা মুখ করে অনেক ভয় করে এসেছে। এখানেও সে হারবে না। সে ফিরবে।

আনন্দ উৎসবে
কে,হোড়ের
প্রসাধন
সামগ্রী

খাঁটী গিনি সোনার গহনার বিপুল সমাবেশ
ফোন-৩৪-৩৯৩১
ফ্যাশন-দুরস্ত প্রস্তুত গহনার
পি·সি·আঢ্য·
১২৫ বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

বিশুদ্ধ ঘৃতের খাবার
বিলায়েন্স মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
(ফোন: ৫৯ বি, হাওড়া)
১৫, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বিনয় সেন বললেন—নাটক শেষ হয়ে গেছে। যাও সব যে যার ঘরে চলে যাও।

নাটক শেষ হয়ে গেছে? না।

চলে যাচ্ছে নীরা আস্তে আস্তে ভাবতে ভাবতে বৃহত্তর পৃথিবী। নায়কে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

॥ সাত ॥

ঠিক দু বছর পর। ১৯৩৪ সাল। দমদম এয়ারড্রামে এসে নামল—নামল একখানা বড় প্লেন। প্লেন থেকে নামল নীরা। দু বছর পর ইংলণ্ডের পড়া শেষ করে সে ফিরছে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান্ড্রাসাইটে শিশু শিক্ষায় ডক্টরেট নবকারী ডিগ্রি সে পেয়েছিল, তাই শেষ করে ফিরছে। বোঝা হয়ে গেছে সে। চওড়া কাঁধ-কাট, উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু একটা ক্লান্তি যেন তার সর্বাঙ্গে। সেই আগের দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন একটা কিছুর ছায়া নেমেছে। সর্বাঙ্গ অন্ধকারে ডিগবেতে জলতরঙ্গবনত কালো মেঘ উঠলে, আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য থাকলেও যেমন একটা ছায়া নামে তেমনি একটি ছায়া। সেদিন যত্ন করেছিল—মনে পড়ছে সেদিন বলেছিল, ফিরে এসে নাটকের যবনিকা ওঠে যেন। দূর বিদেশে যেন জীবন নাটক না হয়ে ওঠে। কারাকাশ্ত মন নিয়েই গিয়েছিল। প্রথমটা মন বিদ্রোহ করেছিল না, বিনা সেনের করে দেওয়া বৃত্তি নিয়ে সে যাবে না। সে জানত এর পেছনে বিনে সেনের সুপারিশ আছে। নইলে লণ্ডনের করলেই বৃত্তি হয় না। কিন্তু সেদিন সে প্রশ্ন করেছিল—কেন কি বিনোদ সেনের? সে একদম নয়? পরীক্ষা তো একটা দিতে হবে। তাতে সে উত্তীর্ণ হলে কেন নেবে না? পরীক্ষায় পাস করে সে প্রতিবছর দুটো বৃত্তি নিয়েছিল বৃত্তি। টাকা জমে এ কয়েক বছরে কিছু। জমেছিল। তা ছাড়াও আর একটা সুবিধে হয়েছিল একেবারে আকাঙ্ক্ষাতীত। তাদের ছাড়া তার আর সংজ্ঞা হয় না। পাসপোর্ট আপিসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেখা হয়েছিল এলাকার সঙ্গে। সে চমকে উঠে বলেছিল, নীরা!

—হ্যাঁ। তোমাদের সব ছাড়?

—আমার ছাড়। তার বাবার কথা বলছ তাদের কথা ঠিক জানিনে। মনে হোমার অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমার। ও! তুমি সৌম্য যা বেরিয়ে এসেছিলে! বাপরে বাপ! তা এখানে? যাবে নাকি কোথাও?

—হ্যাঁ। ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি। গবর্নমেণ্ট স্কলারশিপ পেয়েছি।

—স্কলারশিপ! ক্ষণিকক্ষণ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, ও দেখালে খুব। আমি যাচ্ছি ফিল্ম কোম্পানিতে। ইংল্যাণ্ডও যাব। ঠিকানা দিও। হ্যাঁ একটা সংবাদ দিই তোমাকে। বিদেশে যাচ্ছ সুবিধে হবে। অভিনয়ের প্রশ্ন সব গেছে। বাড়ি বিক্রির কথা চলছে। কিন্তু হোমার অংশ তো তোমার সই ছাড়া বিক্রি হবে না। কেউ নিচ্ছে না। তুমি গেলেই টাকাটা পেয়ে যাবে যথাসময়ে। হোমার খোঁজ করছে। শেষ কথা হয়েছে, না পেলে তোমার অংশের টাকা কেউ রেখে দেবে।

টাকাটা সে পেয়েছিল। টাকাটা কম নয়, আট হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল পড়া শেষ করে ইউরোপ ঘুরবে। কিন্তু তা হয়নি, ছাড় সংক্ষেপ। প্রথম দিকটা হয় বড় শান্তভাবে চলেছিল; ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিনগুলি

লক্ষ লক্ষ লোক সিজার্স সিগারেট খান—
শুধু আজ নয়, ৪৭ বছর ধরে
খেয়ে এসেছেন।
কেন?
কারণ সিগারেটটা
সত্যিই ভালো!

উইলস-এর
সিজার্স
সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা

স্বপ্নসঞ্চারিণী মনীষোহনের মন চলেছে। বিচিত্র সেন, মুক্ত, স্বাধীন। জীবন যে এত মুক্ত এবং হাসোজ্জ্বল হতে পারে, তা সে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। সেও হাসতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। মনে হয়েছিল যে হাসি, যে পরিবেশ তার জীবনে ছিল, তাও যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। দুনিয়া যেন আরক্রান্ত। এই ঘরে ফিরে তার মনে হয়েছিল, যে বুড়ো আচরণ সে বিনোদকে সঙ্গে করে এসেছে, তা ঠিক হয়নি। অন্যও সহজভাবে হতে পারত। সে চিঠি লিখে জবাব দিয়ে চলে আসতে পারত। একটা কথায় জবাব হয়, কি, বিনোদ-দা। সেবার এখন কাজলীপনা করে ইমন বলছে কি করে বলুন তো?

না, ওই বড় বেশি নরম হয়ে। সে তো লিখতে পারত—। না এ লেখা যেন না। অপর্ণা প্রাইমেরে জবাবের জন্য অনেক অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল। আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি অথচ এ অনুচ্ছেদে হৃদয় কি করে হয়ে উঠিছে তার হয়ত দেওয়া যায়? না। ■ লিখতে সে পারত না। এই যে স্বীকার করা হল যে সে তাকে ভালবেসে। মাত্র কয়েকটি বিনিদ্র রাত্রি বিনোদ সেন, বন্ধ ঘরের সমস্ত গায়ে যেন ছেয়ে ওঠে। অপর্ণাও তাকে দেখে ওকে উপকারের জন্য। না। কবির যে হেসে ওঠে "আমার প্রত্যুত্তর মনে সুধা আছে, চাও কি—" মনে পড়ল সকালের চিঠি—ক্ষমা কর। আমি হৃদয় জোড় করে অপরকে স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা কর।" তুচ্ছাস হেসেনার সে যেন বলতে লাগল স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ছেড়েছিল সেই ফিরে একবার পাশে বসে আসবে, ভুলে থাকে সেদিনের কথা। কিন্তু সব আবার বলতে গেল। আবার সে জ্বলে উঠল। গিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে—ইউ-রোপের বড় শহরগুলির এনটারটেনমেণ্ট জন্য এবং ছিলের সাহায্যের জন্য। সেখানে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন—সেই আপনি—? শুধু, তিনিই নন—আরও যা জনও সবিস্ময়ে তাকে দেখছিল। সে বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে ভাস্কর্যের নিদর্শনের কিছু ছবি সদ্য এসেছে। তার মধ্যে একখানি বড় ছবি এসেছে। ফ্রান্সেস্কা! ছবিখানি যত ভাল—তত ভাল তার বিষয়টি। অপূর্ব প্রেমাশ্রিত! কবি বাচকতার কালজয়ী অনুপম।

সন্ধ্যের প্রসঙ্গপত্র, সন্ধ্যের মতো ভাল—চির পুরাতন—অভিকুমার। আর মহাকবির অপরূপা গন্ধর্ব রাজকন্যা। দুজনে দুজনকে

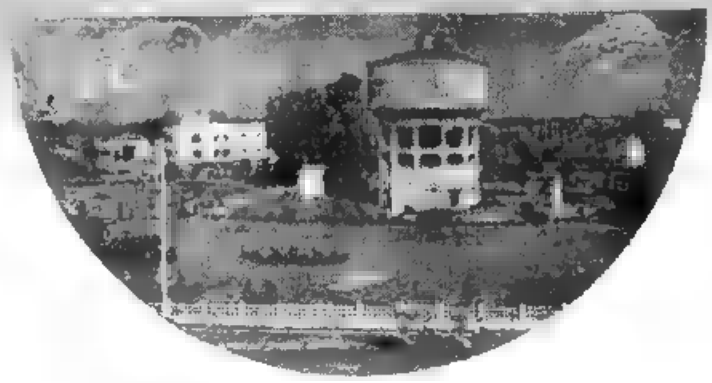

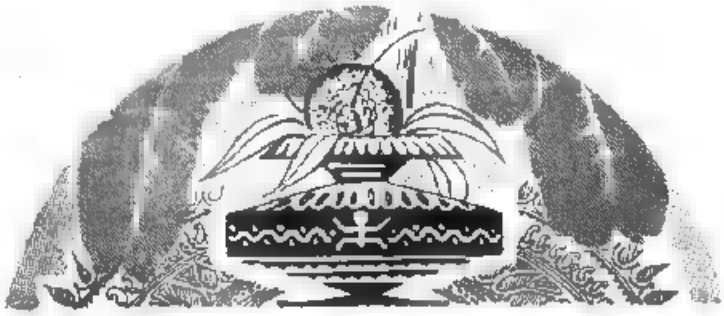

কল্যাণীর
আনন্দময়
— পরিবেশে —

দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিরহ সইতে না-পেরে পুণ্ড্রবর্ধনের মৃত্যু হল। মহাশ্বেতা আত্মহত্যা করতে গিয়ে দেবতার আদেশে সে অভিপ্রায় ত্যাগ [redacted] হলেন তপস্বিনী। ওই তপস্যার ফিরে পাবেন তাঁর পরিতাপে। পুণ্ড্রবর্ধন জন্মগ্রহণ করল বৈশম্পায়ন হয়ে। এক রাজার মন্ত্রীপুত্র হয়ে। রাজার পুত্র চন্দ্রাপীড়ের সখা, তাঁরই মন্ত্রী।

রাজকুমারের সঙ্গে বৈশম্পায়ন গিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে গন্ধর্ব লোকে। সেখানকার রাজকন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের প্রণয়ই মূল ঘটনা—কিন্তু সে অন্য কথা। সেই অংশে শিবার উপর রহস্য সঙ্গে বসে মহাশ্বেতা তপস্যা করছিলেন মৃত্যুপরে থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায়ের জন্যে। এলেন কপিঞ্জল। বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ তপস্বিনীকে দেখে যেন কোন অস্পষ্ট অথচ দুর্নিবার স্মৃতির আকর্ষণ অনুভব করলেন। অনুভব করলেন কপিঞ্জল দিয়ে ওই দেহ স্পর্শের উন্মাদনা। তিনি অগ্রসর হলেন, তুমি আমার। তুমি আমার। তপস্বিনী মহাশ্বেতা আকস্মিকতার মধ্যে চিনতে পারলেন- ঠিক। ললিত দেহ কম্পিতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আরক্ত চোখে আগুন জ্বলতে উঠল- ফিরে আসা হারানো স্মৃতির সেই বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এ সেই ছবি। কিন্তু ছবির মহাশ্বেতা তাঁর নীড় যেন এক। প্রাচুর্য সম্পদ—দেখলেই চেনা যায়। মনে হয়, যেন তাকে মহাশ্বেতার ভেতর করে বসিয়ে শিল্পী এ ছবি এঁকেছে। দেখেছিল সে সে-ছবি। বিনো সেনের আঁকা। মহাশ্বেতা সে-ই। মনে পড়ল অসুখের পর সন্ধ্যার দিন সে জানলায় তার রোগাক্লিষ্ট মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল সেই সময় অণিমাদি এসে বলেছিল, বিনো সেন একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় ফটো নিয়েছিল, বলেছিল, সত্তরি দেবতাদের ছবি আঁকবে। মুহূর্তে তার রাগ হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এ ঠিক সেই ছবি! আর সামনে কম্পায়িত বৈশম্পায়নের মুখে অবয়বে বিনো সেনের নিজের আদল। রিমেমব্রান্ডিয়ামে দাঁড় করা মূর্তির মত, তবু তার মধ্যে মানুষটিকে চেনা করার মত করে এঁকেছে বিনো সেন। দেখতে দেখতে ইন্ডিয়ান হাউসের অনেকজনের কাছে খবর পৌঁছেছিল এবং অনেকজন ইঁদ মেরে দেখেছিল তাকে। সে নিজে মুখে, অবশ্যই অনুভব করে নি, মনে হয়েছিল এরা সকলে মনে করছে এ জাতি নিশ্চয়ই অতি ভদ্রঘরানা। তারপরও অবশ্যি গিয়েছে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একদিন ভাগলওয়ালার অভিযোগে ঘটোৎ নিয়েছিল। মনটা খুব বিষিয়ে গিয়েছিল। ছি—ছি—ছি! আপনি তো ঘুমোন নি বিনো-দা। তবে? ছি—ছি। ফোক নিয়ে নেবেছিল সে। যাবে সে একদিন! নাটক আর সে করবে না। তবে বিনো-দাকে জিজ্ঞাসা সে করবে, পুণ্ড্রবর্ধন সত্যকামে বৈশম্পায়ন তার কি প্রতিমার মত তার কোন প্রণয়িনী ছিল? এবং সে কি মহাশ্বেতার মত প্রণয়ভঙ্গে পথের খোঁয়ায় কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত করে ঘুরতে হয়েছে, যে জীবনের প্রেমের স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে নিজেই হাতে ছেড়ে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে। তাকে এমন ব্যথা এমন অপমান আপনি কেন করলেন। এমন অপমান যে মনে রেখে করে 'ন সোপেশবাবুকে ছেড়ে করে নি। ছি। ছি। ছি!

—শীর্ষেন্দু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

গোপীচন্দ্রের গান—
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ... ১০.০০

কাঙ্গী-কাবেরী—
ডক্টর সুকুমার সেন ও
সুনন্দা সেন ৩.০০

লালন-গীতিকা—
মরমিয়া কবি ও সঙ্গীতকার
লালনশাহ ফকিরের প্রায় ২১০
গান। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ও
শ্রীহরিপদ মণ্ডল সম্পাদিত ৭.০০

প্রাচীন কবিওয়ালার গান—
(প্রায় ৪৬৭৫ কবিওয়ালার গান)
সুকুমার সেন সম্পাদিত ... ১৯.০০

বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য—
ডক্টর সুকুমার সেন ৬.৫০

বিচিত্র-চিত্র-লাপ্রেস—
অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ... ৪.০০

স্থির-সংকীর্তন বা শিবায়ন—
(রামেশ্বর-কৃত)
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৮.০০

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদিগণ—
শিশিরকুমার বসুচৌধুরী ... ৩.৫০

মৈমনসিংহ-গীতিকা—
(৩য় সং) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ১২.০০

রাইস কবির জনমভিক্ষা—
আশুতোষ ভট্টাচার্য ... ১০.০০

রামপ্রসাদের পদাবলী—
সতীশ ভট্টাচার্য ও হরেন্দ্র
মুখোপাধ্যায় ... ১০.০০

গীতার বাণী—
অনিলবরণ রায় ... ২.০০

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—
মোহিতলাল মজুমদার ... ২.৫০

শিবায়ন নাটা-সাহিত্যের উৎপত্তি—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ... ২.৫০

শ্যামসিংহাসন পদ্মাবৎস—
রামলাল সেন ... ২.০০

সাহিত্যে নারী—রূপসী ও সৃষ্টি—
অন্নদাশঙ্কর রায় ... ৬.০০

উপনিষদের আলো—
ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ... ৩.৫০

রজনীকান্ত: স্মৃতিকথা ও চমাস্টীক—
প্রসাদদাস রায় ৩.৫০

এগারটি বাংলা নাটা গ্রন্থের সমালোচনা—
[illegible] ৮.০০

কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল—
ডক্টর সুকুমার সেন ১০.০০

মরুযাত্রা—
(ভ্রমণ বৃত্তান্ত)
ডক্টর আশুতোষ দাস— ৭.০০

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয়—
ম. ম. যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্তরত্নীর্থ, ডি. লিট. ২.০০

হরবাহন ও চারুত-লজ্জা—
(ছাপ্পান্ন সেপারে ১৬৮খানি চিত্র ও ৩খানি মানচিত্র সহ।
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০.০০

বৈষ্ণব পদাবলী। (৬ষ্ঠ সং। ৪.০০

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। (১ম খণ্ড
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
বিশ্বপতি চৌধুরী ১০.০০

ইমাজাপি। (লোকসঙ্গীত) —
মনসুর উদ্দিন ২.৫০

মাণিকচন্দ্রের গীত—
সুকুমার ভট্টাচার্য ৮.০০

বয়লার বাইল—
কিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ২.০০

পদাবলী সাহিত্য—
কলিদাস রায় ও শচীন্দ্রনাথ ৬.০০

জ্ঞানদাসের পদাবলী—
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০.০০

বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৪.০০

রামায়ণ ও শিবায়ণী—
চারুচন্দ্র বসু ৩.০০

মধ্যযুগের সাহিত্য—
প্রমথনাথ বিশী ২.৫০

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩.৫০

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—
প্রথম চৌধুরী ৩.৫০

কিনতে ইচ্ছুকেরা আগামী ৪৮শে ফাল্গুন চৌরঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগে যোগ করবেন। প্রকাশনভবনে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনস্থিত নিম্নের যেকোনও ঠিকানায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাবতীয় পুস্তক পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন

শিশির সরকারিকার্তির

"আভি লে বাগদাদ"

১·৫০

• • সাধারণ অনুবাদ উপন্যাসের চেয়েও একঘেয়েমিতে ভরপুর। ছবি এই বইটিতে • • এর উপযুক্ত ছিল উত্তেজনাময় বিবরণের অভাব।

—প্রবাসপ্রবাদ সিরিজ

অনুবাদক—• • • বইটিতে এমন অনেক মুহূর্ত ও ঘটনার সম্মুখীন হওয়া যায়, যা রসসৃষ্টির নাটকীয় • • ভাষা ঝরঝরে ও সুখপাঠ্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

আরব্যরজনী—• • • এই সরল ও চিত্তাকর্ষক রূপে ছোটদের যে হাতে দেওয়া যায়।

—দেশ

• • বিশিষ্ট অভিজাত বইখানিকে অনুবাদ রসসমৃদ্ধ করেছে। • • বইখানির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

—দেশ

কাহিনী সংক্ষা,
কিন্তু
উপন্যাস অপেক্ষা চমকপ্রদ।

প্রাপ্তিস্থান:

এস, বি, সরকার এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কাস্টমস হেয়ে রেহুতেই সে শুনলে—নীহা! পরীক্ষিত কণ্ঠস্বর। কে? বহুলোকের মধ্যে—কে?

—আমি হে—ভীষ্মদেব!

হাঁ। ভীষ্মদেবই তো বটে! এগিয়ে এসে একটু হেসেই বললাম—তুই ফিরলি?

—হ্যাঁ। এই তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তুমিও ত অনেক পালটেছেন। খুব একচোট ছেলে পক্কা জাকিয়ে ধরে গুরুকার দেহখানি নিয়ে তার উপর উঠে পড়লেন না।

—ভাল ছিলি? কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস। খানিকটা পালটে গেছিস।

—মেন সাহেব হয়েছি?

—না। হেসে ও—। না থাক। এখন উঠবি কোথায়?

—দেখি। কোন হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে। কিন্তু ওকথা লেখানে যেতে পারবে। তা—। একটু চুপ করে থেকে বললে—তু তুমি এখানে কোথায়? কেউ আসবে বুঝি? সহসা কথাটা মনে হল—বিয়ে হেন মহুয়ে সে বাস্ত হয়ে বললে—আমি যাই।

—দাঁড়া না একটু। কেউ আসছে না—আমি যাচ্ছি।

—কোথায়? কোথায়?

—ডালহৌসী।

—ডালহৌসী? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না নীহার।

—হিমো-র লেখানে। চাকরি আছে আর তো কেউ দেখবার নেই। অত্যন্ত কাহিল। আমি দেখি গিয়ে। আমাকে স্নেহ করে পাঠিয়েছিলেন আন্তরিক সঙ্গে ফ্লিসটালিস নিয়ে। কাল এসেছিলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দিয়ে আজ ফিরে যাচ্ছি। গবর্নমেণ্টকে দিয়ে ছিলেন আশ্বাস। কি করবেন? আজ কাটা কিনেই যা?

—ভীষ্মদেব আর্তস্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠল যে। —কি বলছ তুমি?

—বিয়ো-মার উই দি হয়েছে রে।

—উই—দি? সে কি?

—হ্যাঁ। সেই সর্বনাশী। প্রাক্তমা—তার বোধ হয় ছিল- প্রকাশ পেল, সানাটোরিয়ামে দেখার কথা হল—তা মাই হার্ট করে কান্না। ওকে ছাড়লে না। উনিও ভেবা করলেন মহুয়ে দিয়ে বললে বললেন, না করলে? বিবাহ করেছি, আমার স্ত্রী। আমাদের মনে হয় যেন চোর ওপর অত্যাচার করে!

—আমার উপর আক্রোশ যে স্বাভাবিক ছবি একে মিটিয়েছেন। তার স্ত্রীর সেবা করেছেন —তাকে ডালহৌসীতে—এর মধ্যে আমাকে টানা কেন? তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন

এতে প্রবলা আমি সুখী। বিনো-দা'র মত লোক চারশ্চিত্র করেছেন। আচ্ছা আমি যাই। হাত টেনে ধরলেন অণিমাদি। —না শোন। শুনে যা লোকটার জন্য ক্ষতি তুই করেছিস তা শুধুতেও করে না অথচ তুই তাকে ভালবাসছিস।

—না।

—জানি জানি। তোর অসুখের সময় আমি তোর শিয়রে থাকতাম। বিনো-দা থাকতেন বাইরে। যেদিন প্রলাপ বকেছিলি—তার মধ্যে অনেক বলেছিলি। বিনো-দা বলেছিলেন, এ কথা যেন কেউ না শোনে অণিমাদি। ওকেও বোলো না। তুই নিজেও জানিস না। তাই শুনে যা। প্রতিমা ওর এক বন্ধুর স্ত্রী। সে বন্ধু বড়লোক মানীলোক—আজও বেঁচে আছেন। তিনি আবার বিয়ে করে প্রতিমাকে তাড়িয়ে দেন। প্রতিমা রাস্তায় দাঁড়াতে গিয়েছিল। উনি ওকে এখানে নিয়ে আসেন। প্রতিমা অক্লোশভরে বিধবা সেজেছিল। উনি আপত্তি করেন নি। ওতে অন্তত বন্ধুর মানটা বাঁচবে। কেউ এটা জানবে না। আমাকে সব বলেছেন কিন্তু বুদ্ধদেবীর নাম বলেন নি। এখানে ওকে এনে রেখেছিলেন এই বন্ধুদের মা হয়ে দিদি ভেবে। কিন্তু প্রতিমা ভদ্রমহিলা নেই। এখন বিনো-দা আমাকে সব বলেন। আর তো কেউ নেই। বোন মারা গেছে। জামাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। ছেলেরা চাকরি করে। শেষ পর্যন্ত ওঁকে ছাড়তে। বলেন, কিসে কি-হলে যা বলতে ইচ্ছে করে। সব বলেন। বলেন, ডাক্তার জানেন কিন্তু ওকে আমি ও-চক্ষে দেখতে পারি না। কিন্তু এসেকালেতে সাধ্যমত সব ভোগ করেছি ওকে নিয়ে এলাম। ওকে বাঁচাবার জন্যে সেদিন থেকে ওর ধরণ-ধারণ চলন বলন ওকে জানাবার। আমি বলেছি সবকথা, চেয়েছিলাম আমি ওই ছেলেকে দেখি নে। ওঁকে আর বার বলেছে, তবে আমাকে ডাকার দরকার ডাকছে কেন? পড়ালাম—

● নিজে পড়বার এবং প্রিয়জনকে পড়াবার মতো কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ ●

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা
প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রে লিখিত মহাভারতের কাহিনী
দাম : ৮·০০ টাকা

*

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
২য় সংস্করণ : ২·০০ টাকা

অ না গ ত
২য় সংস্করণ : ২·০০ টাকা

অ ষ্টি ল গ্ন
২য় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার।
২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

*

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত
৩য় সংস্করণ : ১০·০০ টাকা

*

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
দাম : ২·৫০ টাকা

প্যাডাম্যান ক্যাম্পেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
ভারত-ইতিহাসের এক সিরাই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শীর বহু ঘটনা ও আজাত তথ্যাবলী
২য় সংস্করণ : ৭·৫০ টাকা

*

আর কে নিমিত্ত
চার্লস চ্যাপলিন
দাম : ৫·০০ টাকা

*

শ্রীসবলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য
(কবিতা-সঙ্কলন)
দাম : ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

অপূর্ব সুযোগ

সহজ কিস্তিতে কিনুন—কোন বাড়তি খরচ নেই।

- ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পর্যন্ত এই সুযোগ পাবেন।
- যত টাকা কিনবেন কিস্তির হার তত কমে যাবে।

উষা
ফ্যান

বিনা খরচায় মেশিনের গুণাবলী দেখে নিন

আপনার নিকটস্থ উষা বিক্রেতাকে বলা মাত্রই সে আপনার বাড়িতে এসে বিনা খরচায় আপনাকে উষা মেশিনের গুণাবলী কাজ করিয়ে দেখিয়ে যাবে। আপনার কোনরূপ অসুবিধা থাকবে না।

উষা
সেলাই মেশিন

দি ইন্ডিয়ান্স্ট্রিয়াল ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা

পড়লে না। শুধু আমাকে গ্রাস করতে চাইলে। তবু বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। আর হিংসে-বিদ্বেষের ভয়। তারপর নীরা এল। হ্যাঁ। একে আমি ভালবেসেছিলাম। সত্যিই মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির জন্যে জন্মান্তরে তপস্যা করেছি—এ জন্মেও এতদিন ওর পথ চেয়েই বসে আছি। আমার বয়স বেশী হয়েছিল। কিন্তু আমি জীবনে হেরে গিয়ে নিজেকে নষ্ট করতে পারতাম। তাই, সে দিন, যখন ওর স্কলারশিপের চিঠি এল, আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম; সেদিন মনে হল, এই হোল নীরা আমার চিরজীবনের জন্য দূরে সরে যাবে, তখন আর থাকতে পারি নি। ছুটতে ছুটতে গাড়ী-খানা নিয়ে গেলাম। নীরা আমাকে গাড়ীতে নিয়ে চলে গেল। ডাক্তারের কাছে—তুমিরা সম্পর্কে অপরাধের রায় দিয়ে গেল বিচারকের মত। ওদিকে ডাইভোর্স বিল পাস হল। ডাইভোর্স করিয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে রাক্ষসীকে বললাম—নে গ্রাস কর আমাকে। কিন্তু—তু আমাকেও নেবেনি ওর ব্যাধির কথা। প্রথম দিনেই দেহ স্পর্শ করে বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর হাত পথ ছিল না। তার এত দেরী? এটা কি করে সম্ভব হোলো ডাক্তার? তা-ছাড়া আবার কি—? কি হবে বোধে? ডাক্তারও তাই বলেন, বাঁচতে যে চাচ্ছেন না উনি!

সহসা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরা।

পায়ের তলায় পৃথিবীটা এপাশ উঠছে—ওপাশ নামছে। সব—চারিটা দিক পাক খেয়ে ঘনঘন করে ঘুরছে। সব ছিন্নভিন্ন আপসা হয়ে যাচ্ছে।

অগিমাটি বললেন—নীরা—নীরা! টলছিস। নীরা!

চেতনা হারাবার আগে সে ডাকলে—অগিমাটি!

সন্দেশ প্রেস
কড়াপাক সুইটস্
১৪৫ ক বিপিন পাল রোড, কলিকাতা ৪

বিনামূল্যে পুস্তক
বা দেবকুমার ৫০,০০০ পাতেরা সমূল্য উপহার বিতরণ। কি: শিঃ ৮০। চর্মরোগ-চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীকিরণচন্দ্র রায়, ৩৩নং হরমোহন ঘোষ। লেন্স কলিকা, হাওড়া। ফোন—৬৯৮৫, প্রাণিসেন রোড, কলিকাতা। ফোন : ২৬—৫১৪২।
(সি ৯৪৫৯)

প্রদীপ কুমার
অনুমোদিত
পি. কে. ফিল্মসের
শারদ অর্ঘ্য
রায় বাহাদুর
ঃ মালা সিনহা • প্রদীপ কুমার
অহর গাঙ্গুলী • অহর রায় ভুলো চক্রবর্তী
অমিতা চট্টোপাধ্যায় • কমলা লক্ষ্মণ (নূতন)
কাহিনী • আনন্দ কিশোর মুন্সী
পরিচালনা • আশুতোষ মুখার্জি
সঙ্গীত • সলিল চৌধুরী
দ্রুত প্রস্তুতির পথে
•
মুক্তি প্রতীক্ষায়
নেলে. কি. ফিল্মসের
খনা
ঃ সাবিত্রী • প্রহীর কুমার • কমল মিত্র
নবদ্বীপ • পদ্মাদেবী প্রভৃতি
ও
অনুরূপা দেবীর
গরীবের মেয়ে
পরিচালনা • আশুতোষ মুখার্জি
সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জি
চেকায়ণ পরিচালক
মুভিটোন প্রাঃ লিঃ ৩৩ ধর্মতলা স্ট্রীট • কলি-১৩

ভাল সব সময়েই ভাল

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা

সুনিশ্চিত

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়

প্রধান অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

শাখাসমূহ :

শিয়ালদহ, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহরমপুর,

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার

অণিমাদি! কোথায়? অণিমাদি!

—এই যে! থাক সুস্থ হয়েছিস আর একটু শুয়ে থাক!

—আমি হোস্টেলে যাব। অণিমাদি!

উঠে বসল সে। চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে। মায়ের মৃত্যুর পর আজ সে প্রথম কাঁদছে। হেরেছে সে। সে হারে তার লজ্জা নেই, দৈন্য নেই, সোপনের চেষ্টা নেই—পৃথিবীর লক্ষ্যর সামনে সে কাঁদছে—কাঁদবে।

•

ডালহৌসিতে যখন পৌঁছুল তখন দুপুরবেলা। বেলা প্রায় বারোটা-একটা হবে গেছে। একটা মোড় ফিরেই—অণিমাদি বলতে গেলেন—ওই যাঃ লো—! কিন্তু নীরাই বলল—ওই যে!

গান ভেসে আসছে। সে কণ্ঠস্বর আর নেই—তবুও তার অবশেষ তো যাবার নয়।

"আমার প্রশ্নের মাঝে সুধা আছে,
চাও কি—
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

রিক্সওয়ালা থামল। উমি ওস্তাদের বারান্দায় বসে গেয়ে চলেছেন—সামনে টাঙানো মহাশ্বেতা' ছবি—শেষ কলি গাইছেন—

"ডাক উঠেছে মাঝরাতে,
তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে,
তোমার পরশ হেলে না।
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

নীরা এসে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—কে? —কে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নীরা। বাঁধ ভেঙেছে পলাশীর!

—নীরা?

—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা? আমার ক্ষমার ভুঁইই যে তুমি। কিন্তু এত দেরি করে এলে?

—না—আসি নি। দেরি হয় নি! কিন্তু তুমি মহাশ্বেতার ও কি ছবি এঁকেছ?

—বেশ, কাল থেকে পুণ্ডরীকের পেরেক্রাইবিন আরম্ভ।

আবার কাঁদতে লাগল নীরা। তার মাথায় হাত রাখলেন বিনয় সেন।

হে জগৎ রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক—আর না। যবনিকা ফেল। শেষ কর!

সমাপ্ত

"রেমাডিয়েস বুকস্টল"

তরুণী রঙ্গকর্মী উৎসবের পৌষ

ভাস্কিকাচার্য শ্রীউমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মহাশয় কোর্ট ও হকরেশন বিচারে সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। তাঁহার মনোমৌলিক ভাবিত ক্রিয়াসমূহ ও ভাবিত বিচার বিশ্লেষক ও প্রশংসনীয়। ভাস্কিটিকট সহ পত্র লিখুন—

জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্র

৩, রাজা কালীকৃষ্ণ রয় রোড, কলি—৩

বাংলা ছবির বিবর্তন

সেবাব্রত গুপ্ত

গত এক দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সমৃদ্ধি-পূর্ণ ও বৈচিত্র্যোজ্জ্বল। এই দশকে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এসে আমরা পেয়েছি বিচিত্র প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ, পরিচিত তীর থেকে নতুন দিগন্তের সন্ধানে নোঙর তুলেছেন দুঃসাহসিক নবাগতরা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাংলা ছবির ব্যবহারিক ও মানসবিনিময়ও বিস্তৃতর হয়েছে এই অতি আধুনিককালে। অপূর্বাই ও অবিশ্বাস্য মনে হয় এই কালিতকে যেন-তেন-ভাবে আখ্যা দেওয়া যায় কি না সে প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রেখে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলা ছবি এখন প্রাচীনের আনুরাগ ও নবীনের পরিহারের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের অনুবীক্ষণে এই নব-উন্মেষের মধ্যেও প্রবঞ্চনার কোন প্রচ্ছন্ন বীজাণু ধরা পড়বে কি না এই প্রশ্ন আমরা সবিনয়ে উত্থাপন করতে পারি।

আমেরিকার কৃষিতে পৌষ্টিকতার অংশে সরকারী কৃষিবিদ প্রত্যেক চলচ্চিত্র যে শুধু নিষ্প্রাণ সূত্রের কারিগরি নয়, এ সত্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত। গল্প (কথা) বা ঘটনা সূচনা করা ছাড়ের কাজ হলেও যেমন আর্ট, চলচ্চিত্রও তেমনি ভাবনার কারিগরি হয়েও রূপ ও বর্ণনার প্রাণাবেগস্পর্শে ছবির নিছক সাটের পর্যায়ে উঠেছে। আর সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড়, ছায়াছবির সঙ্গেও দর্শকের সম্বন্ধ তেমনি প্রত্যক্ষ। ছায়াছবি সাহিত্যের ভাষাকে নেয়

ধবল বা শ্বেতী
(LEUCODERMA)
কুষ্ঠরোগ নয়, সংক্রামক ও অসংক্রামক নিশ্চিত্ত হয়। পরামর্শ ও হরদম ঔষধীর বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র। সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ—ডাঃ কুণ্ডু · Dermatologist). ৬৪।১, লোয়ার চিতপুর, কলিকাতা—৯।
Leucoderma Research & Cure Centre
(সি ১৪৭০)

ভাল সব সময়েই ভাল

এজেন্সীস লিমিটেড জ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—১

উত্তর মেঘ

শুভমুক্তি সমাসন্ন

রূপ ও বাণী। তাই ছায়াছবির জীবনের চলচ্চিত্র, জীবনচায়ার বিকল্প বা অন্য।

বাংলা ছবির নতুন দশার চলচ্চিত্রের এই মূল্যায়ন কেমনভাবে এবং কতটুকু স্বীকৃত —এই আলোচনার সূত্রপাতেই পুচ্ছয় অবশ্যই চীকাভাষ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। বাংলা চলচ্চিত্রের যে নব-উন্মেষের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার মূলকথা বহুমুখী—কথাবস্তুর অভিনবত্বে, বিষয়-চেতনার, আঙ্গিক কৌশল ও কলা-কৌশলের সমন্বয়ীভূত এই মূলকথা বেশী স্পষ্ট। বিষয়বস্তু যেই হোক সাহিত্য তার প্রাণস্বরূপ, সাহিত্যধর্মী আর অন্যান্যধর্মী। গত আর-একজনের মধ্যে একটা নতুন ছবির নতুন সুরের সন্ধানী মন এক হবার মানে। চলচ্চিত্রপটে নতুন বিশ্বাসের মালা গাঁথা একজন তাদের সাধনার চলচ্চিত্র হিসেবে ভালো ছবির প্রশ্ন তোলেছেন- সবি অবশ্যের কর্তৃত্ব হল। কিন্তু এই নতুন বিশ্বাসীরা চলচ্চিত্রের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ যে বিশ্লেষণ একেছেন, সেই আলোকে জীবন-ভাবনার বিচ্ছুরণে ছায়াছবিকে তাঁরা যতটুকু সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেননি (সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম)।

ভাল সব সময়েই ভাল

বঙ্গলক্ষ্মী ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা—১

পূজায় ৭খানি নতুন
ছেলেদের বই
৭ই আশ্বিন বার হবে

চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অম্বিতীয় ধনদা	—	প্রেমেন্দ্র মিত্র
চুলচেরা শোধবোধ	—	শিবরাম চক্রবর্তী
গুপির গুপ্ত খাতা	—	লীলা মজুমদার
গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ	—	হেমেন্দ্রকুমার রায়
হাওয়া বদল	—	জয়ন্ত চৌধুরী
শুধু হাসির গল্প	—	খুকুমণি ছোপার সংকলন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের
নেজাজ

পথী-সমাচার	পরিচয়লিপি
শেষ প্রহর	চরিত্রিণী
চীনাহাত (গল্প)	দৃষ্টিদান
খিচুড়ি	আড়ুপী

কাহিনী : সমরেশ বসু
সুর ও নেপথ্যকণ্ঠে :
হেমন্তকুমার
অন্যান্য মুখ্যাংশে :
সাবিত্রী ॥ উত্তমকুমার
পদ্মাদেবী ॥ তুলসী ॥ প্রেমাংশু
এবং কীর্তক ও মুদ্রাদত্ত

অলঙ্কার পরিত্যক্ত হয়ে ছবির ঘর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাজে ছবিকে ভোলে। অর্থের ঘর সাজিতে হওয়া! সৌন্দর্য থেকে ধারণা ছবিকে সাজমান করেছেন এই প্রতিভাবান নবাগতরা। ধারণা ছবিকে তাঁরা অলঙ্কারমুক্ত করেছেন। নবযুগের সাজসজ্জা হওয়ার জন্যেই লোকসজ্জাকে বাহ্য-আড়ম্বরের প্রয়োজনে পরিচ্ছদের সঙ্গে নিবিড় মিলনের মধ্যেকার অলঙ্কার শুধু আলোর যোগা, আবর্জনামাত্র। তেমনি ছায়াছবির রূপবৈভবও অবরণীয় মতোই এক পাশে পড়ে থাকে যখন বিষয়বস্তুর আঘাতে, মুক্ত ও অমুক্তের সম্বন্ধ স্থাপনে ছায়াছবিতে রূপ পায় জীবনের প্রকৃষ্ট চলচ্চিত্র।

ভূপেনমোহন ও দৃষ্টিনন্দন বিন্যাসের মধ্য দিয়েই ছায়াছবিতে রূপ নেবে জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ-কথা কখনও দাবী করবো না যে ছায়াছবির রূপকারও কবির মতো বলবেন—"আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার"। অলঙ্কার থাকবে, থাকবে শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা—কিন্তু তাতে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের ভাষা ভাবনার স্পন্দনে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে, শিল্প বহির্বিশ্বের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে মুক্ত হয়ে অন্তর্বিশ্বকে করবে ইন্দ্রিয়ময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

নতুন যুগের ইন্দ্রিয়ধর্মী, বাস্তবানুগ ও দৃষ্টিনন্দিত যে চিত্রসৃষ্টি—যার উদ্ভবের [redacted] দায়ী পূর্বোক্ত রূপকারগণ—তাতে যেন অলঙ্কারের অধিকার নেই। জীবনরসের অন্তরঙ্গ স্পর্শ এতে বর্জিত, হৃদয় অন্বেষণের পরিবর্তে এতে শুধু কৌশল, নৈপুণ্য ও সুশিল্পতা প্রধান। পাশ্চাত্য "নিও-রিয়ালিজম" (Neo-Realism)-এর প্রভাব তাদের ছবিকে হয়তো রুচিতে ও নিরলঙ্কার আবেদনে মণ্ডিত করেছে; কিন্তু জীবননাট্যের রসে নবজন-

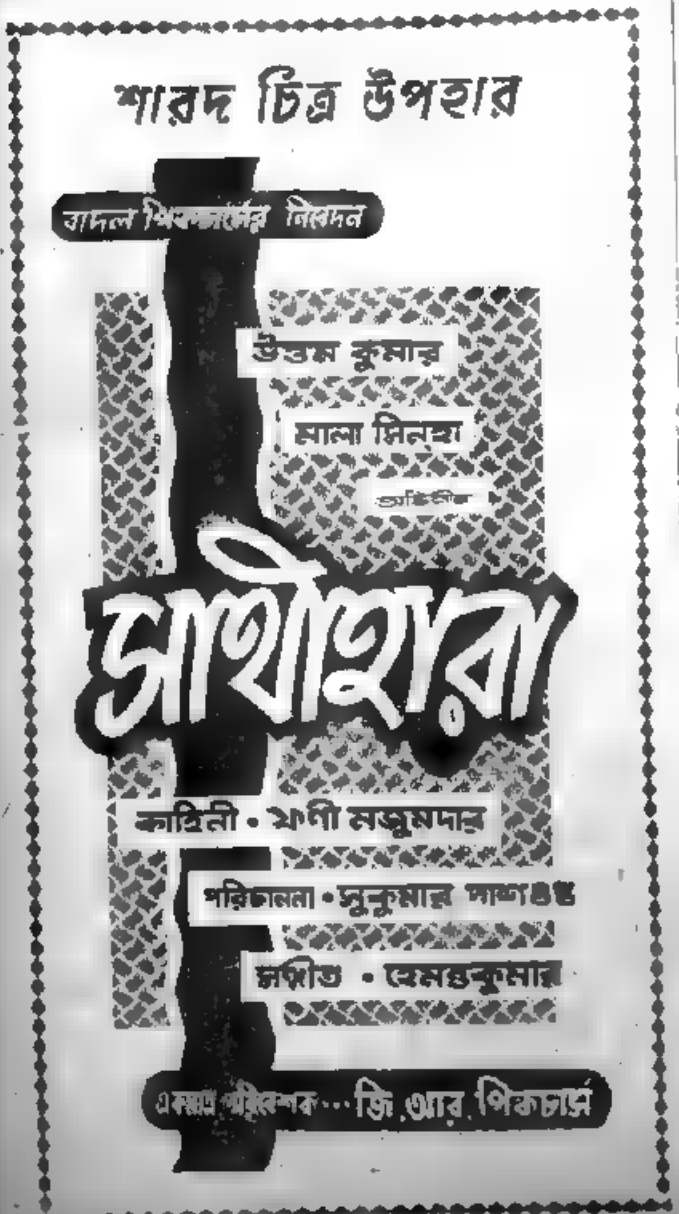

গ্রাহ্য, রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেনি। এ-সকল ত্রুটি বর্তমানে ক্ষণিক আলোড়ন জাগাবার ক্ষমতা রাখে হয়তো, কিন্তু ভাবীকালে বেঁচে থাকবার হস্তপত্র থেকে বঞ্চিত হয় অতি সহজেই। নতুন যুগের শিল্পারসীদের ছবিতে আমরা এমন শোভন-শিল্পের প্রকাশ দেখেছি যা চলচ্চিত্রকে আশ্চর্যভাবে সুষমামণ্ডিত করেছে—চলচ্চিত্রের প্রতিভা শিল্পসমাজের শিল্প থেকে বাংলা ছবিকে রক্ষণশীল বিধিবদ্ধতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এই শিল্পমাধ্যমকে পরম বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছে। প্রয়োগনৈপুণ্য ও শিল্পরূপ-পরিমার দিক থেকে বাংলা ছবি তাদের কাছ থেকে পেয়েছে চিরন্তন আর্টের রসজ্ঞ স্থায়ী পুরস্কারপত্র। কিন্তু সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বাস্তবপক্ষ যেখানে এক—মানুষকে জীবন-অভিজ্ঞতাই অবলম্বনে করা, তার সঙ্গে একীভূত করা—সেখানে এই দুঃসাহসীরা শিল্পীর ভূমিকায় রাজ করতে পারেননি। চলচ্চিত্রের সত্য মূল্যায়নে—চলচ্চিত্র সেখানে শুধু সাহিত্যের শিল্পের স্বরলেখনপূর্ণ স্বরলিপিই অর্থাৎ হয় না, জীবনলোকের নিরুচ্ছ্বাস অনুপাতায় উন্মেষ—তাঁরা সমস্কেতে আর্ট-প্রয়োগের গৌরব অর্জন করতে পারেননি। আশা করবো, সবযুগের পথিকৃৎদের কাছে রসিকজনের এই দাবী একদিন মিটবে।

কিন্তু শিল্পের সহিতকলাতত্ত্বের দিকে নতুন যুগের যুগধারাদের এই যে আত্ম-লাঘু অভিযান—কোথাও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ভূমি-ভার শক্তিকে পাড় করাবার নিয়মীম প্রয়াস, শিল্প-আভিজাত্যের [illegible] জীবনময় বৃহত্তরে অলঙ্কার-মাধুর্য সম্মুখীন, জীবনের ভাষা যেখানে বৈজ্ঞানিক—তার মধ্যে বিশ্বাসের উত্তেজনা আছে, কিন্তু বিবর্তনের স্থিতিনিষ্ঠ নির্দেশ নেই। বাংলা ছবির নব-উন্মেষের আলোড়নে এই যে শাশ্বতপন্থী শিল্প-সাধনা অন্তর-চেতনায় যা উদ্বুদ্ধ নয়, জীবনের হৃদয়রসে যা আপ্লুত নয়, অনুভূতির সংঘাতে উৎপীড়ন নয়—তার জন্য চলচ্চিত্রের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা [illegible] নেই। এই সাধনায় চলচ্চিত্রে জীবনবিচ্ছিন্ন—জীবন ও শিল্পের যে বিচ্ছেদ আমরা লক্ষ্য করে আছে সেগুলোর নিরুচ্ছ সম্প্রসারণ।

সকলের প্রিয় ও পরিচিত

H. L. C.

হাওড়া লাইট কাম্পানি কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৫১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

৫১৪

আমাদের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর কতকগুলি পুস্তক

শিক্ষানীতি
—কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র সেনগুপ্তা ৪,
শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা
—হরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫,
The Story of Education
B Sarkar (in the Press)
বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬,
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সঙ্কলন
—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১২,
যুগেশ্বর মধুসূদন
—ডঃ শশীভূষণ মৈত্র ৬,
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস
—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ ৭·৫০
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
(চার খণ্ড)
—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকাশ্য)
রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয়
—ডঃ ভবতোষ দত্তগুপ্ত ১·৫০
হোরেসের আর্স পোয়েটিকা
(কাব্যকলাতত্ত্ব)
অনুবাদক—সুধীরকুমার ভট্টাচার্য—১,
দার্শনিক প্রবন্ধাবলী
যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—৩,
ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪,
গল্পকার শরৎচন্দ্র
—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচরিতা রায়—৭,
ডাঃ দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ৮,
ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা
(প্রকাশ্য)
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত
যুগপ্রতিভা ২·৫০
(মাইকেল ও তৎকালীন সমাজ)
বস্তু জগতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য
১·৫০
শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় প্রণীত
প্রমথ চৌধুরী ৫,
বাংলা অলঙ্কার ২·৫০

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন ৩৫—৩১০৫

যাত্রা ও গীতিনাট্য

প্রভাংশু গুপ্ত

বাংলা দেশের যাত্রা ও গীতি-নাট্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় বলা চলতে পারে। এই গীতি-নাট্যের জন্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এ ধরনের নাটকের মূল উৎস বাংলার যাত্রা। পাশ্চাত্য দেশের গীতি-নাট্য সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না, কারণ ওই সব দেশের সঙ্গে যাত্রার কোন-দিন পরিচয় ছিল না। পাশ্চাত্যে গীতি-নাট্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি নিতান্ত স্বতন্ত্র ধরনের। ইংরাজী সাহিত্যে গীতি-নাট্যকে বলে অপেরা। অনেকে অপেরা ও ব্যালে, এই দুটিকেই একই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন, কিন্তু সেটা সঙ্গত নয়। অপেরা মানে গীতিনাট্য। ব্যালে হোলো নৃত্যনাট্য।

[illegible] বাংলা দেশে ইংরেজী ধরন ও ঢঙের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকে এবং তারও বহু আগে যাত্রাই বহুল প্রচলিত ছিল। সাধারণের আনন্দ পরিবেষণের ভার যাত্রার ওপরই ছিল সবচেয়ে বেশী। যাত্রার মধ্যেই বিবৃত করা হত লোকশিক্ষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, ভক্তি ও আনন্দ।

যাত্রার আগে বাংলাদেশে আনন্দের রস যোগান দিত কুমুর, পাঁচালী, কবির লড়াই, তরজা প্রভৃতি। কিন্তুর শ্রেণীর হলেও উপাদান প্রায় অভিন্ন বলে এদেরকে এক কথায় পালাগান [illegible] চলে। তবে [illegible] অন্য পালাগানের সঙ্গে কুমুর প্রভৃতির কিছুটা তফাত ছিল বইকি। পালা-গান হোল একটা পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে অঙ্গসজ্জা ও সঙ্গীতের সাহায্যে পাত্র-পাত্রী অভিনয় করতেন। তাতে কমপক্ষে দুই বা তিন জন পাত্র-পাত্রী থাকতেন। সংলাপ কিছু সংলাপও থাকত। আজকালকার সিরিয়স বা গুরুত্বপূর্ণ নাটকে গুরুতর পরিস্থিতির মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, ওই সব পৌরাণিক ভক্তিরসাত্মক পালাগানেও মাঝে মাঝে হাস্য-রসেরও অবতারণা করা হত। মূল গায়েন ও তাঁর সহযোগীরা এই পালাগানের সঙ্গীতাংশ ও নাটকীয় আলাপ অংশ চালাতেন। কুমুরের চলত শৈথিল্যের ও লম্বা। পাঁচালীতে পাত্র-পাত্রী বলতে প্রায়ই একজন। তার হাতে থাকত একটি চামর।

কালা দেশে এই পালাগানের পরম্পরা [illegible] হল যাত্রা। যাত্রা ঠিক কবে থেকে এসেছে আজও প্রকাশ করে, তার সঠিক সন বা তারিখ না জানলেও একথা জানা যায়, ষোড়শ শতকের শেষে শ্রীচৈতন্যদেব এক যাত্রার পালায় অভিনয় করেছিলেন। যাত্রা-পালাটির নাম রুক্মিণী-হরণ। শ্রীচৈতন্য-দেব কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যাত্রার প্রথম যুগের বাঁধা পালার আবির্ভাব হয়নি। পাত্র-পাত্রীরা যাত্রার আসরে অভিনয়ের সময়ই গান, কথাবার্তা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী তৈরি করে নিতেন। তার পর এল বাঁধা পালা। এই বাঁধা পালার অভিনয় চলত তিন-চার দিন ধরে। তবে প্রতিটি দিনের অভিনয় অংশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল,—এই নিয়মেই বাঁধা পালা রচনা করা হত।

অতি প্রাচীন যাত্রার মধ্যে 'কৃষ্ণযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব যাত্রার পালাগুলি ও গানে ভক্তিরসের প্রাধান্য খুব বেশী এসে পড়ে। গোপাল উড়ের 'বিদ্যা-সুন্দর' যাত্রার পালা একরকম নিছকের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কবিতে কবিতায়, 'টপ্পা-হরফ' প্রভৃতি যাত্রা পালাগুলিও কম খাতির অর্জন করেনি। যাত্রার মূল পরিচালক ছিলেন অধিকারী। এই অধিকারীরাই বাঁধা পালা রচনা করতেন,—অর্থাৎ তাঁরা গান বাঁধতেন, গানে সুর দিতেন, পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে মূল-গল্পটা নিয়ে প্লটনির্মাণ ও সংলাপের পরিকল্পনা করতেন। অধিকারীদের এই সব যাত্রাগানের পাণ্ডুলিপির অধিকারী ছিল তাঁদেরই সন্তানরা। অন্য কারও অধিকার ছিল না এই সব পাণ্ডুলিপির।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে-সব যাত্রাগানের প্রচলন হয়, তা প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় বলা চলে। ইংরাজী

রাজকুমার এণ্ড ব্রাদার

বিশিষ্ট লৌহ ব্যবসায়ী

২০।২বি, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-১৭৭৭

নাটকের ক্রমবিকাশে সংলাপ ও তার সঙ্গে প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন ইত্যাদির সংমিশ্রণে যাত্রার নতুন রূপ সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার প্রথম নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাদুগোপালের সংশোধিত সংস্করণ এই নাটককে বলা যেতে পারে। যাত্রার পালা-বাঁধার ও থিয়েটারের নাটক রচনার মূলগত পার্থক্য খুব বেশী হলেও 'ভদ্রার্জুন' নাটকে যাত্রার রচনাপদ্ধতিই বেশী অনুসরণ করা হয়েছে।

এই সময়ে যাত্রা ও গীতিনাট্যের মাঝা-মাঝি একপ্রকার গীতাভিনয় এদেশে দেখা গিয়েছিল। এই সব গীতাভিনয় প্রায় বোল আনা নাটকের মতই। তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। এর কারণ সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-এ লিখেছেন—"রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভবপর ছিল না।"

কাজেই খোলা আসরে বিনা দৃশ্যপটে ও ঐকতানবাদনে যাত্রার অনুকরণেই এই সব গীতাভিনয় হত। তবে যাত্রার 'জুড়ি-বোহার' এই সব গীতাভিনয়ে ছিল না। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাজসজ্জার পরিবর্তন ছিল। যাত্রায় কিন্তু এই সাজ-সজ্জার পরিবর্তনের বালাই ছিল না।

ক্রমে এই গীতাভিনয় গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হল। গীতাভিনয়ের কাঠামোর পরিবর্তন হল না। পরিবর্তন হল আনুষঙ্গিক পরিবেশে। এল ঐকতানবাদন, দৃশ্যপট, বিবিধ সাজসজ্জা ও অভিনয়ের আসর বসল ইংরেজী ধরনের রঙ্গমঞ্চের উপর—খোলা আসরে নয়।

যাত্রার মূল প্রাণ তার প্রচণ্ড গতিবেগ।—বেটাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'টেম্পো'। যাত্রার গানের মাধ্যমে কাহিনী যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে ছুটতে থাকে, যতক্ষণ না সে তার

জে. এন. রায় এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
স্বর্ণ শিল্পী ও জহুরী
৩৬ নং ক্যাওমানিস ষ্ট্রীট - কলিকাতা-১

মূলামৃত
ওজনে চার্চি-র ৯৮-গুণ
ওজাশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, অর্শরোগ ও পেটের যাবতীয় রোগের মহৌষধ।
কেমিষ্ট পাড়ায় পাড়ায় ডেমোনেশন চালু করুন। কমিশনের লোভনীয় রেট দেওয়া হবে।
(বিস্তারিত চিঠি লিখুন)
মূলামৃত ঔষধালয়
বিশ্বনাথ মেডিক্যাল এজেন্সি

লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ যবনিকাতে এসে পৌঁছয়। কিন্তু থিয়েটারের নাটকে কাহিনীর এ-রকম প্রচণ্ড গতিবেগ নেই। থিয়েটারের নাটকের পরিমাণভুক্ত একমাত্র গীতিনাট্যে যাত্রাসুলভ এই গতিবেগের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যাত্রার কাহিনী প্রধানত সংগীতের এবং কিছুটা কথোপকথনের মাধ্যমে এগিয়ে থাকে। গীতিনাট্যেও ব্যবস্থা অনুরূপ। টেকনিক প্রায় একই রকমের। তবে চমকপ্রদ দৃশ্যপট ঐকতানবাদন, আলোর বাহার এবং বিচিত্র সাজসজ্জা ও তার ঘন ঘন পরিবর্তন এই সব পরিবেশের ভিতরে গীতিনাট্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই জন্য যাত্রাগান ও গীতিনাট্য মনে-প্রাণে এক হয়েও এ দুটির বাইরের রূপ হুবহু এক নয়। কিন্তু বাংলা নাটকে যাত্রাগানের বিবর্তনের পরিসমাপ্তি গীতিনাট্যে। তাই শুরুতেই বলেছি বাংলা নাটকে যাত্রাগান ও গীতিনাট্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

নাটকের শ্রেণী বিভাগের পরিধি থেকে গীতিনাট্যকে এবং নৃত্যনাট্যকে বাদ দিয়ে বাকী রহ-সব নাটক থাকে—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি বা দুঃখান্ত নাটক, কমেডি বা সুখান্ত নাটক, জনপ্রধান নাটক, বস্তুতান্ত্রিক নাটক, মেলোড্রামা, রোমান্টিক নাটক ইত্যাদির সংজ্ঞা ধরার একেবারে ঝিক নেই।

যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের নাটক বলতে যা বোঝায়, তার পার্থক্য সম্বন্ধে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দৃষ্টান্তের উদাহরণ দিয়ে চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন—"ধর কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হল—হরিণ-শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে বুনোর পর বুনোর মধ্যে দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের, কিছুরই; স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে-জরির-মাটিতে গড়া রথ ঘোড়া সবই—তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা সৌজের উপরে, রাজার মৃগয়াযাত্রার একটা বৈচিত্র্য ঘটল ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ অংশ সুবোধ্য ক্লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়—সে গানের পর জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের [illegible] ভেঙে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছে। গীতজ্ঞদের সামনে চলল হরিণ দৌড়ল নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে বুনো-

পরস্পরের ভাষিয়ে, চলে গেল মন বুদ্ধি সহজ উপায়ে বাজাতে,—সহজ মনোযোগ (সহজ গতি, সিলে সুরে ও 'ছন্দের সাহায্যে)—এই ছিল বাজার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হল বাজার অধিকারীর কাছে (নিলে সে হাঁকিয়ে হুকোর কুঁড়ি ঘোড়া গ্রামফোনের মতো। নির্ভয়ে—যুঁইয়ো বাগান না কলাইয়ের খাবে, বাজি পড়ছে না কারুর চোখে, পুড়ো দিলে না কেউ।" (বাজা ও থিয়েটার)

কিন্তু গীতিনাট্যের বেলায় এই কথাটা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যায় না। তেহেতু দুইয়ের কাঠামো প্রায়ই এক এবং গীতের সাহায্যেই ঘটনাবলীকে যাত্রা ও গীতিনাট্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গীতিনাট্যের সঙ্গে যাত্রার যেখানে অমিল তা পূর্বেই বলেছি। গানের সাহায্যে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাত্রার জুড়ির গানের ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। গীতিনাট্যে ঘটনা এগোতে থাকে অভিজ্ঞতা-অভিমেচ্ছার গানের

আগমনীর সুর বেজে উঠেছে
★ নগরে প্রান্তরে ! দিকে দিকে ★
চলেছে মাতৃপূজার আয়োজন ;
★ তাই আপনাদের জন্যে আমরাও ★
যথাযোগ্য আয়োজন ক'রেছি !

এ বৎসর
শীতবস্ত্র [illegible] রকম আমদানী করিয়াছি। গত বৎসরের তুলনায় শীতবস্ত্রের মূল্য অনেক কম, পরীক্ষা করুন।

অনাথ বন্ধু বস্ত্রালয়

৩১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

এবার পূজায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
মায়া
হোসিয়ারীর শ্রেষ্ঠ শ্রী
THE MAYA HOSIERY MILLS
225 A, RASHBEHARY AVENUE, CAL-19
PHONE 46-2787

সর্ব্বপ্রকারের MASTER মেশিন টুলস

ভারতে প্রস্তুত
- লেদস্ ৩½", ৪½", ৬", ৮", ১০"
- ড্রিলিং মেশিন ½" হইতে ২"
- সেপিং মেশিন ৭", ১২", ১৪", ২৪"
- হ্যাকসো মেশিন ৪", ৬", ১", ১২"
- প্লাই প্রেস নং ০ হইতে ৮ (B. S. Specification)
- পাওয়ার প্রেস ৩½ টন হইতে ৬০ টন
- ট্রেডল গিলোটিন সিয়ারস ইং ব্লেড ও প্রপার সহ ১৮", ২৪", ৩০", ৩৬", ৪৮"
- পেলানিং মেশিন
- গ্রাইণ্ডার ও পলিসিং লেদস্ ইত্যাদি

বিদেশে প্রস্তুত
- "রিফিল্ড" পাইপ বেণ্ডিং মেশিন ২", ৩"
- 'ব্রীজেস' ইলেক্ট্রিক্যাল পোর্টেবল্ টুলস ও হোম কীট সেট
- 'সিলেক্টা' ও 'হিতাচি' ইলেকট্রিক বেঞ্চ গ্রাইণ্ডার ৬" হইতে ১৪"
- 'প্রাক্সার' ইউ, এস, এ, উড ওয়ার্কিং মেশিন
- জার্মান মোটরাইজড রোমার
- 'রিলায়েন্স' ইংলিশ ড্রিল গ্রাইণ্ডিং জিগ্
- 'পেডিং হাউস' জার্মান হ্যাণ্ড লিভার সিয়ার্স
- স্প্রে পেণ্টিং ইউনিট ইত্যাদি

মেশিন টুলস ট্রেডার্স (কলিকাতা)

২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ (১।এ কেদারদাস লেন) কলিকাতা—১৩
ফোন : PIPEBENDER ১৬ ফোন : ২৯—১০৫২
ASSOCIATES : MACHINE TOOLS TRADERS, DHANJI ST. AGIARY LANE, BOMBAY 3. PHONE : 39115 GRAM : LUCKYTOOLS
BRANCH : MACHINE TOOLS TRADERS KATRA MAHSING, AMRITSAR GRAM : MACTOOLS
FACTORY : HUNS ENGINEERING WORKS, 11, CAWASJI PATEL ST. FORT BOMBAY-1. PHONE : 250213 GRAM : HUNSGEAR

ভাল সব সময়েই ভাল

মজুমদার ব্রাদার্স এজেন্ট কোং
কলিকাতা—৯

মনোরম—
দীর্ঘস্থায়ী—
সস্তা—

এনামেলের নিত্য-ব্যবহারের বাসন এবং হাসপাতালের প্রয়োজনীয় বেড্‌প্যান্, ফুল্‌প্যান্, বালতী এবং জলের সর্বপ্রকার সেড্, বিয়ারিং টাব্, ডেন্‌জার সিগ্‌নাল এনামেল-সাইনস্, প্রভৃতি

•

ভারত টিন এণ্ড এনামেল কোং প্রাইভেট লিঃ

৭২, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬
ফোন : ৪৯-২০৪৩ — ৪৪-৫৮৪১

ও অর্থসাহায্যের সাহায্যে।

বাংলা দেশে যাত্রার পরিপুষ্টি সাধন হয় সপ্তদশের বেশী ১২৮০ সালে।

যাত্রার উৎকর্ষ সাধনে উপরে যে কয়েক-জনের নাম উল্লেখ করলাম, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে যাত্রার ক্রমোন্নতিতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা ছিলেন যাত্রার অধিকারী।

ইংরেজের অনুকরণে থিয়েটার বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যাত্রার প্রভাব ও আদর কমতে সুরু হল। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের সময়ে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রচলন ছিল।

বর্তমানে বাংলার রঙ্গমঞ্চে সামাজিক, সমস্যামূলক, ঐ ঐতিহাসিক নাটকের সমাদর বেশী। কাজেই ভাল গীতিনাট্য হালফিল আর রচিত হয়নি এবং হচ্ছেও দেখা যায়নি।

গীতিনাট্যকে বাংলা দেশে প্রনাদর করলে চলবে না, কারণ বাংলার বিলুপ্ত যাত্রার পরিণত-বয়স্কের রূপ হল গীতি-নাট্য।

ন্যায্য দামে ভাল জিনিষের জন্য আমাদের কাছে আসুন

রকমারী এনামেলের গৃহস্থালী বাসন ও হস্‌পিটাল-ওয়ার • চীনামাটির বাসন কাপ প্লেট ডিনার সেট্, টী-সেট্, কাটলারী • গ্লাস ওয়ার • স্টোভ • থার্মস্-ফ্লাস্ক • লণ্ঠন ইত্যাদির খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা।

•

সোল এজেণ্ট—ভারত টিন এণ্ড এনামেল কোং (প্রাঃ) লিঃ
এজেণ্ট—ম্যুর এনামেল এণ্ড স্টাম্পিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রাঃ) লিঃ
(দীপ্তি লণ্ঠন ও জনতা কুকার)

• প্রায় ৫০ বছরের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান •

দুর্লভ চন্দ্র মজুমদার

৪৫ এণ্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন—২২-৩৭১৫

প্রকাশক—শ্রীবিমলকুমার সরকার, ৩নং স্ট্রাণ্ড রোড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১, রমেশ প্রেস, হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

National Library,